KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY -O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ সাবিরা চন্দ্র অ্যাভেনিউ, কল-২৬
Collection : KLMLGK	Publisher : নীড় প্রকাশন
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫০/৫ ৫০/৭ ৫০/৮ ৫০/১০	Year of Publication : জুন ১৩৯৬ ॥ Sep 1989 কার্তিক ১৩৯৬ ॥ Nov 1989 অগ্রহায়ণ ১৩৯৬ ॥ Dec 1989 মাঘ ১৩৯৬ ॥ Feb 1990
	Condition : Brittle : Good
Editor : আবদুল হক	Remarks :

CD Roll No. : KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৫০ বর্ষ দশম সংখ্যা ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

কবিতা

সমকালীন বাঙলা কবিতার সমস্যা নিয়ে শিবনারায়ণ রায়ের স্বভাবসুলভ অন্তর্ভেদী আলোকপাত— "রেনেসাঁ, রবীন্দ্রনাথ এবং সমকালীন বাঙলা কবিতা"

"কমিউনিস্ট দুনিয়া ভাঙণের মুখে কেন?"— অধ্যাপক সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ।

আত্মজৈবেনিক লেখায় প্রাক্তন আই· সি· এস· অশোক মিত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে বিশ্লেষণ করেছেন উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের সেই সর্বনাশা ভূমিকার কথা যা বঙ্গদেশেও উৎপীড়িত করেছে নিম্নবর্গীয়দের এবং মুসলমান সম্প্রদায়কে।

রামজন্মভূমি বনাম বাবরি মসজিদ: এই বিতর্কের নির্মোহ অপক্ষপাতী ইতিহাসসিদ্ধ তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন ড· গৌতম নিয়োগী— এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে সরেজমিনে তদন্ত করে অযোধ্যার স্থানীয় মানুষের প্রতিক্রিয়া নিয়ে লিখেছেন কলকাতা প্রবাসী শ্রমিক ভীমরাজ যাদব— যাঁর জন্ম অযোধ্যার কাছেই এক গ্রামে।

"আধুনিক-ভারতে সাম্প্রদায়িকতাঃ সমাধানের সূত্রসন্ধান" খাজিম আহমেদের গ্রন্থসমালোচনা-ভিত্তিক বিশ্লেষণ, এছাড়াও থাকছে ভারত বিভাগ এবং বঙ্গবিভাগ নিয়ে দুখানি মূল্যবান গ্রন্থের আলোচনা।

ধর্মব্যবসায়ীদের কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সত্যজিৎ রায়ের 'গণশত্রু' নিয়ে কিছু কথা।

লালুপ্রসাদ সাউর ছাপের ছবির প্রদর্শনী নিয়ে সমীর ঘোষের আলোচনা।

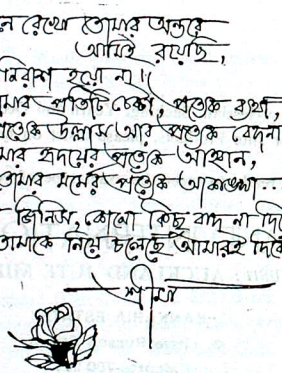

বর্ষ ৫০। সংখ্যা ১০
ফেব্রুয়ারি ১৯৯০
মাঘ ১৩৯৬

রেনেসাঁস, রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন বাঙলা কবিতা শিবনারায়ণ রায় ৮১৫
রামজন্মভূমি বনাম বাবরি মসজিদ গৌতম নিয়োগী ৮২১
কলকাতায় অগস্ট ১৯৪৬-এর ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের আগে ও পরে
অশোক মিত্র ৮৪৭
কমিউনিস্ট দুনিয়া ভাঙনের মুখে কেন? সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৮৬৯
সৃষ্টি আনন্দ ঘোষ হাজরা ৮৪৩
এই রাতে নীতীশ চৌধুরী ৮৪৪
তিনটি পথ শান্তিকুমার ঘোষ ৮৪৫
দ্বিধার সাপ গিলে আছে সকল মন্তব্য শরীফ শাহরিয়ার ৮৪৬
ভদ্রলোক অশোকেন্দু সেনগুপ্ত ৮৬১
গ্রন্থসমালোচনা ৮৭৭
খাজিম আহ্‌মেদ, সুরঞ্জন দাস / অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামাল হোসেন
চিত্রকলা ৮৯৮
সাদা পটে কালো রেখা সমীর ঘোষ
সিনেমা ৯০০
গণশত্রু: আশা ও নৈরাশ্য মেঘ মুখোপাধ্যায়
সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ৯০২
সরেজমিনে অযোধ্যা ভীমরাজ যাদব
মতামত ৯০৯
প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত
নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন: ২৭-৬৩২৭

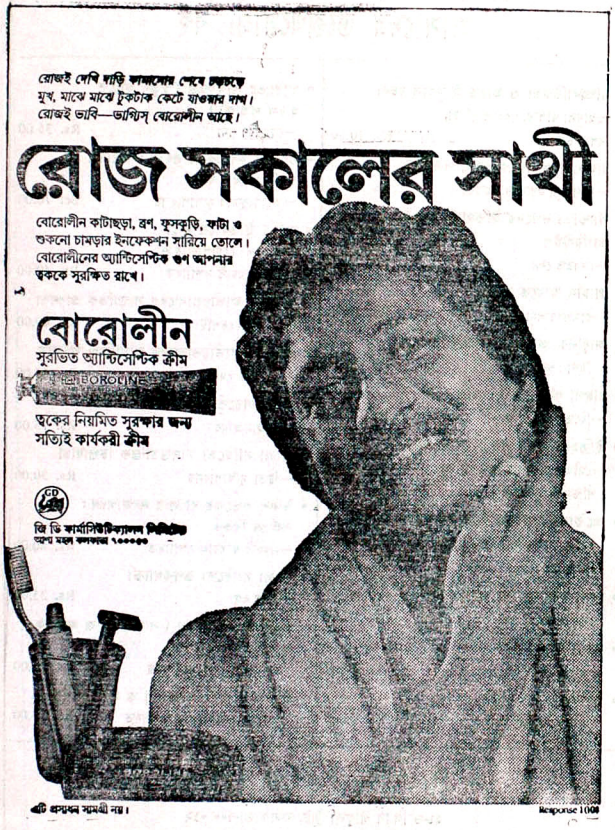

রেনেসাঁস, রবীন্দ্রনাথ ও সমকালীন বাঙলা কবিতা

শিবনারায়ণ রায়

ষোলো শতকের মধ্যভাগে যখন জর্জিও ভাসারির মহাগ্রন্থ "চরিতাবলী" প্রকাশিত হয় তখন ইতালীয় রেনেসাঁসের অপরাহ্নবেলা। চোদ্দ এবং পনেরো শতকে ইতালির নগরে-নগরে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলার যে অতুলনীয় প্রস্ফুরণ ঘটেছিল, ষোলো শতকের প্রথমার্ধে যার পরাকাষ্ঠা দেখি, ভাসারি সযত্নে, অশিথিল নিপুণতায়, গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তার বর্ণাঢ্য, তথ্যসমৃদ্ধ, ঘটনাসংকুল ও বহুচরিত্রসমাকীর্ণ কাহিনী রচনা করেছিলেন। পেশায় তিনি ছিলেন নিজে চিত্রকর ও স্থপতি; কিন্তু তাঁকে অমরতা দেয় এই "চরিতাবলী"। তাঁর তরুণ বয়সের গুরু, প্রৌঢ় বয়সের বন্ধু, সমকালের মহত্তম প্রতিভা মিকেলানজেলো এই মহাকাহিনীর প্রধান পুরুষ। কিন্তু তাঁর পিছনে এবং পাশে ছিলেন প্রতিভাধর বহু শিল্পী—আর তাঁদের আড়াইশো-বছর-ব্যাপী অনবচ্ছেদ ও অজস্র সৃজনকর্ম ইতালীয় রেনেসাঁসকে যুগপ্রবর্তকের ভূমিকায় উপস্থাপিত করেছিল।

কিন্তু রেনেসাঁসের কাহিনী লিখতে বসে ভাসারি গভীর বেদনায় লক্ষ করেছিলেন যে, ইতালিতে রেনেসাঁসের অবসান সমাসন্ন। দূরে সায়াহ্নের আভাস দেখে তিনি প্রত্যুষ থেকে অপরাহ্নের আলোকিত রূপবৈচিত্র্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। "চরিতাবলী" রচনার উদ্দেশ্য ছিল সমকালের শিল্পীদের দেখানো 'কেমন করে ক্ষুদ্র ঘটনা থেকে মহৎ পরিণতিতে পৌঁছোনো যায়, এবং সেই পরোৎকর্ষ থেকে আবার কেমন করে সমূহ বিনাশে পর্যাবসান ঘটতে পারে।'

উনিশ শতকের সূচনা থেকে বিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত অবিভক্ত বঙ্গদেশে ইতালির সমতুল্য একটি রেনেসাঁস ঘটেছিল। এটির সবচাইতে সার্থক ও সমৃদ্ধ প্রকাশ ঘটে সাহিত্যে—ইতালির মতো স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে বা চিত্রকলায় নয়। মানুষের সর্বোত্তম উদ্ভাবন তার ভাষা, এবং ভাষার শ্রেষ্ঠ কীর্তি সাহিত্যে। কিন্তু যদিও ভাষাহীন অথবা মৌখিক-সাহিত্যহীন সমাজ অকল্পনীয়, তবু অনেক সমাজের মতো অনেক ভাষার সাহিত্যও দীর্ঘকাল ধরে ক্ষীণ ও দরিদ্র অবস্থায় টিঁকতে পারে, এবং কখনো কখনো প্রবলতর সমাজ, সংস্কৃতি ও ভাষার চাপে বিলুপ্ত হতে পারে। ভারতবর্ষে বহু আদিজাতির ভাষা লিখিত-সাহিত্যবিহীন অবস্থাতেই বিলুপ্ত; অস্ট্রেলিয়া, নিউগিনি, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকাতেও বহু কথ্য ভাষা অক্ষরিত সাহিত্যরূপে

বিকাশ লাভ করবার আগেই মুছে গেছে বা যাচ্ছে। যেসব ভাষায় সাহিত্য ক্ষীণকায় ও দীনসত্ত্ব সেখানে নানা কারণের সমাবেশে তা দীর্ঘস্থায়ী হতেও পারে, কিন্তু সেই সমাজের মানস দারিদ্র্যও অব্যাহত থেকে যায়। কোনো অভ্যাসনিমগ্ন সমাজে যখন কোনো উদ্দীপকের আঘাতে একই সময়ে অনেকগুলি সৃষ্টিক্ষম মনের উন্মীলন ঘটে, এবং তার ফলে সেই সমাজের প্রকাশ-সামর্থ্য লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়, এবং সেই সমাজের সংস্কৃতি দ্রুত সমৃদ্ধিশালী ও বিকাশমুখী হয়ে ওঠে, তখন সেই ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকেই বলা চলে রেনেসাঁস। অবিভক্ত বঙ্গদেশে এই ধরনের মানস অভিদ্যোতনা ঘটে উনিশ শতকে। সমাজ-সংস্কার, ধর্মসংস্কার, রাজনৈতিক আন্দোলন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানচর্চা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই উন্মোচনের প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু এটির মুখ্য কীর্তি আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে।

রেনেসাঁসের চরিত্রলক্ষণ ও হেতুনির্ণয় এবং বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সিদ্ধি ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে আমি বিভিন্ন লেখায়, বিশেষ করে "স্রোতের বিরুদ্ধে" বইটিতে, বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি না করে প্রাসঙ্গিক দু-একটি কথা বলি। প্রথমত, আজ পর্যন্ত কোনো বঙ্গীয় ভাসারি দেখা দেন নি যিনি আমাদের রেনেসাঁসের কাহিনী এমন অন্তরদৃষ্টি, জ্ঞান এবং সাহিত্যশৈলীর সমন্বয়ে রচনা করতে পেরেছেন, যা তাঁকে অমরত্ব দিতে পারে। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মন্মথনাথ ঘোষ বিস্তর উপাদান সংগ্রহ করে রেখে গেছেন, কিন্তু তাঁরা ছিলেন সৎ এবং অধ্যবসায়ী গবেষক, তাঁরা শিল্পী ছিলেন না। পরে যাঁরা এসেছেন তাঁরা অনেকেই কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ উপাদানে বিস্তর জল মিশিয়েছেন, কেউ-কেউ মহাকায় উপন্যাস ফেঁদেছেন, কেউ-বা ঘটনাবৃত্তের ভোঁতা বিবরণ লিখেছেন, কিন্তু সেই বিচিত্র, অস্মিতা-সমৃদ্ধ, প্রাণবন্ত মনস্বিতার শব্দচিত্রায়ণ আজও অনারব্ধ।

দ্বিতীয়ত, ইংরেজ শাসনে এবং ইংরেজি ভাষার সূত্রে আধুনিক ভাবনাচিন্তার উদ্দীপক বাঙালির মনকে সক্রিয় করেছিল বলে সেই জাগ্রত মনের কীর্তি মোটেই দীনসত্ত্ব হয় নি। রেনেসাঁসের ভিতর দিয়ে যে অদম্য কৌতূহল, অমিত জিজ্ঞাসা, অফুরান উদ্ভাবনা, অভীক উদ্যম ইয়োরোপে প্রসারিত হয় তারই একটি ঢেউ কলকাতায় এসে এশিয়াটিক সোসাইটির রূপ নিয়েছিল। প্রাচ্য ভূখণ্ডে যা-কিছু আছে এবং যা-কিছু ঘটেছে তার তথ্যনির্ভর, যুক্তিনিষ্ঠ, সুবেদী পর্যালোচনা ছিল উইলিয়ম জোনস এবং তাঁর সহযোগীদের স্বনির্বাচিত কর্মসূচী। প্রকৃতি সম্পর্কে আগ্রহ, সংস্কারমুক্ত অন্বেষণ, ঐতিহ্য ও শাস্ত্রের বিচারে যুক্তিবিশ্লেষণের প্রয়োগ, সংকীর্ণ ও অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার বাইরে বিরাট এবং বিচিত্র বিশ্বমানবীয় উত্তরাধিকার বিষয়ে চেতনা, এবং অধৃষ্য আত্মপ্রত্যয়—এইসব লক্ষণের সমাবেশ ঘটে বাঙলা তথা অখণ্ড ভারতবর্ষের প্রথম রেনেসাঁসি অস্মিতা রামমোহন রায়ের ভিতরে। বাঙালিদের ভিতরে তিনিই প্রথম কলকাতার সংবিতে বিশ্বনাগরিকতাবোধের সঞ্চার করলেন। শুধু বাঙলা, সংস্কৃত, আরবি-ফারসি নয়, শিখলেন ইংরেজি, গ্রীক, হিব্রু; তাঁর প্রতিভাকে শ্রদ্ধা জানালেন স্প্যানিশ বুদ্ধিজীবীরা; তাঁর গ্রন্থ জার্মান ভাষায় অনূদিত ও প্রকাশিত হল; তাঁর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট ইজিপ্ট থেকে আমেরিকা, ইংল্যানড থেকে ফ্রান্স। বাঙলার মানস ইতিহাসের নতুন অধ্যায় শুরু হল।

তারপর উনিশ শতকে বাঙলা কবিতায় বিপ্লব ঘটালেন মাইকেল মধুসূদন, বাঙলা গদ্যের প্রকাশ-সামর্থ্যকে আন্তর্জাতিক মানের কাছাকাছি এনে দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙলা সাহিত্যের বয়স নিতান্ত কম নয়, কিন্তু আদিপর্বের কথা বাদ দিলেও পরবর্তী পাঁচশ বছর ধরে তার বিকাশ ঘটেছে বড়ো ধীর গতিতে। কৃষ্ণকীর্তন, বাঙলা রামায়ণ ও মহাভারত, চণ্ডীমঙ্গল, পদ্মাবতী, পূর্ববঙ্গগীতিকা—এসবের

সাহিত্যগুণকে তুচ্ছ না করেও বলা যায় এদের গণ্ডী খুবই সীমাবদ্ধ, এদের ঐতিহ্যে একাঘ্নয়ী দাগা-বোলানো অত্যন্ত প্রবল। এই একাঘ্নয় থেকে বাঙলা কবিতাকে মুক্তি দিলেন মাইকেল, খুলে দিলেন নানা পরীক্ষানিরীক্ষার সম্ভাবনা, অস্মিতার অভিব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করলেন কল্পনার কেন্দ্রে। আর বঙ্কিম তাঁর অসামান্য প্রতিভা এবং একাগ্র অনুশীলনের জোরে বাঙলা গদ্যসাহিত্যকে তার কৈশোর থেকে নিয়ে এলেন পরিপূর্ণ যৌবনে—হাতেকলমে দেখালেন বাঙলা গদ্যে বিজ্ঞানচর্চা এবং ব্যঙ্গকৌতুক, ইতিহাস-জিজ্ঞাসা এবং দার্শনিক তত্ত্বালোচনা, রোমান্স, সামাজিক, রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস সব রকম রচনাতেই উৎকর্ষ অর্জন সাধ্যায়ত্ত। বাঙালি হিন্দুর উপরে তাঁর কোনো-কোনো রচনার প্রভাব সুফলপ্রদ হয় নি; কিন্তু তাঁর মনস্বিতা এবং উদ্ভাবনাশক্তি, তাঁর জিজ্ঞাসার বহুমুখিতা এবং গদ্যশৈলীর অভূতপূর্ব চমৎকারিতা অনস্বীকার্য। ইতালির রেনেসাঁস যেমন পশ্চিম ইয়োরোপের দেশে-দেশে নবযুগ প্রবর্তনে সহায়ক হয়েছিল, বাঙলার রেনেসাঁস তেমনই ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে প্রভাব বিস্তার করে। বাঙলার মানস উজ্জীবনে এবং ভারতবর্ষে তার সম্প্রসারণে ইংরেজি শিক্ষা বিদেশী শাসন প্রতিবন্ধক না হয়ে অনুকূলতা দান করে।

বঙ্গীয় তথা ভারতীয় রেনেসাঁস তার পরিপূর্ণ প্রকাশ অর্জন করে রবীন্দ্রনাথের অপ্রতিম প্রতিভায়। সাহিত্যের কোনো শাখাই নেই যাতে তিনি সিদ্ধি লাভ করেন নি; কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, এবং বিচিত্র বিষয়ে প্রবন্ধ—সর্বক্ষেত্রে তিনি পারদর্শী। এবং তাঁর সৃজনপ্রতিভা শুধু সাহিত্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। প্রায় একক অধ্যবসায়ে গড়ে তোলেন একটি বিশ্ববিদ্যালয়, একটি নৃত্যনাট্যের ঘরানা, মঞ্চাভিনয়ের একটি বিশেষ ঐতিহ্য, স্বপরিকল্পিত ঋতু-উৎসবের সুষম রীতিপ্রকরণ, কৃষি ও কারুশিল্পের একটি অভিনব শিক্ষাসত্র। আর সবকিছুকে ছাপিয়ে ছাড়িয়ে তাঁর অস্তিত্বের কেন্দ্র থেকে উৎসারিত প্রায় আড়াই হাজার গান—কথা এবং সুরের পরিপূর্ণ মিলনে যা তুলনা-হীন—আমাদের সূক্ষ্মতম অনুভবও যাদের ভিতরে প্রতিধ্বনিত। এবং তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ে সেই অবিশ্বাস্য বিস্ফোরণ—তাঁর আঁকা দু হাজার-এরও বেশি ব্রাত্য, ব্যুৎক্রান্ত ছবি—যেখানে তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ অনুলম্ব পথযাত্রী। আমি আমার নানা লেখায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছি, কিন্তু সব সমালোচনার ঊর্ধ্বে এই প্রত্যয় বিদ্যমান যে, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এবং গোএটেকে বাদ দিলে তাঁর সঙ্গে তুলনীয় বৈশ্বিক ও বিচিত্রমুখী প্রতিভা পৃথিবীর ইতিহাসে চোখে পড়ে না। এই মহাপ্রতিভা বাঙলা ভাষা এবং সাহিত্যকে আঞ্চলিকতা থেকে পৌঁছে দেয় বৈশ্বিকতায়—ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, জার্মানের সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যও আপন সম্পন্নতায় তুলনীয় হতে শুরু করে।

ভাসারির সামর্থ্য এবং অভিনিবেশ সম্পূর্ণভাবেই আমার অনায়ত্ত, কিন্তু বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অপরাহ্ণ-বেলায় আমার কৈশোর কেটেছে এবং বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে। বিশের এবং ত্রিশের সেই অপরিমিত সাহিত্যিক ঐশ্বর্যশালিতা আজ অবিশ্বাস্য মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের নব-নব উদ্ভাবনা তখনো বহু শিখায় দীপ্যমান। পাশাপাশি আপন-আপন কীর্তিতে প্রতিষ্ঠিত প্রমথ চৌধুরী, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম। আর তাঁরা অস্তমিত হবার আগেই দেখা দিলেন প্রায় একই সঙ্গে অনেকগুলি তরুণ প্রতিভা—বিভূতিভূষণ, অন্নদাশংকর, তারাশংকর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ, জসীমুদ্দিন, সুধীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে। আমাদের তরুণ মনের পুষ্টি যুগিয়েছিল সে দশকের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সাহিত্য-পত্রিকা—প্রবাসী, বিচিত্রা, মাসিক মোহাম্মদী, শনিবারের চিঠির পাশাপাশি ছিল পরিচয়, কবিতা, চতুরঙ্গ, পূর্বাশা, নিরুক্ত। আত্মপরিচয়সূত্রে রবীন্দ্রনাথ

লিখেছিলেন, 'আমি জীর্ণ জগতে জন্মগ্রহণ করি নি'। 'অনাদিকালের যে অনাহত বাণী অনন্তকালের অভিমুখে ধ্বনিত' তাঁর মতো মন প্রাণ দিয়ে তাতে সাড়া দিই, সে সামর্থ্য কোথায় পাব? কিন্তু আমার তরুণ বয়সে বাঙলাভাষায় যে সৃজনবৈভব দেখেছিলাম তা আমার চেতনাকে পুষ্ট, প্রত্যয়ী ও শ্রদ্ধান্বিত করেছিল। সমকালে বিশ্বব্যাপী ধ্বংসপ্রস্তুতি বিষয়ে আমি অজ্ঞ অথবা উদাসীন ছিলাম না, কিন্তু নির্বেদ বা শুভ-নাস্তিক্য আমার বয়ঃপ্রাপ্তিতে সঞ্চারিত হয় নি। বাঙলার রেনেসাঁসের শেষ পর্ব আমি প্রত্যক্ষ করেছি, অপরের বিবরণ থেকে তার পরিচয় পাই নি। তাই সেই রেনেসাঁসের মহাসম্পন্ন অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই।

তারপর এল ভাসারি যাকে বলেছিলেন সমূহ বিনাশের যুগ। চল্লিশের দশকে যুদ্ধ এবং মন্বন্তর, পথেঘাটে অগণিত বুভুক্ষুর মৃতদেহ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও হত্যাপর্ব, দেশবিভাগ এবং লক্ষ-লক্ষ উৎখাত, নিরাশ্রয় স্ত্রীপুরুষের প্রব্রজন—এক প্রগাঢ় তমিস্রা আমাদের চোখের সামনে যবনিকা টানল রেনেসাঁসের স্বর্ণসায়াহ্নের উপরে। সেই অন্ধকার থেকে পশ্চিমবঙ্গ আজও উদ্ধার পায় নি। সেখানে মৃঢ়তার জয়যাত্রা এবং সর্বগ্রাসী আপজাত্য এখনও অব্যাহত। পূর্ববঙ্গে সাময়িকভাবে সৃজনশীল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল; স্বাধীনতার সংগ্রামের ভিতর দিয়ে মনে হয়েছিল লোকায়ত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটবে। কিন্তু পূর্ববঙ্গে যাঁরা ছিলেন ভাবুক, বিবেকবান, সৃজনপরায়ণ তাঁদের ভিতরে অধিকাংশকেই পরিকল্পনা করে হত্যা করা হল; বিপর্যয়ের পরে বিপর্যয় প্রবল করে তুলল ধর্মান্ধ মূঢ়তার শক্তি; প্রতিষ্ঠিত হল সামরিক স্বৈরতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের দলীয় জুলুমতন্ত্র আর বাংলাদেশের সামরিক স্বৈরতন্ত্র—দুটিই মনস্বিতার ও সৃজনশীলতার পরিপন্থী। ভাবনা-কল্পনার বিকাশের অবম শর্ত প্রাতিস্বিক স্বাধীনতা। ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং অথবা মতবাদের অসহিষ্ণুতা যখন উগ্র প্রচার এবং ব্যাপক সন্ত্রাসের চাপে ব্যক্তির বিবেক ও স্বাধীন প্রকাশকে স্তব্ধ করে তখন সে সমাজে মননের ক্ষেত্র বন্ধ্যা, সেখানে দর্শন বিজ্ঞান সাহিত্য সবই মুমূর্ষু, মর্তুকাম।

রাজনীতি এখানে আমার আলোচ্য নয়। কবিতা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলে এই আলোচনা সমাপ্ত করব। কয়েক হাজার বছর আগে যখন ছন্দোবদ্ধ ভাষায় মানুষের অভিজ্ঞতা প্রথম স্থায়ী আকার পেতে শুরু করে তখন মানুষের গোচর এমন কিছুই ছিল না যা ছন্দোবদ্ধতার এখতিয়ারের বাইরে। দিনরাত্রির যমল আবর্তনে, প্রকৃতির ঋতুচক্রে, নদীর বহমানতায়, আমাদের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের সমন্বয়ে যে ছন্দোময়তা বিদ্যমান, ভাষায় তা রূপ নিল কবিতার। মানুষের অনুভূতি, অভিজ্ঞতা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ভাবনা-কল্পনার ভিতরে যা কিছু স্মরণীয় ও রক্ষণীয়, তাই ছন্দোবদ্ধ ভাষায় গ্রথিত হল। দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, নীতিশাস্ত্র, নাটক, গল্প, উপন্যাস থেকে যা ব্যক্তির একান্ত ও নিবিড়তম অনুভূতি সবই কথিত এবং শ্রুত হয়েছে ছন্দোধৃত শব্দবিন্যাসে। সাহিত্যের স্বতন্ত্র বিচিত্র নানা শাখা পরিস্ফুট এবং বিস্তারিত হবার পরও কাব্যের সার্বত্রিকতা অস্বীকৃত হয় নি।

বাঙলা ভাষায় কবিতার এই সার্বত্রিকতার সব-চাইতে দীপ্যমান উদাহরণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্যের সব কটি শাখাতেই তাঁর কীর্তি অপ্রতিম, তবু তিনি হাতেকলমে দেখিয়েছিলেন যে এমন কিছুই নেই যা কবিতার ক্ষেত্রে ব্রাত্য বা বর্জনীয়। মহাকাব্য অবশ্য তিনি লেখেন নি—আধুনিক কালেও যে মহাকাব্য রচনা সম্ভব কাজানৎজাকিসের "ওডিসি" পড়ে সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না—কিন্তু তা ছাড়া এমন আর কিছুই নেই যাকে তিনি কাব্যরূপ দেন নি। অধিকাংশ পাঠক তাঁকে দেখেন বিশুদ্ধ লিরিক কবি হিসেবে—আত্মপরিচয়-জাতীয় তাঁর নানা রচনা সেই জনপ্রচলিত ধারণাকে বলবত্তর করেছে—কিন্তু তাঁর রচনাবলীর কাব্যাংশ পাঠ করলে সন্দেহ থাকে না এ ধারণা

যথার্থ নয়। রবীন্দ্রনাথ শুধু নিজের আবেগ-অনুভূতিকে কবিতার উৎস বা উপাদান করেন নি। তিনি বড়ো যত্নে, গভীর সহানুভূতিতে অপরদের কাহিনীকেও কবিতার রূপ দিয়েছেন। লিখেছেন অতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-কবিতা, দ্বিপদী ও চৌপদী আকারে নীতিতত্ত্ব, শাণিত প্রতিবাদ, ছন্দোধৃত দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত দার্শনিক কবিতা, পুরাণকাহিনী অবলম্বনে নাট্যকাব্য। 'হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি', অথবা 'খুঁজিতেছি কোথা তুমি, কোথা তুমি' থেকে 'আজিকার দিন না ফুরাতে/ হবে মোর এ আশা পুরাতে', অথবা 'আমারে যে ডাক দেবে এ জীবনে তারে বারংবার ফিরেছি ডাকিয়া'—এসব তাঁর একান্তভাবেই নিজের কথা। কিন্তু মোক্ষদা, মৈত্রমহাশয় আর রাখালের মর্মভেদী কাহিনী তো লিরিক নয়। হতভাগিনী মল্লিকার পুত্রবিসর্জন, চাষী উপেনের জমি বরবাদ, বৌদ্ধ, শিখ এবং রাজস্থানী পুরাবৃত্ত থেকে সংগৃহীত কাহিনী—এ সবই তাঁর কল্পনার বুনোটে কবিতা হয়ে উঠেছে। ১২৯৮-এর ফাল্গুন মাসে লিখেছেন 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোটো সে তরী'; ১২৯৯-এর ১৫ জ্যৈষ্ঠ তারিখে অপরূপ রোমানটিক কবিতা, 'একদা রাতে নবীন যৌবনে', আর তার অব্যবহিত পরেই ১৮ জ্যৈষ্ঠ তারিখে 'হিং টিং ছট: স্বপ্নমঙ্গল'। 'যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে'-র মতো অসামান্য কবিতা যাঁর লেখা তিনি তারই কাছাকাছি সময়ে লিখেছেন, 'কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে।' এবং কবিতা হিসেবে দ্বিতীয় রচনাটি মোটেই কাঁচা কাজ নয়। "বৃক্ষবন্দনা", "সবলা", "প্রশ্ন", "ছেলেটা", "তুমি প্রভাতের শুক-তারা", "পৃথিবী", "আমি", "আফ্রিকা", "ঐকতান", "প্রথম দিনের সূর্য", "তোমার সৃষ্টির পথ"—কত বিচিত্র বিষয়ে, বিচিত্র রূপে তিনি বাঙলা কবিতাকে সর্বত্রসঞ্চারী করেছিলেন, ভাবলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। কীটস যাকে বলেছিলেন 'নেগেটিভ কেইপ্যাবি-লিটি' রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভায় তার উপস্থিতি অপরিমেয়।

রবীন্দ্রকাব্যের এই পরিচিত দিকটি আবার স্মরণে আনবার কারণ, গত চল্লিশ বছরে বাঙলা কবিতা এই সার্বত্রিকতা হারিয়েছে। বাঙলা কবিতার জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়েছে মানুষদের কাহিনী, দর্শনপ্রসঙ্গ, নীতিকথা, প্রকৃতিবন্দনা, ব্যঙ্গকবিতা। বিষঙ্গগ্রস্ত সমকালীন বাঙলা কবিতার একদিকে দেখতে পাই মতবাদপ্রচারের একাত্ময়ী উগ্রতা, অন্যদিকে মর্ষকাম আত্মরতি। অপর স্ত্রীপুরুষ সম্পর্কে আগ্রহ নেই, ঋতুরঙ্গে সাড়া দেবার সামর্থ্য প্রায় অবলুপ্ত, সাংস্কৃতিক উত্তরলব্ধি অবহেলিত, ছন্দচেতনা কুশিত। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রকৃতি এবং অপর স্ত্রীপুরুষের সঙ্গে অনুরাগের সূত্রে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন, তেমনই তাঁর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারকে নিপুণ শৈলীতে কবিতার উপাদান হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিরিশের কবিদের ভিতরেও উত্তরাধিকারচেতনা সক্রিয় ছিল। কিন্তু গত চার দশকে মানবিকতা, প্রকৃতিবোধ, ঐতিহ্যচর্চা ক্রমেই শীর্ণ হয়ে এসেছে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে, কিন্তু সম্প্রতিকালে কবিদের সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধিশীল, কবিদের জগৎ সেই হিসেবে আগের তুলনায় শীর্ণতর ও সংকীর্ণতর।

ফরমাস দিয়ে কবিতা হয় না, এবং দুই বাঙলাতেই বর্তমানে যে-যে প্রকৃতির স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত, তারা যে মোটেই কল্পনার স্ফূর্তির অনুকূল নয়, এটুকু আমি জানি। কিন্তু অবস্থার কাছে হার মানতে রাজি নয় বলেই মানুষের পক্ষে ইতিহাসরচনা সম্ভব। একদা দুই কবিবন্ধু ওয়র্ডসুওয়র্থ এবং কোলরিজ তাঁদের যৌথ কাব্যসংকলনের ভূমিকায় কাব্যাদর্শ বিষয়ে আপন-আপন ভাবনাকে প্রকটিত করেছিলেন। একজন চেয়েছিলেন কবিতার সূত্রে প্রাত্যহিকে অলৌকিকের গূঢ়ার্থ সঞ্চারিত করতে; অন্যজন ভেবেছিলেন যা অলৌকিক এবং একান্তভাবেই কল্পনানির্ভর, তাকে বিশ্বাস্য ও স্বয়ংসিদ্ধ করার ভিতরেই কবিতার সিদ্ধি, ইংরেজি কবিতায় এইভাবেই রোম্যানটিক আন্দোলন সূচিত হয়েছিল। আজ দুই বাঙলাতেই যাঁরা শিক্ষিত

তাঁরা আপন-আপন ক্ষেত্রে সার্থকতার চিন্তায় পরাঙ্মুখ। তাঁরা পদ, প্রতিপত্তি, আয়বৃদ্ধি, শক্তিমানের অনুগমন এসব কাজে ব্যস্ত। শিক্ষক জ্ঞানচর্চা করেন না, চিকিৎসক রোগনিরাময়ে অনীহ, সাংবাদিক তথ্যের যাথার্থ্যনির্ণয়ে উদাসীন। এই সর্বব্যাপী অন্ধকারে শুধু কবিরা তাঁদের অন্তর্দীপ জ্বালিয়ে রাখবেন—এটি হয়তো অবাস্তব প্রত্যাশা। তবু জানি এই অবস্থাকে বদলাতে হবে। সেই পরিবর্তনে কবিদেরও ভূমিকা আছে। আত্মগ্লানি আর নির্বেদ, অপ্রেম আর আত্মরতি, অসহিষ্ণু ধর্মীয় মৌলবাদ আর উচ্চঘোষ রাজনৈতিক মতবাদ ব্যক্তি এবং সমাজের সঙ্গে সাহিত্যেও আপজাত্য ঘটায়। প্রকৃতি এবং মানুষ, অন্তর্লোক এবং উত্তরলব্ধি, জিজ্ঞাসা এবং অনুভূতির সততা, শব্দ এবং অর্থের দ্বন্দ্বিত সমন্বয়—এসবের অনুশীলনের ভিতর দিয়েই কবিতার নবীকরণ ঘটতে পারে। এবং তার ভিতর দিয়েই দুই বাঙলার দ্বিতীয় রেনেসাঁস সূচিত হওয়া আমার কাছে একেবারে অকল্পনীয় ঠেকে না।

* নভেম্বর ১৯০৯ মাসে ঢাকায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

রামজন্মভূমি বনাম বাবরি মসজিদ : একটি ইতিহাস-বিরোধী বিতর্ক

গৌতম নিয়োগী

উপক্রমণিকা

ভূমিকাস্বরূপ বর্তমান প্রবন্ধের প্রথমেই কতকগুলি কথা স্পষ্ট ক'রে নেওয়া ভালো। রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে সম্প্রতি বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে যে সাম্প্রদায়িক জিগির সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং এক ধরনের ধর্মীয় উন্মাদনাকে কাজে লাগিয়ে সংহতি, ঐক্য ও প্রগতির প্রচেষ্টাকে বিনষ্ট ও রুদ্ধ করার চেষ্টা হচ্ছে, তা ঘটছে ভারত-ইতিহাসকে অনেকাংশে সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ও বিকৃত করার ফলে। এই ইতিহাসবিরোধী মনোভাব এবং বিকৃতি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করছেন ভারতের প্রধান দুই ধর্মসম্প্রদায় বা হিন্দু- এবং ইসলাম-ধর্মাবলম্বী মানুষদের সেই অংশ, যাঁরা বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিবাদী, গণতান্ত্রিক, উদার, অসাম্প্রদায়িক ও সেকুলার, মানবতাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদে বিশ্বাসী নন। এক কথায় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার হিসাবেই ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রথমেই আরো স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমানের এই বিরোধ শুধুমাত্র ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণ বা ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে নি, বরং ভালোভাবে খতিয়ে দেখলে ভারতীয় রাজনীতিতে এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অধুনা যে সাম্প্রদায়িক তামসিকতার গভীর প্রভাব পড়েছে, সেই বৃহত্তর পটভূমিকার থেকেই এই বিরোধের জন্ম। তবে, ইতিহাসব্যাখ্যা বিকৃত হলে সমাজে তার কুফল পড়ে এবং তার মাশুল গুনতে হয় জনগণকেই ; তাই সমাজে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব বিস্তারে ভারত-ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণ কী ভূমিকা নিয়ে থাকে তা খোলা মনে, নির্মোহ ও অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করা দরকার। অতএব এ প্রবন্ধ বিতর্কের তার্কিক জবাব বা ঐতিহাসিক সমাধান নয়, রাজনৈতিক সমাধান তো নয়ই ; কেননা বৃহত্তর পটভূমিকা এখানে আলোচ্য নয়, আলোচ্য শুধু ইতিহাস।

দ্বিতীয়ত, পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং পরস্পরকে জানা ও বোঝার দায় যেমন সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘু উভয় সম্প্রদায়ের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সাধারণ মানুষদের, রাজনৈতিক সমাধানের দায় যেমন রাজনৈতিক দলগুলির, মৌলবাদকে প্রতিহত করার কর্তব্য যেমন সেকুলার ও বস্তুবাদী সংগঠনগুলির, দেশের প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকার এবং নিরাপত্তা এবং দেশের সংহতি-ঐক্য-স্বাধীনতা রক্ষার ভার যেমন সরকার ও প্রশাসনের, তেমনি পেশাদার ঐতিহাসিকদেরও কিছু দায়িত্ব আছে, বিশেষত যাঁরা ইতিহাসের ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানসম্মত ও বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী। ক্ষমতা ও রাজনীতির দ্বন্দ্বে কিছু ভেদপন্থী, চতুর, সংকীর্ণ, স্বার্থান্ধ এবং মতলববাজ দল বা গোষ্ঠী যদি সাধারণ মানুষদের ধর্মীয় সারল্য, গভীর ধর্মবিশ্বাস এবং মনের আবেগকে ইতিহাসের দোহাই দিয়ে আইনসিদ্ধ করার চেষ্টা করে বা তাদের বক্তব্যকে ইতিহাসনিষ্ঠ বলে চালাবার চেষ্টা করে, তখন স্বভাবতই ঐতিহাসিকদের একটা দায় থাকে সেই বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করবার। ইতিহাসবিদের পক্ষে সত্য ঘটনা তুলে ধরা আবশ্যিক কর্ম হিসেবে একান্ত জরুরি হয়ে পড়ে তখনই, যখন ক্ষমতালোভী এবং স্বার্থপর সাম্প্রদায়িক শক্তি বা গোষ্ঠী নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য 'ইতিহাসের সাক্ষ্য'কে বিকৃত করে ব্যবহার করতে চায়। তাই, ঠিক এই যুক্তিতেই, বর্তমান প্রবন্ধটি রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ প্রশ্নটি কতখানি ইতিহাসসম্মত বা ইতিহাসসম্মত আদৌ নয়, তা দেখানোর একটা আন্তরিক ও সহজ চেষ্টা মাত্র। দেশের অনেক যোগ্য ইতিহাসবিদ একক বা সমবেত ভাবে আগেই এ কাজ করেছেন, এই প্রচেষ্টা তারই সঙ্গে সামান্য সংযোজন—তা আমরা সবিনয়ে জানাতে চাই।

তৃতীয়ত, কোনো ধর্মমত বা সম্প্রদায় বা দল কিংবা গোষ্ঠী বা কোনো ব্যক্তির ধর্মবিশ্বাসকে সামান্যতম আঘাত দেওয়া এই প্রবন্ধের অভিপ্রায় নয়। আমাদের প্রতিবাদ ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে, অসহিষ্ণু অগণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে, অযৌক্তিক উন্মাদনার বিরুদ্ধে এবং অবশ্যই ইতিহাসের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। ভারতবর্ষ সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এখানে প্রত্যেক নরনারীর তাঁর নিজস্ব ধর্মবিশ্বাসের, সেই বিশ্বাস অনুযায়ী আচরণের এবং ব্যক্তিগত ধর্মপালনের মৌলিক অধিকার আছে, এবং তা সংবিধানস্বীকৃত। একথা প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—তা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ব্রাহ্ম প্রমুখ আস্তিক্যবাদী ধর্মদর্শনে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে যতখানি, বৌদ্ধ, জৈন প্রমুখ নাস্তিক্যবাদী ধর্মদর্শনের ক্ষেত্রেও ততখানি প্রযোজ্য। নানা উপজাতীয় জনগণের ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রে যতখানি প্রযোজ্য, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র নানা লোকধর্মের (folk religion) এবং অতীন্দ্রিয়বাদী মূঢ়, দুরূজ্ঞেয় ধর্মগোষ্ঠীর (mystic religious cult) ক্ষেত্রে ততখানি প্রযোজ্য এবং আউল-বাউল-সাঁই-দরবেশ-সুফী-কর্তাভজা-সাহেবধনী-বলাহারিইত্যাদি হাজারো লোকায়ত গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও সত্য। ভারতবর্ষ সকলের। এই অধিকার শুধু স্বাধীন ভারতের সংবিধানসম্মত তাই নয়, ভারতবর্ষ আবহমানকাল ধরে কোনো এক জাতি ও এক ধর্মের—একথা বলাও ইতিহাসের প্রতি বেইমানি ও চরম অবিচার। তেমনি, যাঁরা আদৌ ধর্মবিশ্বাসী নয়, বা দৈনন্দিন বস্তুবাদী জীবনে যাঁরা কোনো অলৌকিক (supernatural) বা অতিপ্রাকৃত, আধিভৌতিক (metaphysical) বা দৈব (divine) ব্যাপারে বিশ্বাসী নয়, সংবিধান অনুসারে তাঁদেরও মৌলিক অধিকার ও নাগরিক ধর্ম পালনের পূর্ণ ক্ষমতা আছে। অযোধ্যা তথা ফৈজাবাদের সাধারণ মানুষ যে একথা বিশ্বাস করেন, তাঁরা যে সুস্থিতি, শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাসী, তা রামজন্মভূমি বা বাবরি মসজিদপন্থীরা বিশ্বাস করবেন কিনা আমরা জানি না, কিন্তু সম্প্রতি সাধারণ নির্বাচনের ফৈজাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের ফলেই তা

স্পষ্ট। ইতিহাস বলে, নানা যুগে নানা কালে ভিন্ন-ভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী-ভাষার মানুষদের মধ্যে বৈচিত্র্য ও ঐক্য মিলেই এই 'মহামানবের সাগরতীর' গড়ে উঠেছে। এটাই ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থত এবং সবশেষে আমরা বলতে চাই যে, বর্তমান প্রবন্ধে কোনো রাজনৈতিক দলের বা কর্মীর সমালোচনাও অন্বিষ্ট নয়। আমরা অ-রাজনৈতিক কোনো ধর্মীয় মৌলবাদী দলের কথাও এখানে আলোচনা করি নি। রাজনৈতিক বিতর্কের মঞ্চ আলাদা, তার ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। এখানে শুধু ইতিহাস-বিচারই মুখ্য। যদিও স্বীকার্য যে, বহু দলই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়, তবু পাঠক-পাঠিকাগণ লক্ষ করবেন যে, একবারের জন্যেও রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ প্রশ্নে কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি, জনতা দল, সি. পি. আই., সি. পি. এম., বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, জামাত-ই ইসলামী, বজরঙ্গ দল, বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি, হিন্দু মহাসভা, ইনসাফ পার্টি বা অন্য দল বা তার নেতৃত্ব, তাদের ভূমিকা নিয়ে কোনো কথা উচ্চারিত হয় নি। কারণ—তা নিষ্প্রয়োজন। কারা ঠিক, কারা ঠিক নয়, কারা কতখানি দায়ী, কতখানি সাম্প্রদায়িক, তার বিচার সাধারণ মানুষ করবেন। হয়তো ইতিহাসবিদও করবেন, কিন্তু সে ইতিহাস আপাতত আমাদের আলোচনার বাইরে। বিচার ও লক্ষণীয় শুধু এটাই যে, বলদর্পী পেশীশক্তি যেন ইতিহাসকে হত্যা না করে। 'ইদানীং তো হিন্দু মুসলমান সম্পর্ককে রামজন্মভূমি আর বাবরি মসজিদ প্রবক্তারা জেদাজেদি করে যেখানে নামিয়ে এনেছে তাতে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, অবিশ্বাস আবার যেন তুঙ্গে উঠেছে'—একথা লিখে শ্রদ্ধেয়া গৌরী আইয়ুব মন্তব্য করেছেন একটু পরেই, 'কোনো মহৎ আদর্শেরই সত্যিকারের শক্তি পেশীতে নয়, পিস্তলে নয়—শক্তি থাকে তার উদার মানবিকতায়।' (দ্র, "চতুরঙ্গ, ৫০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা জুলাই, ১৯৮৯।) আমরা একমত। সেই সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে—ভবিষ্যতে পেশী-আস্ফালনের দাপটে যেন ইতিহাস কুঁকড়ে না যায় এবং বিকৃতি সত্যি বলে স্বীকৃতি না পায়। যদি তা হয় তাহলে তা হবে সত্যিই দুঃখের দিন। মানুষের মনে অসত্য বদ্ধমূল হয়ে গেলে বিশ্বাস অন্ধবিশ্বাসে পরিণত হবে, সেটা হবে সেই মধ্যযুগীয় তামসিকতায় প্রত্যাবর্তন যখন মানুষ বিশ্বাস করত সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে না বললে পুড়িয়ে মারা উচিত। সহাবস্থান যেখানে সম্ভব, সম্ভাব যেখানে কাম্য, সেখানে যে-কোনো দলেরই একগুঁয়েমি নিরবুদ্ধিতার পরিচায়ক নয় কি? ঘরে আগুন নিয়ে খেললে কী হয় তার উদাহরণও আমাদের ইতিহাসেই আছে।

রামজন্মভূমি আর বাবরি মসজিদ দুটোই অনৈতিহাসিক, অন্তত ঐতিহাসিক-প্রমাণ-সাপেক্ষ ঘটনা বা ব্যাপার নয়। তবু উভয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী, দুটোই পাশাপাশি ছিল—সর্বদা শান্তিপূর্ণ না হলেও, কখনো-কখনো বিরোধ বা সংঘর্ষ হলেও, অধিকাংশ সময়ই সম্প্রীতিতে। ফৈজাবাদ জেলার অযোধ্যায় বাবরি মসজিদে উপাসনা করতেন মুসলমানরা, পাশে হিন্দুরা পূজার্চনা দিতেন চবুতরায় (একটি উঁচু বেদী বা মঞ্চ), যার মাপ ১৭ ফুট × ২১ ফুট। মাঝে ছিল বেড়া, দূরত্ব ১০০ গজ। সেই সঙ্গে অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের অবস্থানের কথাও জানা যায়। ফৈজাবাদের লোকবিশ্বাস অনুযায়ী মুসলমান শাসকদের আমলেও হিন্দুরা তাঁদের ধর্মস্থানে পুজো দিতে পারতেন শাসকের ইচ্ছানুযায়ী। আকবর এই অনুমতি দেন, ঔরঙ্গজেব দেন নি। অযোধ্যার নবাবি-আমলে আবার অনুমতি দেওয়া হয়। নিকটবর্তী হনুমানগড়ি মন্দিরের পাণ্ডাদের পুরানো নথিপত্র থেকে দেখা যায় যে, নবাবদের বহু পদস্থ মুসলমান কর্মচারী হিন্দু পুজারীদের উপহার দিয়েছেন। ওয়াজেদ আলি শাহর সময় সম্প্রীতি থাকলেও ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকেরাই দুই সম্প্রদায়ের মনে বিদ্বেষের বীজ বপন করে।

১৮৫৫ এবং ১৯৩৪-৩৬ খ্রী. দুবার দাঙ্গা হলেও ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত আর কোনো বড়ো বিবাদের, হানাহানির কথা জানা যায় না।

সমস্যার সূত্রপাত হল ভারত স্বাধীন হওয়ার পর। সঠিকভাবে বলতে গেলে, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ খ্রী যখন রামচন্দ্রের এবং সীতাদেবীর মূর্তি "অলৌকিক-ভাবে" নিজে-নিজেই জন্মস্থানে আবির্ভূত হলেন। সরকার এই স্থানকে 'বিতর্কিত' ঘোষণা করলেন; নানা মামলামোকদ্দমা শুরু হল। আসলে, উত্তর প্রদেশের তদানীন্তন সরকারি প্রতিবেদন ও কাগজপত্রেই দেখা যায়, ঘটনার প্রকৃত বিবরণ ও চরিত্র; সমস্যা তৈরি করা হল সাম্প্রদায়িক উগ্রতার কারণে। তা-ই বাড়তে-বাড়তে অধুনা রামজন্মভূমি 'অ্যাকশন কমিটি', বাবরি মসজিদ 'অ্যাকশন কমিটি'—পরস্পরের জেহাদ। গরিষ্ঠের হুংকার, লঘিষ্ঠের প্রতিবাদ! কিভাবে কারা এই সমস্যা কেন সৃষ্টি করলেন—আমরা সে আলোচনায় যাব না। শুধু ধর্মবাদীরা ইতিহাসের যে অপব্যবহার করেছেন তাই প্রমাণ করার চেষ্টা করব। (সমস্যা-সৃষ্টির বিস্তারিত খবরের জন্য দ্র A. G Noorani, *The Babri Masjid-Ram Janmabhumi Question, E.P.W.*, Nov. 4-11, 1989)।

রামচন্দ্র, অযোধ্যা ও রাম-জন্মভূমি

রামজন্মভূমি প্রশ্নটি আলোচনা করার আগে দুটি প্রশ্ন আলোচনা ক'রে নিলে আলোচনার সুবিধে হবে। প্রথম হচ্ছে: রামচন্দ্র কে? ঐতিহাসিক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়াত অধ্যাপক ড. সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য এর সহজ, সঠিক, সুন্দর অথচ সংক্ষিপ্ততম উত্তর দিয়েছেন: **'রাম রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক।** তিনি গোঁড়া হিন্দুদের বিবেচনায় পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতার এবং এখনো তাঁদের লক্ষ-লক্ষ ব্যক্তির দ্বারা পূজিত' (বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের। দ্র *A Dictionary of Indian History*, 2nd revised ed., Calcutta University, 1972, p 767)।

এইটি ঐতিহাসিকের কাছে গ্রহণীয় নিরপেক্ষ পরিচিতি। অর্থাৎ রামচন্দ্র—রামায়ণ অনুসারে অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র। রাম মহাকবি বাল্মীকি-রচিত মহাকাব্যের নায়ক। এবং তিনি ভক্ত ও ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের বিশ্বাস অনুযায়ী ভগবানের অবতার, তাই পূজিত হয়ে আসছেন। কোথাও বলা হয় নি, যে রামচন্দ্র ঐতিহাসিক চরিত্র। আমরা এ কথা বলতে চাইছি না যে, রাম নামে কোনো ব্যক্তি বা চরিত্র কোনোকালে বাস্তবে ছিলেন না, তবে অদ্যাবধি কোনো ইতিহাসবিদ বলেন নি রাম ঐতিহাসিক চরিত্র এবং তাঁর যুগ কোন্ সময়। যেহেতু ইতিহাসে তার কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ না থাকলে বা প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য না থাকলে শুধুমাত্র কাব্যে বর্ণিত স্থান ও চরিত্রের সত্যতা ইতিহাসবিদেরা স্বীকার করতে পারেন না। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসকারদের নিকট জ্ঞাত—এর পূর্বে মহাকাব্যের যুগ, তার আগে বৈদিক যুগ, তারও আগে সিন্ধুসভ্যতার যুগ (খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের আগেকার যুগগুলি সম্বন্ধে কালানুক্রম-সহ অনেক ধারণাই আনুমানিক, এবং ফলত বহু মতভেদ আছে)। খ্রীষ্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতকের ষোড়শ মহাজনপদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসের যেসব উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক চরিত্র ইতিহাসে স্মরণীয়, যেমন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক, কণিষ্ক, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, হর্ষবর্ধন, ইলতুতমিস, বলবন, আলাউদ্দিন খলজী, মহম্মদ-বিন তুঘলক, বাবর, আকবর, শাহজাহান, ঔরঙ্গজেব, ক্লাইভ, কর্নওয়ালিস, ওয়েলসলি, ডাল-হৌসী, কার্জন থেকে গান্ধী, নেহরু, সুভাষ পর্যন্ত, রামচন্দ্রকে সেই গোত্রে আদৌ ফেলা যায় না।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটি। রামায়ণ-রচয়িতা কে ও রচনাকাল কখন? এর সহজ, সুন্দর এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়েছেন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে বিদুষী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপিকা ড. সুকুমারী ভট্টাচার্য: 'রচনাকালের দিক থেকে দেখলে রামায়ণ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় বা দ্বিতীয় থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় দশকের মধ্যে রচিত; মহাভারত রচনা সম্ভবত শুরু হয় খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম বা চতুর্থ শতক থেকে এবং শেষ হয় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতকে। অর্থাৎ বুদ্ধের পরের আট বা ন-শ বছরের মধ্যে এ দুটি মহাকাব্য রচিত হয়; এদের মধ্যে মহাভারত আগে শুরু হয়ে পরে শেষ হয়, রামায়ণ পরে শুরু হয়ে আগে শেষ হয়; আগে পূর্ণকলেবর মহাকাব্যের রূপ পায় বলেই সম্ভবত এর নাম আদিকাব্য। মনে রাখতে হবে, রামায়ণ শেষ হবার কাছাকাছি সময়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে: কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, বাৎস্যায়নের কাম-সূত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং মনুসংহিতা এই ক্রান্তি-কালের রচনা এবং এর কিছু পরেই শুরু হয়ে যায় পুরাণগুলির রচনা। রামায়ণ ও মহাভারতে পরবর্তী সংযোজিত অংশগুলি অভিপৌরাণিক অর্থাৎ পুরাণে প্রতিফলিত যে সামাজিক মূল্যবোধ ও শাস্ত্রীয় অনু-শাসনের সমাবেশে ভারতীয় ধর্মচিন্তা, তার বিবর্তিত-রূপে ক্রমে 'হিন্দুধর্ম' বলে অভিহিত হল, এই অভি-পৌরাণিক অংশেই আমরা সেগুলির সাক্ষাৎ পাই। এদিকে রামায়ণের ও মহাভারতের মূল কাহিনী দুটি সম্ভবত অনেক প্রাচীনকাল থেকেই গাথায়, আখ্যানে জনমানসে সঞ্চরণ করছিল, ফলে মহাকাব্য দুটিতে ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের দুটি চিত্র পাই: একটি মূল কাহিনীর আর একটি সংযোজিত বা প্রক্ষিপ্ত অভিপৌরাণিক অংশের।' (দ্র. **প্রাচীন ভারত: সমাজ ও সাহিত্য**, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯৪, পৃ ১০০)।

রাম এবং রামায়ণ সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, বহু পুরাতন কালে রামচন্দ্র নামে কোনো রাজা থাকতেও পারেন, নাও পারেন—রামের কাহিনী প্রচলিত ছিল, যার কোনো অস্তিত্ব এখন আর নেই। গাথা, আখ্যান, জনশ্রুতি এবং কিংবদন্তীর কাহিনীই দীর্ঘ মহাকাব্যের আকারে পুনর্লিখিত হয় বাল্মীকির দ্বারা প্রথম বা আদিকাব্যে। এটি যেহেতু মহাকাব্য, এর বহুলাংশই তাই কল্পিত ঘটনা। অনেক সময়ই তো লোকবিশ্বাসের ধারণার সঙ্গে ইতিহাসের সাক্ষ্য-প্রমাণ পরস্পরবিরোধী হয় এবং ঐতিহাসিকের কাছে কল্পিত মহাকাব্যের কাহিনীর চাইতে পাথুরে প্রমাণ অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। (রামায়ণ সম্বন্ধে সাম্প্রতিক গবেষণার প্রামাণিক গ্রন্থের জন্য দ্রষ্টব্য J. L. Boockington, *The Righteous Rama*, Oxford University Press, 1984)। লেখক দেখিয়েছেন কিভাবে একটি ক্ষত্রিয় বীরের কাহিনী ধীরে-ধীরে ধর্মগ্রন্থে পরিণত হল এবং ক্ষত্রিয়বীর কিভাবে এক অবতারে পরিণত হলেন পরবর্তী অভি-পৌরাণিক প্রক্ষেপগুলির দ্বারা।

বাল্মীকির রামায়ণ অনুযায়ী বা কিংবদন্তী ও মাইথোলজি অনুসারে, চার যুগ কল্পনা করা হয়, তার সঙ্গে ঐতিহাসিকদের যুগবিভাগের কোনো সম্পর্ক নেই। রামায়ণের মধ্যে তো শুধু বাল্মীকির রচনা নেই—কারণ কোনো ব্যক্তি তো চার-পাঁচশো বছর ধরে কোনো কাব্যরচনা করতে পারেন না—স্বাভাবিক-ভাবেই বহু প্রক্ষিপ্ত অংশ তাতে আছে। সেই রামায়ণ অনুসারে অযোধ্যার রাজা রাম ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যা হচ্ছে কলিযুগের হাজার বছর আগে। কলিযুগের সূচনা নাকি হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০১২ অব্দে। এরকম কোনো যুগের কথাই ইতিহাসবিদরা জানেন না। বস্তুত, রাম চরিত্র যেমন কবির কল্পনা হিসেবে অনেকাংশেই কল্পিত সাহিত্যিক চরিত্র, বাল্মীকির রামায়ণের অযোধ্যাও অনেকটাই মনোগড়া কল্পনা-মাত্র, ইতিহাসের সঙ্গে তার অনেক ফারাক।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আলোচ্য মূল প্রশ্ন-গুলি হল রামায়ণের অযোধ্যা আর আজকের অযোধ্যা কি এক? অযোধ্যাই কি রামের জন্মভূমি? যদি হয়, তাহলেও কি নির্দিষ্ট কোনো স্থান বলা সম্ভব?

এ ব্যাপারে ইতিহাসের কী সাক্ষ্য? ঐতিহাসিকরাই বা কী বলেন? রামজন্মভূমি যদি নির্দিষ্ট করা না যায়, তাহলে রামজন্ম-মন্দিরও কি কল্পনা নয়? আমরা এবার এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব।

(১) রামচন্দ্র (সূর্যবংশীয় এই নৃপতি জনমানসে প্রচলিত গাথা-আখ্যান ও বিশ্বাস অনুযায়ী এবং রামায়ণ অনুসারে অযোধ্যায় দশরথের পুত্র হিসেবে যদি বাস্তবে রাজত্ব করেও থাকেন) ঠিক কোন্ যুগের মানুষ, তা বলা মুশকিল। কিংবদন্তী অনুসারে, ত্রেতা-যুগে, কারো মতে খ্রীষ্টপূর্ব ন-হাজার বছর আগে, কারো মতে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪-১৫ শতকের। প্রাচীন ইতিহাসের কোনো প্রমাণই নির্দিষ্টভাবে এ-ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করে না। প্রয়াত প্রত্নতত্ত্ববিদ অধ্যাপক সাংকালিয়াকে (H D. Sankalia) প্রশ্ন করা হয়েছিল: 'আপনি কি সুনির্দিষ্টভাবে অযোধ্যার ঠিক কোন্ জায়গায় রাম জন্মেছিলেন বলতে পারেন?' তিনি জবাব দেন, 'না। আমি মনে করি এটা বলা সম্ভব নয়' (অনূদিত। দ্র. *Sunday*, March 27, 1988)। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ ও ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সাংকালিয়ার মতোই, অপর প্রাচীন ইতিহাসবিশেষজ্ঞ, ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের (নতুন দিল্লী) প্রাক্তন চেয়ারম্যান ও ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ড. রামশরণ শর্মার মতে, 'যদি বর্তমান অযোধ্যাকে রামচন্দ্রের রাজধানী বলে ধরে নেওয়া হয়, তিনি সত্যিই সেখানে বসবাস করতেন কিনা তা গভীর সন্দেহের বিষয়' (অনূদিত। দ্র. *The Times of India*, April 12, 1987)।

(২) নতুন দিল্লীর 'টাইমস অব ইনডিয়া' পত্রিকায় 'আওরঙ্গজেবের পর কৃষ্ণের জন্মস্থান' শীর্ষক একটি সংবাদ প্রকাশিত হলে এক প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন। (ওই পত্রের প্রকাশ-তারিখ দিল্লী সংস্করণে অকটোবর ২১, ১৯৮৬, বোম্বাই সংস্করণে অকটোবর ২৮, ১৯৮৬) নতুন দিল্লীর জওয়াহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ যাঁদের মধ্যে আছেন রোমিলা থাপার, সর্বপল্লী গোপাল, বিপানচন্দ্র, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, মুজফফর আলম, হরবনস মুখিয়া, মাধবন পালাত, সতীশ সবেরওয়াল, আর চম্পকলক্ষ্মী প্রমুখ। তাঁদের বক্তব্যের তিনটি পংক্তি উদ্ধার যোগ্য:

'It creates the kind of confusion such as has been created, probably deliberately, over the question of the birthplace of Rama in the matter of Rama Janmabhoomi/ . . It would be worth enquiring whether there is reliable historical evidence of a period prior to the nineteenth century for this association of a precise location for the birthplace of Rama/.... It is a debasement of history to distort these events for present day communal propaganda.'

এই জওয়াহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বর্তমান প্রধান ড. কে. এন. পানিক্করের উদ্যোগে বিতর্কিত রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ স্থানটি ধর্মস্থান হিসেবে কোনো সম্প্রদায়ের হাতে না দিয়ে জাতীয় সৌধ হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রক্ষণাবেক্ষণের এক প্রস্তাব গ্রহণ করে যা ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়, এবং তা ছাড়া ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনটার ফর হিস্টরিক্যাল স্টাডিজের পক্ষ থেকে এক প্রচারপুস্তিকা প্রকাশ করা হয় ইংরেজিতে যাতে বিভাগের সাতাশ জন ইতিহাসবিদ স্বাক্ষর করেন (পুস্তিকাটির এক বঙ্গানুবাদের জন্য দ্র. গৌতম চট্টোপাধ্যায়, "রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইতিহাস-বিকৃতি", কালান্তর, ১৩ ডিসেম্বর, ১৯৮৯)।

(৩) অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, সুপ্রাচীন যুগে যে অঞ্চলে বর্তমানের অযোধ্যা সেখানে আদৌ জনগণের বসতি ছিল না; অন্তত পুরাতত্ত্বে তেমন সাক্ষ্য নেই। অযোধ্যার প্রাচীনতম জনবসতির সাক্ষ্য পাওয়া যায় খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকে, কিন্তু সেখানেও বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যার চেয়ে ঢের বেশি আদিম জীবনযাত্রার প্রমাণ পাওয়া যায়।

(৪) পূর্বোক্ত খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতকের পুরাতত্ত্বে সাক্ষ্য থেকে মনে হয় না যে অযোধ্যা অঞ্চলে কোনো শহর ছিল, জীবনযাত্রা ছিল গ্রামীণ। অথচ রামায়ণের বর্ণনা অনুসারে অযোধ্যা শহরে অট্টালিকা ও প্রাসাদের বর্ণনা আছে।

(৫) অযোধ্যা ঠিক কোথায় ছিল, তাও বলা মুশকিল। ভিনসেনট স্মিথ, আলেকজানডার কানিংহাম, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত গবেষণায় যতদূর জানা গেছে এবং বর্তমানে স্বীকৃত, তাতে প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্বের কাল পর্যন্ত ভারতের ধারাবাহিক রাজনৈতিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। খ্রী.পূ ষষ্ঠ শতকেই 'ষোড়শ মহাজনপদ' উত্তর ভারতে গড়ে ওঠে যার অন্যতম ছিল কোশল (বাকিগুলি কাশী, অঙ্গ, মগধ, কুরু, চেদী, মৎস, গান্ধার ইত্যাদি)। এই কোশল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল অযোধ্যা। অঙ্গুত্তরনিকায়, ভগবতীসূত্র ইত্যাদি বৌদ্ধ-জৈন গ্রন্থগুলিতে ছয়টি প্রধান নগরের নাম পাওয়া যায়—চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, সাকেত, কৌশাম্বী আর বারাণসী। তাতে অযোধ্যার নাম নেই। অন্যান্য নগরের মধ্যে যেমন বৈশালী, তক্ষশিলা, মথুরা, অহিচ্ছত্র, কুশীনারা, ইন্দ্রপ্রস্থ, উজ্জয়িনী পাই, অযোধ্যা নেই। কোশলরাজ্যের মধ্যে দুটি শহর শ্রাবস্তী আর সাকেত, প্রথমটি রাজধানী। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, সাকেত-ই পরবর্তী কালের অযোধ্যা, যদিও রিস ডেভিডস উল্লেখ করেছেন যে গৌতম বুদ্ধের সময় দুটি স্বতন্ত্র শহরের অস্তিত্ব ছিল। কোনো-কোনো পরবর্তী পুরাণে এক অযোধ্যার উল্লেখ আছে, তা গঙ্গাতীরে—সরযূতীরে নয়। মনে হয় এই অনুমানই যুক্তিসঙ্গত যে সরযূনদীর তীরস্থ প্রাচীন সাকেত শহরই অযোধ্যায় নামান্তরিত।

(৬) পঞ্চম শতাব্দীতে এই নামান্তর হয়েছিল। উত্তর ভারতে গুপ্তশাসনের তখন শেষ যুগ। সিংহাসনে স্কন্দগুপ্ত (খ্রী ৪৫৫-৩৬৭)। তিনি সাকেতকে তার অন্যতম ঘাঁটি করেন। মগধের উত্থানের পর ভারতের ইতিহাসে মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত যুগ পার হয়ে তখন অনেক জল বয়ে গেছে। স্বাধীন কোশল আর নেই। স্কন্দগুপ্ত হূনদের এক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সাফল্য অর্জন করার পর 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর স্বর্ণমুদ্রায় তা ব্যবহৃত। এইভাবে মহাকাব্যের অযোধ্যা সাকেতের সঙ্গে মিশে গিয়ে থাকতেও পারে। স্কন্দগুপ্ত রামভক্ত কিনা জানা যায় না, তবে সম্ভবত তিনি জনমানসে প্রচলিত সূর্যবংশীয় বা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রামের ঐতিহ্যকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন।

(৭) স্থানীয় লোকগাথা অনুসারে, ত্রেতাযুগের পর অযোধ্যা অবলুপ্ত হয় এবং বিক্রমাদিত্য তাকে পুনরাবিষ্কার করেন। এ নিয়ে একাধিক ধর্মীয় রূপকথা আছে, যার মাধ্যমে পঞ্চম শতাব্দী থেকে শহরকে ঘিরে এক ধর্মীয় বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা হয় যা তার আগে ছিল না। তবে বিক্রমাদিত্য রামের জন্মস্থান আবিষ্কার করার পর কোনো মন্দির স্থাপন করেন, এমন সাক্ষ্যপ্রমাণ ইতিহাসে নেই।

(৮) সপ্তম শতাব্দীর পর থেকে অনেক বইপত্রে, পুরাণে, লোককাহিনীতে অযোধ্যার কথা স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে। এমনকী আরো উত্তরকালে বিষ্ণুধর্মোত্তর মহাপুরাণ রামায়ণ অনুসারে অযোধ্যাকেই বলছেন কোশলের প্রাচীন রাজধানী, শ্রাবস্তী নয়। অর্থাৎ জনগণের বিশ্বাস অনুযায়ী ইতিহাস বদলে যাচ্ছে।

(৯) খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে সাকেত, প্রাচীন কোশলের অন্যতম বড়ো শহর, রামায়ণের অযোধ্যার সঙ্গে একাত্ম করা হলেও, সেই শহরের ঠিক কোথায় রাম জন্মেছিলেন তা বলা সম্ভব হয় নি। তুলনায় বুদ্ধের জন্মস্থান অনেক সুনিশ্চিত। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তুও একদা কোশলরাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। যাই হোক, বুদ্ধের মৃত্যুর অনেক পরে মৌর্য সম্রাট অশোক বৌদ্ধ জন্মস্থানকে স্মরণীয় করার জন্য লুম্বিনী গ্রামে (বর্তমানে নেপালে) একটি শিলালেখ স্থাপন করেন, কিন্তু সেখানেও জন্ম বা

জায়গা নির্দেশ করা যায় নি। তা ছাড়া খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে অযোধ্যা রামপূজার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে নি। (আরো দ্রষ্টব্য Gyanendra Pandey, "Ayodhya Myth", The Sunday *Statesman*. Miscellany, Dec 3, 1989)।

(১০) পঞ্চম থেকে অষ্টম শতাব্দীর বহু লেখাতেই অযোধ্যার উল্লেখ আছে, কিন্তু কোনো শিলালিপিতেই বলা নেই যে ওই শহর রামপূজার প্রধান কেন্দ্র বা রামজন্মভূমি কোন্ জায়গায়।

(১১) সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন সাঙ লিখে গেছেন যে অযোধ্যা বৌদ্ধ ধর্মেরও একটি বড়ো কেন্দ্র। সেখানে আছে বহু বৌদ্ধ মঠ আর স্তূপ এবং বহু বুদ্ধভক্ত মনে করেন যে অযোধ্যা তাঁদের কাছে পবিত্র যেহেতু তথাগত ওখানেও কিছুদিন অতিবাহিত করেছেন।

(১২) অযোধ্যা অঞ্চলে খননকার্যের ফলে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ ও তৃতীয় শতকের পোড়ামাটির জৈনমূর্তি পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন—একদা এখানে জৈন তীর্থও ছিল। জৈন ভক্তরাও মনে করেন যে, তাঁদের প্রথম ও চতুর্থ তীর্থঙ্কর অযোধ্যার বাসিন্দা ছিলেন।

(১৩) একাদশ শতাব্দীর একটি লেখাতে অযোধ্যাকে গোপতরুতীর্থ বলা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও রামজন্মভূমির কোনো উল্লেখ নেই। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে মুসলমান সুলতানি শাসকদের আমলে অযোধ্যা অঞ্চলে রামপূজার তেমন প্রচলন ছিল না। হিন্দুদের মধ্যে শৈবরাই ছিলেন প্রধান, তাঁদের মন্দিরমঠও ছিল। প্রচলিত লোকবিশ্বাস ও জনমত অনুযায়ী, মুঘল যুগে মসজিদ নির্মিত হওয়ার পরও তার পাশেই একস্থানে হিন্দুরাও অর্চনা দিতেন। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হিন্দি-ভাষায় রামকাহিনী জনপ্রিয় ভঙ্গিমায় সন্ত তুলসীদাস কর্তৃক লিখিত হওয়ার পরই অন্যান্য হিন্দি বলয়ের মতো অযোধ্যাতেও রাম-কথা বিশেষ জনপ্রিয় হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে হিন্দু মঠ মন্দির রামের নামে নির্মিত হতে থাকে। রামজন্মভূমি ও মন্দিরের পরিবর্তে তা ধ্বংস করে মসজিদ—এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হতে শুরু করে। অথচ ইতিহাস এ বিষয়ে কোনো সাক্ষ্য দেয় না।

(১৪) সম্প্রতি ভারত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগ (Archaelogical Survey of India) ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন অধিকর্তা বি. বি. লালের অধীনে যে বিস্তৃত অনুসন্ধান ও খননকার্য চালান, তাতে দেখা যায় যে, বর্তমান অযোধ্যা যে রামের জন্মভূমি ছিল বা এটাই যে প্রাচীন অযোধ্যা বা মসজিদের স্থানে বা আশেপাশে জন্মস্থানের স্মরণে কোনো মন্দির নির্মিত হয়েছিল – এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। আশির দশকে কয়েকজন গবেষক ব্যক্তিগত উদ্যোগে সন্ধান চালিয়ে দেখেন রামজন্মস্থান বলে সাতটি জায়গা বিভিন্ন ব্যক্তি দেখাচ্ছেন। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। (দ্র *Journal of Indian Archaelogy*, 1976-77, Report of the Investigation, by correspondents, Nilanjan Mukhopadhyay *Sunday Mail*, Nov. 20, 1988 & by Pankaj Pachauri, *India Today*, Jan 15, 1989 ; Surinder Kaur, "Is Babri Masjid Site the Birthplace of Rama ?" *Radiance*, Aug 13, 1989)।

বাবর এবং বাবরি মসজিদ

মুঘল বাদশাহ বাবর কি বাবরি মসজিদ তৈরি করেছিলেন? প্রশ্নটিই অদ্ভুত মনে হয়। কারণ বাবর যদি না তৈরি করেন তাহলে মসজিদের নামটি বাবরি মসজিদ হল কী করে? অথচ মজার ব্যাপার তাই। যদিও মোটামুটিভাবে ধরে নেওয়া হয় যে, মসজিদটি বাবরের 'নির্দেশে' তৈরি করা হয়েছিল, তবুও কিন্তু এ ব্যাপারে যথেষ্ট সংশয় আছে। বস্তুতপক্ষে বাবরি

মসজিদ যে বাবর তৈরি করেছিলেন কিংবা তাঁর নির্দেশে তাঁর অনুগত অন্য কোনো ব্যক্তি নির্মাণ করেছিলেন, সমসাময়িক দলিলে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য নেই। যেমন এখনও পর্যন্ত কেউ কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করেন নি যে, বাবরি মসজিদ যে ভূখণ্ডে নির্মিত, সেই জায়গায় আগে একটি মন্দির ছিল।

যাঁরা বাবরি মসজিদের ক্ষেত্রে মসজিদ রক্ষার জন্য পূর্ণ আনুগত্য এবং নিরঙ্কুশ সমর্থন জানিয়েছেন, তাঁরা ধরেই নিয়েছেন যে মসজিদটি বাবরের তৈরি। সুতরাং এখানে তাঁদের বিশ্বাসই বড়ো, ঐতিহাসিক সত্য নয়। আবার এর সঙ্গে যেহেতু তাঁদের ধর্মীয় চেতনা আর বিশ্বাস যুক্ত, তাই যুক্তির চেয়ে বড়ো হচ্ছে আবেগ। ঠিক তেমনি, যাঁরা রামজন্মভূমির ক্ষেত্রে মন্দির নির্মাণের জন্য পূর্ণ উদ্যম ও সক্রিয় সহযোগিতা জানিয়েছেন, তাঁরা ধরেই নিয়েছেন যে বাবর যেহেতু গোঁড়া মুসলমান, তাই অ-হিন্দু ইসলামধর্মাবলম্বী সম্রাটের পক্ষে মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ স্বাভাবিক। এখানেও, তাঁদের বিশ্বাসই বড়ো, ঐতিহাসিক সত্য নয়। এখানেও তাঁদের বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় আবেগ। তাই যুক্তির চেয়ে আবেগই হয়েছে বড়ো।

অথচ ইতিহাসে আবেগের স্থান নেই, সেখানে প্রাধান্য তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে গঠিত সত্যনিষ্ঠ সিদ্ধান্তের।

তবে 'বাবরি মসজিদ' কথাটির উৎপত্তি কিভাবে? যাঁরা এই নামটি জোর দিয়ে বলেন তাঁদের দাবির পিছনে রয়েছে মসজিদের গায়ে খোদিত লেখা। কী আছে এই লেখায় সেকথা একটু পরেই আসব। স্বীকার করতেই হবে—মসজিদ একটি হয়েছিল, কারণ মসজিদটি এখনও বিদ্যমান। আর যাঁরা বিশ্বাস করেন এই মসজিদ বাবরের কীর্তি, তাঁদের মতে ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাবর বিহারের পাঠান-শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান চালানোর সময় অযোধ্যায় শিবির স্থাপন করেছিলেন। সেই সময় তাঁর নির্দেশে আমীর মীর বাকি (Mir Baqi) একটি মসজিদ নির্মাণ শুরু করেন, যা ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়।

দুর্ভাগ্যবশত, বাবর অযোধ্যায় কখনো গিয়েছিলেন কিনা কিংবা বিহারের পাঠান-শক্তির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়ার সময় ফৈজাবাদ দিয়েই গিয়েছিলেন কিনা, আজ সন্দেহাতীতভাবে তা বলা সম্ভব নয়। আমরা কোনো সমসাময়িক সূত্র থেকে এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই না। আমরা যদি এইখানে ভারতবর্ষে বাবরের কর্মকাণ্ড এবং তাঁর বিষয়ে প্রাথমিক সূত্রগুলি সেই সূত্রে আলোচনা করি, তাহলে তা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বাবরের সম্পর্কে জানার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য, প্রামাণিক এবং প্রাথমিক সূত্র বাবরের আত্মজীবনী, যা তুর্কি ভাষায় তিনি রচনা করেছিলেন। নাম "তুজুক-ই-বাবুরি"। তুর্কি পাঠ প্রকাশ করেন ইলমিনস্কি (Ilminski) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। এবং আর একটি প্রকাশ করেন অ্যানেট সুসান বেভারিজ (A. S. Beveridge) ১৯০৫ খ্রী। এই শেষোক্ত সংস্করণ সম্ভবত হায়দরাবাদে রক্ষিত কপির ফ্যাকসিমিলি। (দ্র জার্নাল অব দ্য রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯০৬, পৃ ৮৭)। এই তুর্কি আত্মজীবনীটি পরবর্তী কালে ফরাসি ভাষায় ভাষান্তরিত হয়। এগুলির মধ্যে দুটি প্রধান। একটি করেন পায়ানাদা হাসান, অপরটি মির্জা আবদুর রহিম। এই আত্মজীবনী একাধিক ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত এবং প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনটি। প্রথমটি আরস্কাইন ও লিডেন (Erskine and Leyden) ১৮২৬ খ্রী মুদ্রিত (কিংস এডিশন, লনডন, দু খণ্ড), যা পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ফারসি পাঠের ইংরিজি অনুবাদ। দ্বিতীয়টির অনুবাদক Pavet De Courteille, ১৮৭১ খ্রী মুদ্রিত ইলমিনস্কির পূর্বোক্ত তুর্কি পাঠের অনুবাদ। দুটি অনুবাদই ত্রুটিপূর্ণ। তৃতীয় অনুবাদটি সর্বাপেক্ষা নির্ভরশীল এবং বহুল ব্যবহৃত ইংরিজি অনুবাদ। এটিও হায়দরাবাদ পাঠের ভাষান্তর। "বাবরনামা" শীর্ষক

এই অনুবাদটির রচয়িতা অ্যানেট বেভারিজ। ১৯২১-২২ খ্রী. লনডন থেকে প্রকাশিত। সম্প্রতি নতুন দিল্লী থেকে "বাবরনামা"র দু-খণ্ডের এক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭২-এ। প্রতিটি অনুবাদের ক্ষেত্রেই মূলানুগত্যের প্রশ্ন তো আছেই, কেননা অনুবাদকগণ সর্বদা সঠিক শব্দার্থ ব্যবহার করেন নি। এর চেয়ে বড়ো প্রশ্ন হল বাবর তাঁর নিজের জীবনের সব ঘটনা আনুপূর্বিক আত্মকথায় লেখেন নি। বিশেষত ১৫০৩-০৪ খ্রী, ১৫০৮-১৯ খ্রী এবং ১৫২০ খ্রী ফাঁক থেকে গেছে। এই ফাঁকগুলি পূরণের জন্য আমাদের নির্ভর করতে হয় সমসাময়িক অন্য সূত্রগুলির উপরে।

এই অন্য সূত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কেতাবগুলি হল বাবরের সম্পর্কিত ভাই মির্জা হায়দার দুঘলাট (১৪৯৯-১৫৫১) রচিত 'তারিখ-ই-রশিদি' (১৫৫১)। এটির ইংরাজি অনুবাদ করেছেন N Elias এবং Denison Ross একত্রে; লনডন, ১৮৯৮। খোয়ান্দ আমির (১৪৭৪-১৫৩৪)-রচিত 'হাবিব উস্ সিয়ার' (১৫২১-২৯) ইয়োরোপীয় ভাষায় অনূদিত হয় নি। তা ছাড়া আছে জৈনুদ্দিনের 'ওয়াকিয়াত-ই-বাবুরি'। জৈনুদ্দিন ছিলেন বাবরের কর্মচারী। তা ছাড়া উল্লেখযোগ্য বাবরের কন্যা গুলবদন বেগমের (১৫২৩-১৬০৩) "হুমায়ুননামা" (১৫৮৭) যদিও স্থানে-স্থানে পক্ষপাতপূর্ণ। শ্রীমতী অ্যানেট বেভারিজ এই কেতাবটির (ফারসি ভাষায় রচিত) একটি সম্পাদিত ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন (রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, লনডন, ১৯০২)। এ ছাড়া, বাবরের জীবনীকার রাসক্রক উইলিয়ামস ব্যবহার করেছিলেন আরো তিনটি সমসাময়িক পুস্তক —মিরজা মহম্মদ সালিহ্-রচিত "শাইবনিনামা" (সম্ভবত A. Vembery-কৃত অনুবাদ); মিরজা সিকান্দার মুনশি-রচিত "আলিম আরাই আব্বাসি"; মিরজা বরখোয়ারদার-রচিত "আসান উস্ সিয়ার"। এইসব কেতাবগুলি ছাড়াও বাবর সম্পর্কে জানার জন্য আরো পাঁচ-ছটি গৌণ সূত্র আছে। যেমন, আবদুল হক দেহলভি-রচিত "তারিখ ই হককি" এবং হাসান-রচিত "আসান উত্ তাওয়ারিখ"। দুটি কেতাবের অবিকল পাণ্ডুলিপি অকসফোর্ডের বোদলিয়ার লাইব্রেরিতে আছে। মোল্লা মুহম্মদ কাশিম (১৫৭০-১৬২৩), যিনি ফেরিস্তা নামেই অধিক পরিচিত, তাঁর "গুলশন-ই-ইব্রাহিমি" বা "নৌরসনামা" যা "তারিখ-ই-ফেরিস্তা" (১৬১৯-২০) নামে সুপরিচিত। এতে বাবর সম্পর্কে অনেক তথ্য আছে (জে. ব্রিগস্-এর ইংরিজি অনুবাদও পাওয়া যায়)। উপরোক্ত প্রাথমিক এবং গৌণ সূত্রগুলি ছাড়াও প্রায়-সমসাময়িক বাবরের পৌত্র আকবরের সময়কালীন দুজন লেখকের রচনাও কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োজন। এই দুই লেখক হলেন (মিরজা অথবা খাজা) নিজামুদ্দিন এবং আবুল ফজল। নিজামুদ্দিন আহমেদ -রচিত "তবাকাৎ-ই-আকবরী" (১৫৯২-৯৪) বা "তবাকাৎ-ই-আকবরশাহী" (ব্রজেন্দ্রনাথ দে, এম. হিদায়েত হুসেন, বেণীপ্রসাদ প্রভৃতি পণ্ডিতজনের সাহায্যে এর অনেকাংশ অনূদিত) এবং শেখ আবুল ফজলের (১৫৫০-১৬০২) "আকবর-নামা"। (এর বহু অনুবাদ আছে, মুদ্রিত সংস্করণ আছে। ফারসি মুদ্রণ, তিন খণ্ড বিবলিওথেকা ইনডিকা, কলকাতা, ১৮৭৩-৮৭; ইংরিজি সং অনু. হেনরি বেভারিজ, তিন খণ্ড, ১৮৯৭-১৯২১)।

বাবর সম্পর্কে সমসাময়িক তথ্য-প্রাপ্তির জন্য প্রাথমিক উপাদানগুলির সবিস্তার উল্লেখ করা হল এই জন্য যে, কোথাও বাবরের অযোধ্যা অভিযান, কিংবা বিহারের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় অযোধ্যায় অবস্থান এবং তার সময়-তারিখ এবং সেই অবস্থান-কালীন সময়ে তথাকথিত রামজন্মভূমির স্থানে, মন্দির ভেঙে অথবা না ভেঙে মসজিদ গড়ার কোনো উল্লেখ নেই। এই কাকতালীয় ব্যাপার যুক্ত হয় উনিশ শতক থেকে ইংরেজ লেখকদের দ্বারা। আমরা সে প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব।

আমরা সবাই জানি যে, বাবর ১৫২৬ খ্রী পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদীবংশীয় সুলতান ইব্রাহিম

লোদীকে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা বা পত্তন করেছিলেন। দুর্ভাগ্য-বশত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেও তিনি এই নব-গঠিত মুঘল শক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা কিংবা সাম্রাজ্যকে বিস্তারিত করা কিংবা সাম্রাজ্য গঠনের পর ভোগ করা—এসব কিছুই করতে পারেন নি। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ ডিসেমবর মাত্র ৪৮ বছর বয়সে আগ্রাস্থিত মনোরম উদ্যানগৃহে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস নির্গত হয়। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে প্রথম বাবর সম্পর্কে সবিস্তার না হলেও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন William Erskine তাঁর *A History of India at the Time of Babur and Humayun* শীর্ষক গ্রন্থে (লনডন, ১৮৫৪)। এর পর ইংরাজি ভাষায় দুটি সুলিখিত জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়, যা অদ্যাবধি ইতিহাসের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বাবর সম্পর্কে জানার জন্য অপরিহার্য। এই দুটি হল স্কটল্যানডের ডাবলিনের ট্রিনিটি কলেজের আরবি ভাষার অধ্যাপক স্ট্যানলি লেন-পুল (Stanley Lane-Poole) লিখিত *Babur* (মূল সং, 1899, শেষ ভারতীয় সং, S. Chand & Co, New Delhi, 1971), যা Rulers of India সিরিজে স্যর উইলিয়ম উইলসন হানটারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় এবং অপরটি হল একদা এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক রাসক্রক উইলিয়মস (L. F. Rushbrook Williams) লিখিত *An Empire Builder of the Sixteenth Century* (Allahabad University Lectures, 1915-16, পরবর্তী সং S. Chand & Co, নতুন দিল্লী, তারিখ নেই)।

সমসাময়িক তুর্কি বা ফারসি কেতাবগুলি বা পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের গবেষণাধর্মী রচনা-বলীগুলি থেকে পানিপথের প্রথম যুদ্ধের (২০ এপ্রিল, ১৫২৮) থেকে বাবরের মৃত্যু (২৬ ডিসেমবর ১৫৩০) পর্যন্ত ইতিহাস যতদূর আমরা জানতে পারি, তাতে স্পষ্ট ভাষায় এমন কোনো প্রামাণিক তথ্য নেই যে, বাবর অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ তৈরি করে-ছিলেন। এইখানেই সমস্যা। তবে মসজিদটি যদি বাবরের আমলে হয়েও থাকে, এবং তার থেকেই যদি বাবরি মসজিদ কথাটি প্রথমে স্থানীয় জনগণের মধ্যে, এবং পরে সর্বত্র চালু হয়ে থাকে, তাহলেও সেই মসজিদের স্থানে পূর্বে একটি মন্দির ছিল, এমন কোনো কথা কোথাও বলা নেই। "তুজুক ই বাবুরি" বা "ওয়াকিয়াত-ই-বাবরি" বা "বাবরনামা"র কোনো সংস্করণে বা কোনো ভাষ্যে ১৫২৬ থেকে ১৫৩০-এর মধ্যে তৎকালীন অযোধ্যার কোনো মন্দির বাবর ভেঙেছিলেন বলে উল্লেখ নেই। বাবর পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভ করার পরে অচিরেই দিল্লী এবং আগ্রা তাঁর হস্তগত হয়। খানুয়ার যুদ্ধে (১৭ মার্চ, ১৫২৭) রাজপুতনার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রানা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিংহকে পরাজিত করার ফলে উত্তর ভারতে বাবরের ক্ষমতা আরো নিরঙ্কুশ হয়। রাসক্রক উইলিয়ামস লিখেছেন 'এর আগে অবধি হিন্দুস্থান দখল বাবরের অ্যাডভেনচারময় জীবনের একটি ঘটনামাত্র হিসাবে যদিও দেখা যেতে পারে, তবু এই যুদ্ধে জয়লাভের পর থেকে এটাই হয় তাঁর বাকি জীবনের কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৫৬, অনুবাদ বর্তমান লেখকের)। শুধু মেবারের রানাই নয়, ধীরে-ধীরে অন্যান্য রাজপুত রাজ্যও তাঁর দখলে আসে। (১৫২৮ খ্রী জানুয়ারির মধ্যে)। এরপর বাবরের দৃষ্টি সঙ্গত রাজনৈতিক এবং সামরিক কারণেই নিবদ্ধ হয় পানিপথের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়া সেই-সব পাঠান নেতাদের প্রতি, বিশেষত ইব্রাহিম লোদীর ছোটো ভাই মাহমুদ লোদীর দিকে। ইনি বিহারে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং বাঙলার সুলতান নসরত শাহের সমর্থন পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত গঙ্গা এবং ঘাঘরা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটবর্তী ঘাঘরার যুদ্ধে বাবর পাঠান শক্তিকে সম্পূর্ণ নির্মূল করেন, বাঙলার সঙ্গে সন্ধি করেন এবং স্ট্যানলি লেন-পুলের সঙ্গে

আমরা একমত যে 'তিনটি যুদ্ধের মাধ্যমে বাবর উত্তর ভারতকে সম্পূর্ণ পদানত করেন' (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ ১৯২, বাঙলা তরজমা বর্তমান লেখক)।

আগ্রা থেকে থেকে ঘাঘরা যাওয়ার পথে মুঘল সৈন্যবাহিনী একাধিক পথে গিয়েছিল। এলাহাবাদ, চুনার, বেনারস এবং গাজীপুর হয়ে, জৌনপুর হয়ে। বাবর অযোধ্যা দিয়ে গিয়ে থাকতেও পারেন। তবে কোনো প্রমাণ নেই। তিনি নিজে না গেলেও তাঁর সৈন্যদল যেতে পারে আর পরবর্তী কালে ইংরেজ লেখকগণ যে জোর দিয়ে বলেছিলেন বাবর আউধ-এ ছিলেন, সেই আউধ আর প্রাচীন অযোধ্যাও এক আদৌ নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী লেখক-লেখিকাদের ভূমিকা আমরা পরবর্তী অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। এখানে শুধু উল্লেখ করতে হবে যে, লিডেন তাঁর "বাবরনামা"র অনুবাদে টীকায় উল্লেখ করেন ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৮ তারিখে অযোধ্যায় ছিলেন। শ্রীমতী অ্যানেট সুসান বেভারিজ তাঁর অনুবাদগ্রন্থে লেখেন যে সম্ভবত বাবর অযোধ্যার ৭২ মাইল উত্তরে শিবির স্থাপন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আরো এক ধাপ এগিয়ে তিনি লেখেন—বাবরের নির্দেশেই ওই মসজিদ নির্মিত হয়। প্রমাণ হিসেবে তাঁর সাক্ষ্য মসজিদের গায়ে খোদিত ফারসি লিপি। "বাবরনামা" গ্রন্থের মূলপাঠের মধ্যে যদিও কিছু নেই। অ্যানেট বেভারিজ তাঁর অনুবাদের বইতে স্মৃতিচারণের সঙ্গে ঐ লিপির অনুবাদও যুক্ত করেন। তার উল্লেখযোগ্য অংশটি এরকম :

'যাঁর বিচারের খ্যাতি ও ধারা এমন এক বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করেছে যা স্বর্গের সু-উচ্চ চূড়া পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, সেই বাদশাহ বাবরের নির্দেশক্রমে মহৎহৃদয় মীর বাকি এখানে দেব-দূতগণের অবতরণের আলোকিত ভূমি নির্মাণ করলেন।'

শুধু তাই নয়, অনূদিত অনুচ্ছেটির পাদটীকায় শ্রীমতী বেভারিজ লেখেন যে, তিনি ওই কাহিনী বিশ্বাস করেন। তাঁর যুক্তি একটু বেশি সরল। তাঁর মতে, 'সম্ভবত মসজিদটি বাবরের নির্দেশে নির্মিত' (*Presumably* the order for building the mosque) যখন বাবর আউধে ছিলেন, এবং বাবর যেহেতু মুসলমান, তাই 'হিন্দু মন্দিরের পবিত্রতা ও খ্যাতির গুরুত্ব বুঝে তিনি পূর্বেকার মন্দিরটি অংশত ভেঙে' মসজিদ নির্মাণ করান মীর বাকিকে দিয়ে। বেভারিজের যুক্তি—হজরত মহম্মদের অনুগামী বাবর অন্য ধর্ম সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অসহিষ্ণু ছিলেন, এবং তাই হয়তো মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক।

শ্রীমতী অ্যানেট সুসান বেভারিজের সিদ্ধান্ত কিন্তু ঐতিহাসিক সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর ভিত্তি করে নয়। তিনি তেমন প্রমাণ দেবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি। বাবরের ধর্মীয় মতামত ও আচরণ এবং ভারতে তাঁর রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ থেকে আমাদের পক্ষে বেভারিজের সিদ্ধান্ত মানা কঠিন। বরং "বাবরনামা" পাঠ করলে বা বাবরের শেষ উইল থেকে আমাদের বিপরীত কথাই মনে হয়। সমসাময়িক এবং আধুনিক অধিকাংশ লেখকই সামরিক প্রতিভার সঙ্গে-সঙ্গে বাবরের রুচি এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করেছেন। বাবর নিজেই বহু অভিযানের সময় হিন্দু মন্দির দেখে সেগুলির স্থাপত্য আর শিল্পে মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁর লেখাতে এক সৌন্দর্যরসিক মনের পরিচয় পাই, কোথাও একবারের জন্য কোনো মন্দির ভাঙার কথা বা নির্দেশের কথা তিনি নিজে লেখেন নি। সম্পর্কে বাবরের মাসতুতো ভাই মিরজা হায়দার দুঘলাটের "তারিখ-ই-রশিদি" গ্রন্থে আছে যে, বাবর ছিলেন 'নানাবিধ গুণে সমন্বিত এবং তাঁর অসংখ্য সদগুণের মধ্যে প্রধান সাহসিকতা এবং মানবিকতা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (দ্র. Ney Elias & E. Denison Ross (trs & ed), *A History of the Mughals of Central Asia*: Being the

Tarikh-i-Rashidi of Mirza Muhammad Haider Dughlat; London, 1895, Indian Reprint, Academica Asiatica, Patna, 1973, pp. 173-74)। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে মধ্য ও আধুনিক ভারতের ইতিহাসের অধ্যাপক ড. সুশীল শ্রীবাস্তবের সাম্প্রতিক গবেষণায় বাবরকে ধর্মান্ধ বলা হয় নি, বরং শের সিং ও তদীয় পত্নী সুরিন্দর পুরীর মাধ্যমে আমরা বাবরকে সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা ধর্মনিরপেক্ষ সম্রাটরূপেই দেখি (দ্র. *The Secular Emperor Babar*, Lokgeet Prokashan, PB 29 Sirhind, Rs. 35).

বাবরি মসজিদের খোদিত লিপিতে (তিনটি আছে, দুটি বাইরে, একটি অভ্যন্তরে) কোথাও বলা হয় নি যে ওই মসজিদ পূর্বেকার কোনো হিন্দু মন্দির ভেঙে নির্মাণ করা হয়েছে। একটি লিপিতে তো বাবরের নাম পর্যন্ত নেই। রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ সম্পর্কে বিতর্কের প্রশ্নে একটি সংবাদপত্রে 'সম্পাদক সমীপেষু' বিভাগে ইন্দ্রজিৎ দত্ত এবং আরো নজন এক পত্রে লেখেন: 'The inscriptions outside of the mosque above the pulpit also raise serious doubts. According to noted Urdu critic and Persian scholar, Shamsur-Rehman-Farooqui, the calligraphy and phrasing of the inscription suggest that they have been put up by someone ill versed in Persian. One inference is that the inscriptions were put up by someone after the temple-mosque controversy began in the 19th century" (মর্মার্থ : মসজিদের বাইরের লিপি যা বেদীর উপরে আছে, সেটিও সন্দেহের উদ্রেক করে। প্রখ্যাত উর্দু সমালোচক ও ফারসি ভাষায় পণ্ডিত সামসুর-রহমান-ফারুকির মতে, লিপির ভাষার শৈলী এবং অক্ষরচিত্র দেখে মনে হয় যে এটি কোনো ফারসি ভাষায় অপটু কোনো লোকের লেখা। একটা অনুমান এরকম যে উনিশ শতকে মন্দির-মসজিদ বিতর্ক শুরু হওয়ার পর কেউ এই কাজ করে থাকতে পারেন) (দ্র. Letter to the Editor, *The Statesman*, October 22, 1989 quoted in A. G. Noorani, "The Babri Masjid-Ram Janmabhoomi Question", in the *Economic and Political Weekly*, Nov. 4-11, 1989, pp 2463-64).

সুতরাং আমরা ইতিহাস ঘেঁটে দেখতে পাই যে, বাবরি মসজিদের স্থানে মন্দির ভেঙে মসজিদের প্রমাণ নেই। আরো কিছু সমসাময়িক বা প্রায় সমসাময়িক সূত্র এবং সাক্ষ্য আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন, আবুল ফজলের "আইন-ই-আকবরী" (মূল রচনা ফারসি ভাষায় একখণ্ডে, এটি দুখণ্ডে বিবিলিওথেকা ইনডিয়া 1867-77 খ্রী ব্লকম্যান কর্তৃক প্রকাশিত। এর বহু ইংরেজি অনুবাদ হয়েছে তিনখণ্ডে। অধিক ব্যবহৃত সং Vol. I tr. by H. Blochmann (1873), revised edn. by D. C. Phillot, Cal, 1939 ; Vol. II tr. by H. S. Jarrett (1891), Vol. III by H. S. Jarrett (1894), Vols. II and III revised by Sir Jadunath Sarkar with further notes, Vol. II (1949), Vol. III (1948)। "আইন-ই-আকবরী"তে অযোধ্যার উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, ওই স্থানে ত্রেতাযুগে রামচন্দ্র বাস করতেন, যিনি রাজা এবং মহামানব দুই-ই ছিলেন। কিন্তু আবুল ফজল কোথাও লেখেন নি যে মহামতি আকবরের পিতামহ বাবর রামচন্দ্রের মন্দির ধ্বংস করে সেই স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। তা ছাড়া, আকবরের সমসাময়িক ছিলেন রামভক্ত হিন্দী কবি "রামচরিতমানস"-রচয়িতা সন্ত তুলসীদাস, যাঁকে ঐতিহাসিক ভিনসেনট স্মিথ বলেছেন 'সর্বশ্রেষ্ঠ যুগমানব' ('the greatest man of his age—

greater even than Akbar himself'. V. A. Smith, *Akbar, the Great Mughal*, Oxford, Clarendon Press, 1919, p 417)। যদিও আকবরের রাজসভার দুই ওমরাহ হিন্দু রাজা মান সিং এবং মুসলমান মিরজা আবদুর রহিম খান-ই-খানা তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন তবু তুলসীদাস কখনো আকবরের রাজসভায় যান নি। তুলসী অযোধ্যা অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলেন; ম্লেচ্ছদের উত্থান নিয়ে তিনি অনেক উদ্বেগও প্রকাশ করেন; তবু রামজন্মভূমিতে মন্দির ভেঙে মসজিদ করা হয়েছে এমন কথা তিনিও লেখেন নি। বস্তুত উনিশ শতকেই সর্বপ্রথম ব্রিটিশ সরকারি নথিপত্রে মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার কথা দেখা যায় এবং ওই উদ্দেশ্যপ্রাণোদিত নথিপত্রকেই উত্তরকালে কোনো-কোনো লেখক অকাট্য প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

আসলে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক বস্তুবাদী ইতিহাস-চর্চায় একথা না মেনে উপায় নেই যে মধ্যযুগের ভারতের ইসলামধর্মাবলম্বী শাসকদের অধিকাংশই ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান, কেউ-কেউ ছিলেন উদারচেতা ও পরমতসহিষ্ণু, আবার কেউ-কেউ ছিলেন গোঁড়া এবং ধর্মান্ধ। মুসলিম শাসকগণ সর্বদাই পবিত্র হিন্দুধর্মস্থানের বিরুদ্ধে ছিলেন, এ কথা প্রমাণ করবার মতো যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। অনেকে ধর্মান্তকরণে সাহায্য করেছেন, মন্দির ভাঙতে সক্রিয় প্ররোচনা দিয়েছেন—একথা যেমন সত্য, তেমনি হিন্দুদের সাহায্য করেছেন, এমনকী দেবস্থান নির্মাণেও—একথাও অনেক ক্ষেত্রে সত্য। বিস্তারিত আলোচনার পরিসর এখানে নেই, তবু উল্লেখ করা দরকার যে হিন্দু তীর্থক্ষেত্র হিসেবে অযোধ্যার বিকাশ ঘটেছিল মুসলমান নবাবদের সমর্থন পেয়েই। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, নবাবিশাসন নির্ভর করত কায়স্থদের সহযোগিতার উপরে, আর নবাবি সেনাবাহিনীর মেরুদণ্ড ছিল শৈব নাগারা। নবাব সফদরজঙ্গের দেওয়ান অযোধ্যার বেশ কয়েকটি মন্দির মেরামত করতে সাহায্য করেন। স্বয়ং নবাব সফদরজঙ্গ অযোধ্যার হনুমানপর্বতে একটি মন্দির নির্মাণের জন্য জমি দান করেন। ওই অঞ্চলে মন্দির গড়তে সাহায্য করেন নবাব আসফ-উদ-দৌলার দেওয়ান। অযোধ্যার এই ঐতিহ্য। ১৮৫৫ সালে নবাব ওয়াজেদ আলি শাহ হিন্দু-মুসলিম সংঘর্ষের সময় এক উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আসলে, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ দমন এবং অযোধ্যা অধিগ্রহণের বৈধতা প্রমাণিত করতে চতুর উপনিবেশিক শাসকগণ হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সংহতি বিনষ্ট করতে তৎপর হন।

সুতরাং এই পর্ব আলোচনার পর আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, (১) বাবরি মসজিদ বাবর করেছিলেন কি না তার নিশ্চয়তা নেই, (২) মধ্যযুগে এই মসজিদ মুসলমানদের কাছে তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাও নয়, (৩) মন্দির ভেঙে এখানে মসজিদ হয় তাও সত্য নয়, এবং (৪) মন্দির ভাঙার কাহিনী ছড়িয়েছে ঔপনিবেশিক শাসকেরা।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের ভূমিকা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাম্প্রতিক রামজন্মভূমি-বাবরি-মসজিদ বিতর্কের যে মূল ভিত্তি, অর্থাৎ উত্তর-প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার একটি বিশেষ মহকুমার বিশেষ গ্রামের বিশেষ মৌজার বা পরবর্তী একটি বিশেষ শহরের একটি জমির অংশের উপর মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণের কাল্পনিক কাহিনী, তার সৃষ্টি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে। কাল্পনিক বলা হচ্ছে এই জন্য যে, এই প্রচলিত বিশ্বাস বা অতিকথনের কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছিল—এরকম কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ ইতিহাস ঘেঁটে পাওয়া যায় নি। এই যে 'মিথ'টি উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে তৈরি হল, তার প্রধান উদ্গাতা ছিলেন ব্রিটিশ

সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদী লেখক ও ঐতিহাসিকগণ। বিতর্কসৃষ্টিকারী এই কাজের পিছনে কাজ করেছিল ব্রিটিশ শাসকদের সুপরিচিত 'বিভেদ করো এবং শাসন করো'—এই নীতি এবং ভারতবর্ষের মধ্যযুগের ইতিহাসে মুসলিম শাসকদের 'অত্যাচারী' চরিত্রটি অতিরঞ্জিত করে হিন্দুসম্প্রদায়ের মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করা। কিভাবে ইংরেজদের রচনায় এই মন্দির-মসজিদ বিতর্কের পথ তৈরি করল এবং ইংরেজ লেখক-লেখিকাদের রচনার যে কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি প্রমাণ নেই—এবার সেই প্রসঙ্গ।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ঐতিহাসিক জন লিডেন বাবরের ফারসি ভাষায় লেখা আত্মজীবনীর এক অনুবাদগ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির নাম "মেমোয়ার্স অব জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর, এমপারার অব হিন্দুস্থান"। এই গ্রন্থে অনুবাদক (ইনি ফারসি অনুবাদ থেকে ইংরিজি করেন) মন্তব্য করেন যে, বাবর পাঠানদের বিরুদ্ধে অভিযান করার সময় অযোধ্যার মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন। মনে রাখতে হবে—এটি সম্পাদক এবং অনুবাদকের অনুমান এবং ধারণা মাত্র, কোনো "সাক্ষ্যপ্রমাণ" নয়, ইতিহাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এমনকী স্বয়ং বাবরের মূল লেখায়ও তা নেই। ১৮১৩ খ্রী সংস্করণ আমরা দেখি নি, তবে ১৮২৬ খ্রী লনডনের লংম্যান কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত হয় বাবরের আত্মজীবনীর অনুবাদ যৌথ কৃত্য হিসেবে। বইটির নাম John Leyden and William Erskine (trs & ed), *Memoirs of Zahir-Ed-Din-Muhammad Babar - Emperor of Hindusthan, written by himself in the Jaghatai Turki*। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বাবরের মাতৃভাষা ছিল চাঘাতাই বা জাঘাতাই তুর্কি। এটি ব্যবহৃত হত বাবরের মাতৃভূমি ফরগনায়। বাবরের পিতা উমর শেখ মিরজা ফরগনার ক্ষুদ্র গোষ্ঠীপতি বা সর্দার (chieftain) ছিলেন। উমর শেখ মিরজা ছিলেন তাঁর উর্ধ্বতন পূর্বপুরুষ আমীর তৈমুর বা তৈমুর লঙ্গের বংশধর এবং ফরগণা অঞ্চলটি একদা তৈমুরের বিশাল মধ্য-এশীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল (বর্তমানে এই ফরগনা অঞ্চল উজবেকিস্তান সোভিয়েত সমাজবাদী প্রজাতন্ত্রের অন্তর্গত। See, V. Pokshishevsky, *Geography of the Soviet Union*, Progress Publishers, Moscow, 1974, p 213) ফরগনাতেই বাবরের জন্ম (14 Feb, 1483), যে অঞ্চলে প্রধানত তুর্কি, কোথাও-কোথাও ফারসি ভাষার চল ছিল। John Leyden লিখেছেন বিশেষ তুর্কি উপজাতীয় ভাষা সম্পর্কে: 'It was, however, chiefly the language of the deserts and plains; as the cities especially among the Jaxartes, and to the south of the river, continued to be, in general, inhabited by persons speaking the Persian tongue'। যাই হোক, বাবরের আত্মজীবনী অনুবাদের সময় জন লিডেন কিন্তু মূল তুর্কি পাঠ অনুসরণ করেন নি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আত্মজীবনী "তুজুক-ই-বাবুরি" প্রধানত আকবরের উদ্যোগে হুবার ফারসি ভাষায় অনূদিত হয়। একবার পায়নাদা খান, একবার আবদুর রহিম মির্জা কর্তৃক এবং কেতাবটি কখনো "ওয়াকিয়াত-ই-বাবরি" বা কখনো শুধুই "বাবরনামা" নামে পরিচিত হয়। জন লিডেন অনুবাদ করেছিলেন দ্বিতীয় ফারসি অনুবাদ থেকে।

যাই হোক, জন লিডেনের অনুবাদগ্রন্থে শুধু অযোধ্যায় বাবরের উপস্থিতির কথাই মন্তব্য করা হয়েছে, যদিও প্রামাণিক সমসাময়িক তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই। বাবরের এই তথাকথিত উপস্থিতি, মীর বাকি কর্তৃক বাবরি মসজিদ স্থাপনকেই এরপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ উত্তরকালে বিকৃত করলেন চূড়ান্তভাবে। তাঁরা এই বিশ্বাস সৃষ্টি করলেন আর প্রচার করতে শুরু করলেন যে, 'হিন্দু-বিরোধী-বাবর' রামজন্মভূমি

মন্দির ধ্বংস করেছেন, এবং সেই জায়গাতেই মসজিদ তৈরি করেছেন। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকদের নীতির অঙ্গ হিসেবেই এই ইতিহাসবিরোধী কাজ শুরু হয়, যদিও লিডেনের বইতে মন্দির ভাঙার কোনো কথাই নেই।

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য ও আধুনিক যুগের ভারতের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. সুনীল শ্রীবাস্তব এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ গবেষণা করেছেন সম্প্রতি। আউধের ইতিহাস তাঁর গবেষণার বিষয়। তিনি গবেষণায় প্রমাণ করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে, কিভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বাবরি মসজিদ-রামজন্মভূমি বিতর্কতে শুধু ইন্ধন যোগান নি, তাকে চাতুর্যের সঙ্গে কাজে লাগিয়েছেন। বিশেষত লখনউ শহরের তৎকালীন ব্রিটিশ রেসিডেনট কর্নেল স্লীম্যান এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। কেন? সে কথা আমরা একটু পরেই আলোচনা করব।

অধ্যাপক শ্রীবাস্তবের বক্তব্যের মূল কথা ছিল এই যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এবং তাঁদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারের ও রচনার ভিত্তিটাই ছিল জনশ্রুতি, ঐতিহাসিক ঘটনা বা প্রামাণিক তথ্য নয়। ইদানীং আশির দশকে আবার যে রামজন্মভূমি বনাম বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে অনৈতিহাসিক এবং অবাস্তব বিতর্ক তৈরি হয়েছে, এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ, সরল, অজ্ঞ, ধর্মভীরু, বিশ্বাসী অথচ ইতিহাসবিমুখ বিপুল জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে, বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলে উন্মাদনায় মোহগ্রস্ত করা হচ্ছে, সে-সম্পর্কেও ড. শ্রীবাস্তব অনুসন্ধান করে এক পাণ্ডিত্যপূর্ণ, যুক্তিগ্রাহ্য ও তথ্যাশ্রয়ী প্রতিবেদন পেশ করেছেন। (দ্র. *Probe India*, January, 1988 সংখ্যা)। তাঁর মতে, ফৈজাবাদ এলাকাটি বাবরের অধিকারের কয়েক শো বছর আগে থেকেই দিল্লী সুলতানির তুর্ক-আফগান যুগে মুসলমান শাসকদের অধিকারভুক্ত ছিল। বাবর হিন্দুদের বিরুদ্ধে নয়, পাঠানদের বিরুদ্ধেই অভিযান চালিয়েছিলেন। তখন তাঁর সাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার যুগ এবং রাজনৈতিক কারণে পাঠানদের শেষ শক্তিক্ষয় করার কাজে তাঁর পক্ষে হিন্দুদের পক্ষে রাখাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া, 'বিতর্কিত অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে লিডেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন বলেই মনে হয়।' শ্রীবাস্তব আরো জানাচ্ছেন যে, 'বাবরি মসজিদের স্থানেই (site) রামজন্মভূমি মন্দির অবস্থিত ছিল এই বিশ্বাস (belief) প্রধানত গড়ে উঠেছে স্থানীয় বা আঞ্চলিক 'মিথ' (myth) এবং লোকশ্রুতি (folklore) উপর। বাস্তবিক পক্ষে ঐ স্থানে রামের নামযুক্ত কোনো মন্দির আদৌ ছিল তেমন কোনো প্রত্যক্ষ ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। তেমন ধরনের কোনো মন্দিরের কথা কোনো হিন্দু শাস্ত্রের কোনো স্থানে উল্লেখ নেই। এই বিশ্বাস গড়ে উঠেছে প্রধানত বাল্মীকির রামায়ণকে ভিত্তি করে যেখানে বলা হয়েছে অযোধ্যা শহরে রাম জন্মেছিলেন।' তিনি আরো বলেন যে, 'লিডেন নিজেও তাঁর বিবরণে এমন ধরনের কোনো ঘটনার কোনো উল্লেখ করেন নি' অথবা বাবর 'অযোধ্যায় কোনো মন্দির ভেঙেছেন' তেমন প্রমাণও নেই। (অনুবাদগুলি বর্তমান লেখকের)

আসলে বলপূর্বক এবং অন্যায়ভাবে আউধ অধিকার (annexation of Oudh) করে নেবার আগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ হিন্দু-মুসলমানসম্প্রীতি বিনষ্ট করে নিজেদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন। তখন উনিশ শতকের পঞ্চাশের দশক। ভারতের বড়োলাট তখন উগ্র সাম্রাজ্যবাদী লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬ খ্রী)। ১৮৫৪ খ্রী প্রকাশিত হল William Erskine-এর *A History of India under the two First Soverigns of the House of Taimur, Babur and Humayun* (London, 2 vols., Indian Reprint, New Delhi, 1973)। সেই বছরেই আউধেও লাগল গণ্ডগোল। আমরা আউধ কথাটি ব্যবহার করছি, কারণ অযোধ্যা আর আউধ ঠিক এক নয়। কেন

আউধে গণ্ডগোল সে কথাটি বুঝতে হলে আমাদের আউধের ইতিহাস সামান্য জেনে নিতে হবে, এবং তার জন্য পিছনে তাকাতে হবে।

আমরা আগে প্রাচীন অযোধ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা করছি। বর্তমানে মধ্যযুগ থেকে ইতিহাস পর্যালোচনা করি। ভারতবর্ষে মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণের সময়ই আউধ মুসলিম শাসকদের হাতে আসে। শিহাবুদ্দিন মুহম্মদ ঘোরীর অনুচর মালিক হিসামুদ্দিন আগ্‌হুল বাক তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের (১১৯২ খ্রী) একটু পরেই ওই অঞ্চল জয় করেন। ক্রমে-ক্রমে ওই আউধ বা অযোধ্যা অঞ্চলের জমির উর্বরতা, আবহাওয়ার মনোরম ভাব, শান্ত মানুষজন, কৃষিক্ষেত্র মুসলমান শাসকশ্রেণীর মানুষদের ও সাধারণ মানুষদেরও আকৃষ্ট করে এবং তাঁরা ওই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেন। বিশেষত সুলতান মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে (১৩২৫-১৩৫১ খ্রী)। ওই সময় অবশ্য আউধের প্রাদেশিক শাসক আইন-উল-মুলক বিদ্রোহ করেছিলেন সুলতানের বিরুদ্ধে (১৩৪০) এবং তা দমন করাও হয়েছিল। অতঃপর আউধকে আলাদা প্রদেশ না রেখে সরাসরি দিল্লী সুলতানির অংশ করা হল এবং ওই রাজ্যের একটা অংশকে ভেঙে যুক্ত করা হল জৌনপুর রাজ্যের সঙ্গে। জৌনপুর রাজ্যের (১৩৯৯-১৪৭৬) পরে পতন হলে তাও দিল্লী সুলতানির অন্তর্ভুক্ত হয় এবং বাবর ১৫২৬ খ্রী ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করলে সমগ্র দিল্লী সুলতানি-রাজ্যের সঙ্গে আউধও তাঁর অধিকারে আসে। এই আউধ ছিল আকবরের ১৫টি সুবার অন্যতম, যা তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে ভাগ করে করেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর মুঘল সাম্রাজ্য ক্রমে দুর্বল হতে থাকে এবং ১৭২৪ খ্রী মুঘল প্রাদেশিক শাসক সাদাত খান নিজেকে বাস্তবিক স্বাধীন সুলতান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর থেকে অযোধ্যা বা আউধের নবাবি শুরু হয় এবং প্রথম তিনজন নবাব ছিলেন সাদাত খান (১৭২৪-৩৯ খ্রী), সফদরজঙ্গ (১৭৩৯-৫৪) এবং সুজাউদ্‌দৌলা (১৭৫৪-৭৫)। বাস্তবে স্বাধীন হলেও নামে তাঁরা ছিলেন নবাব ওয়াজিব অর্থাৎ মুঘল শাসনব্যবস্থার অংশ হিসেবে প্রাদেশিক শাসক।

১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বকসারের যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে একদিকে যেমন বাঙলার নবাব মীরকাশিমের শেষ স্বপ্ন ভেঙে যায়, পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) সিরাজ-উদ্দৌলার পরাজয়ের পর ইংরেজ ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানির যে ক্ষমতা পেতে শুরু করে, বকসার জয়লাভ তার পরিমাণ আরো বাড়িয়ে দেয়, তেমনি অযোধ্যা বা আউধের নবাবদের পতনেরও সূচনা বহন করে। বণিকের মানদণ্ড হাতে নিয়ে সুড়ঙ্গপথের অন্ধকারে প্রবেশ করে অর্থলোভী ইংরেজ এবং রাজদণ্ড হাতে দেখা দেয় অচিরেই—১৭৬৫ খ্রী ক্ষয়িষ্ণু মুঘল রাজশক্তির প্রতিনিধি সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বাঙলার দেওয়ানি লাভ করার পরেই। দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস আসার সঙ্গে-সঙ্গে ঈস্ট ইনডিয়া কোমপানির শাসন শুরু হয়ে গেল। এই ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের ধ্যানজ্ঞান হল রাজস্বের মাত্রাবৃদ্ধি, যেনতেনপ্রকারেণ মুনাফা অর্জন, অনুগত শ্রেণী ও সহযোগী শ্রেণী ভারতীয়দের মধ্যে গড়ে তোলা, ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো সুদৃঢ় করা এবং ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত করা। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলেই ১৭৭৪ খ্রী আউধ ব্রিটিশদের সাহায্য নিয়ে রোহিলখণ্ড অঞ্চল দখল করে এবং নবাব নিজেদের শাসন বজায় রাখতে সমর্থ হয়। সুজাউদ্দৌলার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আসফ্-উদ-দৌলার আমলেই (১৭৭৫-১৭৯৭) সাম্রাজ্যলোভী ও ক্ষমতাকাঙ্ক্ষী উদীয়মান ব্রিটিশ শক্তির নজর পড়ে আউধের উপর। কারণ, ওই রাজ্য তাদের বাঙলা-বিহার রাজ্যের ও মারাঠাদের রাজ্যের মধ্যে সেতুস্বরূপ; সুতরাং ওইটি গ্রাস করা দরকার। সুতরাং ঈস্ট ইনডিয়া কোম্পানি ধুয়ো তোলে যে নবাবের অধীনে আউধে অপশাসন জনগণের

আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্যর্থ। ১৭৯৭ খ্রী আসফউদ-দৌলার মৃত্যুর পর তাঁর অবৈধ সন্তান ওয়াজির আলি কিছু দিনের জন্য (১৭৯৭-৯৮) নবাব হলেও কোম্পানি নিজেরাই এগিয়ে এসে তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করলেন এবং আসফউদদৌলার ভাই সাদাত আলিকে নবাব করলেন। বলা বাহুল্য, কোম্পানি এই সহায়তার কথা নতুন নবাব ভুললেন না। সাম্রাজ্যবাদী ও কূট-কৌশলী লর্ড ওয়েলেসলি তখন বড়লাট (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রী)। কৃতজ্ঞ নবাব সাদাত আলি ক্ষমতায় ছিলেন ১৭৯০ থেকে ১৮১৪ পর্যন্ত। তার মধ্যে তিনি কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে এক চুক্তি করে ফেললেন প্রথমেই, যার দ্বারা তিনি এলাহাবাদ দুর্গ কোম্পানিকে দিয়ে দিলেন, কোম্পানিকে বাৎসরিক ৭৬ লক্ষ টাকা সাহায্য দিতে স্বীকৃত হলেন, এবং ইংরেজ ছাড়া অন্য কোনো বিদেশী শক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন না —এমন কথাও দিলেন। পরিবর্তে কোম্পানি আউধকে রক্ষা করবে, সীমান্ত সুরক্ষিত থাকবে। অধীনতামূলক মিত্রতার চমৎকার দৃষ্টান্ত। আউধ কোম্পানির চালে নিজ গৌরব এবং ক্ষমতা হারাল। ১৮০১ খ্রী কোম্পানি আউধকে তাদের রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী বা নিম্ন দোয়াব অঞ্চল দিতে বাধ্য করল। নবাবের হাতে অল্প অংশই রইল। যদিও লর্ড হেস্টিংস ১৮১৯ খ্রী সাদাত আলির উত্তরাধিকারী এবং পুত্র গাজিউদ্দিন হায়দারকে (১৮১৪-২৭) 'রাজা' উপাধি দিলেন, নবাবের কিংবা রাজ্যের ক্ষমতা তাতে বাড়ল না। বরং কোম্পানির মতে আউধে নবাবগণ শাসনে অযোগ্যই রইলেন এবং কোম্পানি কোনো ছলে বা ছুতোয় সম্পূর্ণ রাজ্য গ্রাস করার তাল খুঁজতে লাগলেন। এভাবেই চলতে লাগল হায়দারের উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকাল, যথাক্রমে নাসিরুদ্দিন হায়দার (১৮২৭-৩৭), আলি শাহ (১৮৩৭-৪২), আমজাদ আলি শাহ (১৮৪২-৪৭) এবং ওয়াজেদ আলি শাহ (১৮৪৭-৫৬)।

এই ওয়াজেদ আলি শাহের আমলেই 'অপ-শাসনের অজুহাতে' কোম্পানি আউধকে নবাবি শাসনমুক্ত ক'রে আনুষ্ঠানিকভাবে কোম্পানির বা ব্রিটিশ ভারতের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে। নবাব নাকি প্রজাদের মঙ্গল দেখতেন না, কেবল বসে আমোদ-প্রমোদে দিন কাটাতেন। আর 'শতরঞ্জ' খেলতেন। শুধু তাই নয়, ওয়াজেদ আলি শাহের আমলে বাবরি মসজিদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল, রামজন্মভূমির কল্পকাহিনী—যাতে নবাবের রাজ্যের অন্তর্গত হিন্দু প্রজারা সাধারণ মুসলমানদের সম্পর্কে এবং বিশেষত নবাবি শাসন সম্পর্কে বীতস্পৃহ হয়, এবং 'যবন'-শাসনমুক্ত হয়ে ব্রিটিশ রাজের অন্তর্গত হতে সাহায্য করে। এই ব্যাপারে প্রধান পাণ্ডা ছিলেন স্যার উইলিয়াম স্লীম্যান যিনি একদা লর্ড উইলিয়াম বেন্টিকের আমলে 'ঠগী' দমন করে নাম কিনেছিলেন। স্লীম্যান লখনউ নগরীতে ব্রিটিশ সরকারের রেসিডেনট ছিলেন (১৮৪৮-৫৪ খ্রী)। তাঁর প্রতিবেদনের ভিত্তিতে কোম্পানি আউধ অধিকার করার ব্যাপারে সক্রিয় হয়। পরবর্তী রেসিডেনট স্যার জেমস উটরাম (Outram) ছিলেন শ্লীম্যানেরই পথের পথিক, এবং তাঁর কার্যকালেই আউধ কোম্পানি দখল (annexation) করে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে। আমরা কর্নেল শ্লীম্যানের ভূমিকার কথা আগে একবার সামান্য উল্লেখ করেছি। এই সাম্রাজ্যবাদী শাসকের আমলেই অযোধ্যায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা হয় এবং হিন্দু জনসাধারণের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যে, বাবর যে মসজিদ তৈরি করেছিলেন (যদিও আমরা দেখেছি যে বাবর যে মসজিদ করেছিলেন—তেমন কোনো জোরালো সাক্ষ্য নেই) তা রামজন্ম-ভূমিতেই শুধু নয়, সেখানকার মন্দির ভেঙে (যদিও আমরা দেখেছি যে এখানে যে আদৌ কোনো মন্দির ছিল, তার কোনো প্রমাণ নেই)। জন লিডেন, উইলিয়াম আরস্কাইন প্রমুখের বই তারা বিকৃত করতে শুরু করে। জনগণের মধ্যে বিরোধ ক্রমে উগ্র রূপ ধারণ করে, এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে

দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এটা ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

১৮৪৮-৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে যে জমি তৈরি হয়েছিল, তারই ফসল ফলল ১৮৫৫তে। যত প্রজাদের মধ্যে বিবাদ হবে, যত হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হবে, যত আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হবে, ততটাই ব্রিটিশ রেসিডেনটের পক্ষে আইন (law and order) ও শাসনের ধুয়ো তুলে ব্রিটিশ বড়লাটকে আউধ দখল করে নিতে বলা সহজ হবে। তদুপরি, যদি এক সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নিরাপত্তার অভাববোধ করেন, তাহলে তাঁদের স্বার্থে ইংরেজদের রাজ্য দখল আরো যেন বৈধতা (legitimacy) প্রাপ্ত হবে। বাবরি মসজিদসংলগ্ন যে স্থানে রামের জন্মভূমি বলে (আবার কোনো-কোনো জনশ্রুতি অনুসারে রামচন্দ্রের পত্নী সীতার রান্নার জায়গা বা 'রসুইঘর' ছিল ওইখানেই) দাবি করা হয় (Ram Chabutara), সেই স্থানে ওই স্লীম্যানের আমলে রীতিমতো পূজা শুরু হয়ে যায়, এবং শেষ পর্যন্ত ১৮৫৫ খ্রী হিন্দু সম্প্রদায় সমগ্র মসজিদ এলাকাটি দাবি করলে সংঘর্ষ বাধে। লক্ষণীয় যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের মূল ঘাঁটি ছিল মসজিদটি, অপরপক্ষে হিন্দুদের ঘাঁটি ছিল নিকটবর্তী হনুমানগড়ি (হনুমান পাহাড়ে যেখানে গড় ও মন্দির গড়ে উঠেছিল আউধের নবাবি আমলে)। শেষ পর্যন্ত প্রশাসন এই সংঘর্ষ আর দাঙ্গা দমন করে।

এই ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে অস্থায়ী সেটলমেনট অফিসার মিলেট (A. F. Millet) জানিয়েছিলেন : 'এটাই বলা হয়ে থাকে যে, ওই সময় (১৮৫৬-এর দাঙ্গা) পর্যন্ত হিন্দু এবং মুসলমান উভয়ই মন্দির/মসজিদে উপাসনা/পূজা করত। তারপর ব্রিটিশ প্রশাসন বিতর্ক এড়াবার জন্য একটা রেলিং তৈরি দেয়, যার মধ্যেও যার ফলে মুসলমানরা মসজিদে উপাসনা করতে পারে, অন্যদিকে বেড়ার বাইরে হিন্দুরা একটি বেদী/মঞ্চ তৈরি করে যাতে তারা পূজার্চনা দিতে পারে।' (বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের। মিলেটের উদ্ধৃতির জন্য দ্র, Kanchan Gupta, "Storm over Ayodhya" in the *Sunday Statesman* Miscellany, 5 Nov, ১৯৮৯ সংখ্যা)। আসলে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের দাঙ্গার পর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের উদ্দেশ্য অনেকটাই সাধিত হয়। অথচ ফৈজাবাদের ঐতিহ্যই ছিল হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি। হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে কখনো বিরোধ ছিল না বা সংঘর্ষ হয় নি, সেকথা যেমন ইতিহাসসম্মত নয় তেমনি সর্বদাই সংঘর্ষ হত—তাও ঠিক নয়। বিরোধও ছিল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও ছিল। উভয় সম্প্রদায়ের বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্ভাবই ছিল বেশি। ওয়াজেদ আলি শাহের আমলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ হলে নবাব একদেশদর্শী হয়ে মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করেন নি। জেলা প্রশাসক, নেতৃস্থানীয় হিন্দু জমিদার ও কোম্পানির ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করেও যখন সাম্প্রদায়িক শক্তিদের নিয়ন্ত্রণ করা গেল না, তখন ওয়াজেদ আলি শাহ মুসলিম জনসমর্থন সংগ্রহ করে সাম্প্রদায়িক সুন্নী মুসলমানদের নেতা মৌলবী আমীর আলির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন ও পরে সেনাবাহিনীর সাহায্যে সুন্নী মুসলিম গোষ্ঠীর বাধা চূর্ণ করলেন। তবু ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলোভী ও মুনাফাখোর কোম্পানি সরকার আউধ অধিগ্রহণ করলেন সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে। লর্ড ডালহৌসির পর এলেন লর্ড ক্যানিং।

১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের এই জবরদস্তি পরের বছর ভারত জুড়ে মহাবিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গে আউধেও দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। ১৮৬০-এর পর থেকে দেখা গেল ব্রিটিশ সরকারি নথিপত্রে এবং ইতিহাসচর্চায় বাবরি মসজিদ এবং রামজন্মভূমি বিতর্কিত স্থান বলে উল্লেখ করা শুরু হয়। শুধু তাই নয় মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার কাহিনী সরকারি নথি বা দলিলেও স্থান পায়।

ফৈজাবাদ জেলার তৎসাময়িক (officiating) কমিশনার ও সেটলমেনট অফিসার কার্নেগি (P.

Carnegy) অযোধ্যার এক বিস্তৃত ইতিহাস লেখেন তাঁর *A Historical Sketch of Fyzabad Tehsil, including the Former Capital of Ayodhya and Fyzabad* গ্রন্থে। এটি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই 'ইতিহাস' সর্বদা সাক্ষ্যপ্রমাণের উপর নির্ভরশীল তো নয়, বহুস্থানে লেখক জানিয়েছেন তাঁর বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্থানীয় মানুষদের মত ও বিশ্বাস (locally affirmed)। এই ব্যাপারে কোনো রকম অনুসন্ধান না করে, ইতিহাসের প্রমাণ আছে কি না, তা না দেখেই মন্দির ভাঙার কাহিনীটি লিপিবদ্ধ হয়ে গেল। দুটি উদাহরণ দিচ্ছি। পি. কার্নেগি লিখেছেন যে অযোধ্যায় 'জন্মস্থানে অন্তত সুন্দর একটি মন্দির ছিল' (Ayodhya 'must *at least have possessed a fine temple* in the Janmasthan'। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের)। অন্যত্র লিখেছেন, 'এটা মনে হয় যে বাবর ১৫২৮ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা পরিদর্শন করেন এবং তার নির্দেশেই এই প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস করা হয়' ('It *seems* that in 1582 Babar visited Ayodhya and under his orders this ancient temple was destroyed'। বঙ্গানুবাদ বর্তমান লেখকের, বাঁকা হরফও)। তবে তাঁর এই 'মনে হওয়ার' কোনো সমসাময়িক ঐতিহাসিক পাথুরে প্রমাণ লেখক হাজির করেন নি। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের নথিতেও একই ধরনের কথা ঢুকে যায়। এবং নেভিল সাহেব (H. R. Neville) ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যে ফৈজাবাদ ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার সংকলন করেন (এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত) সেখানেও দেখা যাচ্ছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকবর্গ বাবরি মসজিদ রামজন্মভূমিকে সমগুরুত্ব দিয়েছেন এবং মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়ার কাহিনী সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন। এইভাবে ১৮৫৬ খ্রী আউধ অধিগ্রহণের পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই ব্রিটিশ শাসকদের সরকারি নথি বা প্রতিবেদনে রামজন্মভূমি মন্দির ভেঙে বা অংশত ভেঙে মসজিদ গড়ার কাহিনী 'ইতিহাস' রূপে স্বীকৃতি লাভ করে।

ঔপনিবেশিক ভারতে সরকারি দলিল-দস্তাবেজের মতোই, ইতিহাসগবেষণা ও ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকগণ নিজস্বার্থে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে ভারত-ইতিহাসের এক সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা শুরু করেন, ক্রমে তা বিস্তার লাভ করে, নব্যশিক্ষিত ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর তার প্রভাব পড়ে এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ভাষ্য প্রভাব ফেলে। আমাদের দেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িকতাবাদী গোষ্ঠীগুলি ও মৌলবাদী নেতৃত্বও ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা করেছেন অনেকটা মনোমতো ইচ্ছানুসারে, যদিও ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ বিচারে তার অনেককিছুই ধোপে টেঁকে না। সবচাইতে বড়ো কথা, ভারতীয় ঐতিহাসিকগণেরও এক অংশ অজ্ঞানত বা কখনো-কখনো সচেতনভাবেই ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের প্রদর্শিত পথ গ্রহণ করেন, এবং ভারত-ইতিহাসের পঠন-পাঠনে সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যায় ইন্ধন যোগান। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাসচর্চা আমাদের দেশে প্রাধান্য পায় এবং বর্তমানে আমরা অতীতের বহু ধারণা সঙ্গত কারণে সংশোধন করতে বাধ্য হয়েছি। এই অনুচ্ছেদের বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা বর্তমানে আমাদের প্রাসঙ্গিক নয়, তার পরিসরও নেই। (আমি এ-বিষয়ে অন্যত্র বহু আলোচনা করেছি। দ্র. "ইতিহাসপাঠ এবং সাম্প্রদায়িকতা", **দেশ**, ৫১ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা, ২৮ জুলাই, ১৯৮৪; "প্রসঙ্গ : সাম্প্রদায়িকতা ও ও ভারতের ইতিহাস", **ইতিহাসচর্চা : জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতা** (সম্পাদনা : গৌতম চট্টোপাধ্যায়), কে. পি. বাগচী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ ৮২-১১৫ এবং "ধর্মীয় গোঁড়ামি ও ইতিহাসচর্চা", **শুভশ্রী**, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৮৯। অপিচ দ্রষ্টব্য Bipan Chandra, *Communalism in Modern India*, New Delhi, 1984)।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে শুধু দুটি কথা সংক্ষেপে হলেও বলা দরকার। প্রথমত, আগের অনুচ্ছেদে আমরা যে ঔপনিবেশিক যুগের ইতিহাসচর্চার কথা বলেছি তা সরকারি প্রতিবেদন বা গেজেটিয়ার বা অন্যান্য দলিলের মতো রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ প্রশ্নেও নতুন মাত্রা যুক্ত করে। আমরা John Leyden এবং William Erskine-এর বাবর সম্পর্কে বইয়ের (১৮২৬) কথা আগেই উল্লেখ করেছি। জেমস্ মিল এবং মার্শম্যান যে ভারত ইতিহাসচর্চার ধারা শুরু করেন তা জোর পায় মাউন্ট স্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের *History of India* প্রকাশিত হওয়ার পর (১৮৫৭)। ঔপনিবেশিক যুগের গোড়ার দিকে যে প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বচর্চার উপর জোর দেওয়া হয়েছিল, মুখ্যত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদদের (Orientalist) চেষ্টায়, সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতের মধ্যযুগচর্চা বৃদ্ধি পায়। উনিশ শতকের ষাট এবং সত্তরের দশকে প্রকাশিত হয় ইলিয়ট এবং ডাউসনের (H. Elliot & J. Dowson) সুপরিচিত আট খণ্ডে *History of India as told by its own historians*, যাতে বহু আরবি-ফারসি কেতাব প্রকাশিত হয়। William Erskine তাঁর বাবর-হুমায়ুন সম্পর্কে বই দুখণ্ডে প্রকাশ করেন লনডন থেকে *A History of India under the First Two Sovereigns of the House of Taimur, Babar and Humayun* নামে। J. T. Wheeler লেখেন *India under the Muslim Rule – Political, Historical and Social Integration* (London, 1875, Reprint Delhi, 1975) H.G Keene লেখেন *Turks in India* (1879)। বদায়ুনী অনুবাদ করেন র‍্যানকিং, লো, হেগ; আবুল ফজল অনুবাদ করেন ব্লকম্যান, 'দাবিস্তান-ই-মজাহিব' অনুবাদ করেন ডেভিড শিয়া ও অ্যান্টনি ট্রয়ার। 'হুমায়ুননামা' করেন অ্যানেট বেভারিজ, 'তুজুক ই জাহাঙ্গিরী' করেন রজার্স ও হেনরি বেভারিজ; জৌহর অনুবাদ করেন চার্লস টুয়ার্ট, আলবিরুনী অনুবাদ করেন এডওয়ার্ড সাচাউ; মিনহাসউদ্দিন সিরাজ অনুবাদ করেন মেজর জি. এইচ. ব্যাভার্টি; এবং এলিয়াস ও ডেনিসন রুস ভাষান্তর করেন 'তারিখ-ই-রশিদি' ইত্যাদি। আবার বাবরের আত্মকথার অনুবাদ ও জীবনীও ছাপা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হল—Stanley Lane-Poole, *Babar*, Oxford, 1899; F. G. Talbot, *Memoirs of Babar, Emperor of India, First of the Great Moghuls*, London, 1909; L. F. Rushbrook Williams, *An Empire-builder of the Sixteenth Century* (Allahabad University Lectures, 1915-16, Lond, 1918) এবং Annette Susannah Beveridge, *Babar Nama* (*Memoirs of Babar*), 2 vols, London, 1922। যদিও অ্যানেট বেভারিজ ফারসি অনুবাদ নয়, মূল তুর্কি থেকেই অনুবাদ করেন এবং প্রথমে চার কিস্তিতে লনডনের *Journal of the Royal Asiatic Society* পত্রিকায় প্রকাশ করেন (যথাক্রমে, জুন ১৯১২, মে ১৯১৪, অকটোবর ১৯১৭ এবং সেপটেমবর ১৯২১), গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করার সময় সম্পাদকীয় টীকা ও নিজের মন্তব্য যোগ করেন যার মধ্যে বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গে মন্দির ভাঙার প্রচলিত লোককাহিনীকে ইতিহাস হিসেবে স্বীকৃতি দেন। এই ধরনের ইতিহাস-বিকৃতির কুফল ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যেও পড়েছে। একটিমাত্র উদাহরণ দিচ্ছি। শ্রীরাম শর্মা তার *The Religious Policy of the Mughal Emperors* (Asia Publishing, Bombay, 3rd revised edn, 1972) মন্তব্য করেছেন 'By Babur's orders, Mir Baqi destroyed the temple at Ayodhya commemorating Rama's birthplace and built a mosque in its place in 1528-29'

(পৃ২৪)। কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই মন্তব্যের সমর্থনে না দিয়ে স্পষ্টতই সাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিক শ্রীরাম শর্মা U. P. Historical Society-র জার্নালে ১৯৩৬ প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ গৌণ সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং ব্রিটিশ সরকারি নথিপত্রের মতো সাম্প্রদায়িক এবং সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাসচর্চারও কুফল পরবর্তী কালে বিতর্কে সহায়ক হয়েছে। উনিশ শতকের শেষদিকে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে (Vol. XLIV, Pt I, Nos I-V, 1875) 'অযোধ্যা মাহাত্ম্য' নামক এক অর্বাচীন সংস্কৃত তীর্থযাত্রী-সহায়িকা গ্রন্থের ইংরিজি অনুবাদ ছাপা হয়। এর ঐতিহাসিকতা না থাকা সত্ত্বেও ঐ মাহাত্ম্যেও বলা হয় যে মসজিদের কাছে কোনো এক স্থানে রামের জন্মস্থান।

দ্বিতীয়ত, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের ভূমিকার ফলেই সরকারি দলিলে এবং ইতিহাসে সাক্ষ্যপ্রমাণহীন বিকৃতি ঢুকে যে 'মিথ' সৃষ্টি করে, তা ব্রিটিশ বিচারবিভাগ পর্যন্ত গিলতে বাধ্য হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের মোহান্তের মামলায় সব-জজ, ফৈজাবাদের জেলা জজ কর্নেল J. E. A. Chambier এবং পরে আপিল হলে Judicial Commissioner ১৯৮৬ খ্রী W. Young যে ভিন্ন-ভিন্ন রায় দেন সেগুলিতে মন্দির নির্মাণের অনুমতি না দেওয়া হলেও মসজিদ স্থানের নিকটেই যে রামজন্মভূমি এবং সীতার রান্নাঘর এবং মন্দির ভেঙে যে মসজিদ হয়েছে, সে সব কথা মেনে নেওয়া হয়। (মামলার বিস্তারিত ইতিহাসের জন্য S. K. Tripathi-র লেখা দ্রষ্টব্য। *Indian Express* দিল্লী, মার্চ ৩০, ১৯৮৬)।

উপসংহার

পূর্বোক্ত পর্যালোচনা সবিস্তারে করার পর আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে :

১. বাল্মীকির রামায়ণে বর্ণিত অযোধ্যা আর বর্তমান অযোধ্যা যে এক, তার প্রমাণ নেই।

২. রাম মহাকাব্যের নায়ক, ঐতিহাসিক চরিত্র নন। কিংবদন্তী অনুসারে রামকে মানলেও কোন্ স্থানে তাঁর জন্ম, তা বলার মতো প্রমাণ নেই।

৩. রামজন্মভূমির স্থান যেমন নির্দিষ্ট নয়, তেমনি সেই স্থানে মন্দির ছিল, একথারও কোনো প্রমাণ নেই।

৪. বাবর যে বাবরি মসজিদ তৈরি করেছিলেন, তার প্রমাণ নেই।

৫. বাবর মন্দির ভেঙে মসজিদ করেছেন কিনা, তারও প্রমাণ নেই।

৬. অযোধ্যা নানা যুগে নানা ধর্মের পবিত্র স্থান, একক কোনো সম্প্রদায়ের নয়।

৭. ঔপনিবেশিক যুগে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা, ঐতিহাসিকরা, বিচারকরা মিলে নিজস্বার্থে রাম-জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্ক সৃষ্টি করে; এবং সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সৃষ্টি করে।

আমাদের পর্যালোচনা থেকে আরো স্পষ্ট যে ভারত-ইতিহাসের যে সাম্প্রদায়িক ভাষ্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীরা করে থাকেন, নির্মোহ ধর্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস বিচারে, সত্য ও তথ্য-নিষ্ঠার নিরিখে তা ধোপে টেঁকে না। পবিত্র ধর্মস্থান হিসেবে অযোধ্যার একটি পরিবর্তনশীল রূপই ইতিহাসে দেখা যায় প্রাচীনকাল থেকে। বহু ধর্মের সঙ্গেই তা যুক্ত। সুতরাং কোনো এক সম্প্রদায় আজ অযোধ্যা দাবি করতে পারে না। রামজন্মভূমি ও বাবরি মসজিদ নিয়ে যে বিতর্ক শুরু হয়েছে এবং আশির দশকে মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে তা হয়েছে ইতিহাসকে বিকৃত করে আপন মনের মতো সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যার ফলে। অথচ ভারতবর্ষের মতো বহু ধর্ম-জাতি-ভাষা-বর্ণের সমাজে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ দৃষ্টিতে ইতিহাসকে আত্মসাৎ করে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা হলে তার ফল হবে মারাত্মক। বিনষ্ট হবে সংহতি এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের বর্তমান প্রচেষ্টা; আত্মঘাতী দাঙ্গা ও হানাহানি ও বিচ্ছিন্নতার ফলে প্রগতির পথ হবে রুদ্ধ। তাই আমাদের দেশে যাঁরা ইতিহাসনিষ্ঠ এবং সেকুলার মানুষ তাঁদের সকলের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ যেন এই সমস্যার সমাধান হয়। সরকার এবং রাজনৈতিক দলগুলি যেন রাজনৈতিক সমাধান করেন। মসজিদে নামাজ পড়ার অনুমতি বা মন্দির গঠনের অনুমতি না দিয়ে সরকার যেন জাতীয় সংরক্ষিত সৌধ (Protected National Monument) হিসেবে এটি রক্ষা করেন। সীমারেখা টেনে উভয় সম্প্রদায়ের সৌধ থাক এবং বজায় থাক ভারতের মানবিক উদার ঐতিহ্য।

সৃষ্টি

আনন্দ ঘোষ হাজরা

অমেয় আগুন থেকে অণু পরমাণু ভেঙে শরীরে অনন্ত তাপ নিয়ে
একদিন পাগলের মতো শুধু চক্রবৎ ঘুরে-ঘুরে
অগ্নি-আঘাতে রূপ নিয়ে
মহাশূন্যতার মাঝে কোনো আহ্বান শুনে নারী
সহসা অপূর্বশীতলতা খুঁজে পেয়ে
সৃষ্টির বিরামহীন উৎস পেয়ে গেল তার সমগ্র শরীরে!
প্লাবনপূর্ণতা নিয়ে নদী নামে;
শরীরে অদ্ভুত মাছ অগণন সরীসৃপ—
করতল থেকে দূরে শূন্যে উড়ে যায় কত পাখি!
সেই উৎসে অবিরাম কোটি বছরের যাত্রাপথে
জন্ম ও মৃত্যুরা খেলা করে।

হোমাগ্নিসন্নিভ ওই নারীর শরীর আজ শুনেছে
যুদ্ধের উন্মাদনা।
যুদ্ধবিলাসিনী নয় রণসজ্জা নেই তার গায়ে
সহজে কুঠার মেরে খণ্ড করি তার অবয়ব
জ্বলন্ত লোহার পিণ্ড মেরে তার অন্ধ করি চোখ
চাকার আঘাতে ছিটকে যায় বাহু পদযুগ এবং হৃদয়
কৌশল জানে না নারী শেখে নি গভীর প্রতিরোধ
যন্ত্রণায় বেদনায় টুকরো দেহগুলি খুঁজে আনে বারবার…

বেদনাসঞ্জাত সৃষ্টি-উৎসমুখ জন্মক্ষণে ওই নারী
এ সত্য জেনেছে।

এই রাত

নীতীশ চৌধুরী

উঠোনে শয্যা পেতে রাত্রি মেলেছে কালো চুল।
জীবনের কথামালা, ভরাহাট, ব্যস্ত দুপুর
সবাই ঘুমায় ঘরে। প্রবেশ নিষেধ তবু ওই
দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছে আগন্তুক ঝিঁঝিঁর নূপুর।

একলা লাজুকলতা সূর্যপ্রেমে গুনছে সময়।
উঠোনের এলোকেশী চেয়ে আছে জন্মান্ধ চোখে
লাজুকলতার দিকে। আর সারারাত
উঠোনের ঘাসে-ঘাসে মৌন শিশির পড়ে শোকে।

লাজুকলতাটি আছে নির্ঘুমে, প্রতীক্ষায় বসে—
একদিন এই রাত আলোর প্রয়াগে যাবে স্নানে॥

তিনটি পথ

শান্তিকুমার ঘোষ

তিনটি পথ চলে গেছে ভিন্ন তিন দিকে
উপরের পথ বেয়ে উপাসিকা উঠে যায় সিঁড়ি ভেঙে
ধর্মমন্দিরের অভিমুখে
ঢং-ঢং প্রার্থনার ঘণ্টা প্রতিধ্বনিত পাহাড়ে
মধ্যপথটি বেড়ে চলে তরুবীথির ভেতর দিয়ে
নিজস্ব নিয়মে
লক্ষ্যস্থল রঙ্গশালা, ঘোড়দৌড়ের মাঠ কিংবা
সেনানী-নিবাস
আর তৃতীয় যে-পন্থ—বেশ অসমান—তা কি গেছে নেমে
পাহাড়তলির ভুটিয়া বসতিতে
যেখানে পিঠে শিশু বেঁধে প্রতিদিনের সংসারযাত্রা
বইছে জননী

পথের দেবতা, বলো, আমি কোন্ পথ ধরে পাব
আমার বিরাম

দ্বিধার সাপ গিলে আছে সকল গন্তব্য

শরীফ শাহরিয়ার

দ্বিধার দুমুখো সাপ গিলে আছে আমার সকল গন্তব্য।
এখন আমি কোন্ পথে বাড়াব পা?
কোন্ দিকে হেঁটে যাব ভ্রমণের স্বপ্ন নিয়ে পরিব্রাজক?

আমার কিছু স্বজনেরা, কিছু একান্ত পরিচিত মুখ
আর আড্ডার অংশীদার কিছু বন্ধু-বান্ধব
যারা আমার প্রত্যাশায় কাটায় নীলাক্ত প্রহর;
আমার প্রত্যাগমনের পথে দৃষ্টি ছড়িয়ে
বসে থাকে খুব চেনাজানা একজন,
শরীরের ওমে যে ভরে রাখে অপেক্ষার ডিম,
আমি কি তার কাছে ফিরে যাব? আমি কি
আমার স্বজনের কাছে, পরিচিত জনের কাছে
সমর্পণ করব আমার দ্বিধাগ্রস্ত পাথর শরীর?

কিংবা যারা প্রতিপক্ষে আমার উদ্দেশ্যে
নিয়ত শানায় এক অব্যবহৃত ছুরি,
আমার হৃৎপিণ্ড যাদের একমাত্র আকাঙ্ক্ষার ফল
আমার প্রস্থানের প্রার্থনায়
যারা কাটায় দিনরাত, অষ্টপ্রহর;
আমি কি এখন তাদের দিকে বাড়াব পা?
অবুঝ শিশুর মতো হেঁটে যাব গন্তব্যের পরিণাম না জেনে?
নাকি আমি দ্বিধার সাপে দংশিত হয়ে, রক্তাক্ত হয়ে
অসহ্য অন্ধকারে অনিবার্য মেনে নেব আমার পতন!

দ্বিধার দুমুখো সাপ গিলে আছে আমার সকল গন্তব্য।
এখন আমি কোন্ পথে বাড়াব পা?
কোন্ দিকে হেঁটে যাব ভ্রমণের স্বপ্ন নিয়ে পরিব্রাজক?

বাংলাদেশ

কলকাতায় অগস্ট ১৯৪৬-এর ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের আগে আর পরে

অশোক মিত্র

সাত

ওয়েভেলের শেষ দিককার কার্যকলাপে আমি ক্ষুব্ধ হই। ১৯৪৩-এর ২০শে অকটোবর তিনি যখন গভর্নর-জেনেরল হন তখন দুর্ভিক্ষরোধে তাঁর যেরকম তৎপরতা দেখি, তার তুলনায়—১৬ই অগস্টের হত্যাকাণ্ডে এবং তার পরে তাঁর শৈথিল্য, ঔদাসীন্য, অবহেলা, মানবিকতার অভাব আমার কাছে সাম্রাজ্যবাদী চাতুরী বলে মনে হয়।

পাঠকের মনে থাকতে পারে—১১ই জুলাই, ১৯৪৪-এ লনডনের "নিউজ ক্রনিক্‌ল্" পত্রিকায় তাদের বম্বেস্থিত বিশেষ প্রতিনিধি স্টুয়ার্ট গেল্ডারের পাঁচগনিতে গান্ধীজীর সঙ্গে ৪ঠা জুলাইয়ে তিন-ঘণ্টা-ব্যাপী একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশ হয়। তার একস্থানে এই কথাগুলি গেল্ডার গান্ধীজীর নিজের উক্তি বলে লেখেন:

> আমরা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করি যে ভাইসরয়ের নিজের মতামত যাই হোক না কেন, রাজনীতি-ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। মি. চার্চিল সমাধান চান না। যদি সংবাদপত্রের রিপোর্ট সত্যি হয়, তাহলে তিনি বলেছেন আমাকে পিষে মারতে চায়। এ রিপোর্টের অবশ্য তিনি কোনো প্রতিবাদ করেন নি। আমার ক্ষেত্রে মজার ব্যাপারটি এই—এবং তাঁর ক্ষেত্রে দুঃখের—যে পৃথিবীতে কেউই একজন সত্যাগ্রহীকে পিষে মারতে পারে না—বিশেষ করে যে সত্যাগ্রহী স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের দেহকে বলির জন্যে উৎসর্গ করে নিজের আত্মাকে মুক্তি দিয়েছে।

১৩ই জুলাই, ১৯৪৪-এ গেল্ডারের রিপোর্ট সম্বন্ধে গান্ধীজী পাঁচগনিতে এই কথা বলেন:

> আমি একটি আদর্শের উদ্দেশে জীবনপণ করেছি। আমি যদি ধ্বংস হই, সেই আদর্শের জন্যেই বলি হব। আমার একান্ত বিশ্বাস, মি. জিন্না পথ আটকে নেই। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারই ভারতের

স্বাধীনতাদাবির ন্যায্য ন্যায়সঙ্গত সমাধান চান না। সে দাবি বহুদিন আগেই মেনে নেয়া উচিত ছিল। ভারতের দাবি অগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্যেই তাঁরা মি. জিন্নাকে আবরণ হিসাবে ব্যবহার করছেন। স্টুয়ার্ট গেল্ডারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে এই কথাই বলেছি।

গেল্ডার-সাক্ষাৎকারের আগে ১৭ই জুন, ১৯৪৪-এ গান্ধীজী ওয়েভেলের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার চেয়ে তাঁকে চিঠি লেখেন। ২২শে জুন তাঁর চিঠিতে ওয়েভেল সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। ১৫ই জুলাই "নিউজ ক্রনিকলে" গেল্ডার সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করে গান্ধীজী আবার সাক্ষাৎকার চেয়ে ওয়েভেলকে চিঠি লেখেন। প্রত্যুত্তরে ২২শে জুলাই ওয়েভেল গান্ধীজীকে প্রথমে 'একটি স্পষ্ট, গঠনমূলক ইতিবাচক পথনির্দেশ' প্রস্তাব করতে বলেন। ২৭শে জুলাই পুনরায় সাক্ষাৎকার চেয়ে ওয়েভেলকে গান্ধীজী চিঠি লেখেন। ১৪ই অগস্ট ১৯৪৪-এ ওয়েভেল উত্তর দেন 'যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ও গভর্নর-জেনেরল দেশশাসনের সমস্ত দায়িত্ব নিজেদের হাতে রাখবেন।'

যদিও গান্ধীজীর প্রতি ওয়েভেলের এহেন আচরণে তাঁর প্রতি আমার অনুরাগে চিড় খায়, এবং যদিও ১৯৪৬ সালে তাঁর কার্যকলাপে আমার বিশ্বাস হয় যে তিনি তখন চার্চিল-এমেরির আজ্ঞাবহে পর্যবসিত হয়েছেন, তবুও তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে গোপন শ্রদ্ধা এখনও আছে। তিনি যদি ১৯৪৩-এর নভেম্বরে মুন্সীগঞ্জ মহকুমায় না আসতেন, তাহলে আমার মহকুমায় আরো অনেক প্রাণনাশ হত। চেহারা ছিল বলিষ্ঠ—বটগাছের গুঁড়ির মতো। সারা মুখময় গভীর কুঞ্চিত রেখা, তার উপর বাঁ চোখটি কানা হবার দরুন তাঁকে আরো বটগাছের গুঁড়ির মতো দেখাত। তাঁর কাব্যসংকলন ও অনুবাদ Other Men's Flowers তাঁর কবিত্বশক্তির যথেষ্ট পরিচয় দেয়। অনেক বছর পরে দিল্লির বিখ্যাত দাঁতের ডাক্তার ডা. এম. এল. সোনির কাছে ওয়েভেলের বিষয়ে অনেক গল্প শুনি। ড. সোনির ততোধিক বিখ্যাত শিশু-চিকিৎসক বোন, শান্তি ঘোষ, আমার সহপাঠী, গান্ধীজীর ব্যক্তিগত দূত, সুধীর ঘোষকে বিবাহ করেন। ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশনের সময়ে সুধীর গান্ধীজীর পক্ষে দৌত্যকার্য করেন। ডা. সোনির কাছে শুনি—ওয়েভেল ব্যক্তিগত জীবনে কত নিরভিমান, সাদা-সিধে আর বিনয়ী ছিলেন। তার তুলনায় আজ যে-কোনো প্রদেশের ক্ষুদ্রতম মন্ত্রীকেও আকাশস্পর্শী ভেক বলে মনে হয়। ডা. সোনির কাছে শুনি—তাঁর যুদ্ধে-আহত পঙ্গু ছেলে কিরকম সাইকেল করে দিল্লীর নিদারুণ গ্রীষ্মে ভাইসরিগাল লজ থেকে পুরনো দিল্লীর সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত রোজ যাতায়াত করত। পেট্রল রেশনিং ছিল বলে লেডি ওয়েভেল পরিবারের নিজস্ব একটামাত্র ছোটো গাড়িতে ব্যক্তিগত কাজে ঘোরা-ফেরা করতেন। ১৯৮২ সালে আমার দাঁতের চিকিৎসা করতে-করতে যখন ডা. সোনি এই গল্পগুলি করতেন, তখন দিল্লীর আরেকটি বাড়িতে ভারতের আরেকজন ভাগ্যবিধাতা তাঁর মায়ের বাড়িতে রাজসম্মানভূষিত হয়ে শিক্ষানবিশি করছেন। ১৯৮৩ সালে কলকাতায় এসে যা দেখলুম তাতে আরো তাজ্জব বনে গেলুম—খুদে কর্মচারীদের স্ত্রীরা তো বটেই, তাঁদের ছোটো ছেলেমেয়েরাও অবাধে সরকারি গাড়িতে বিদ্যালয়ে যাচ্ছে, ঘরে ফিরছে।

ওয়েভেলের পর মাউনটব্যাটেন যখন এলেন, তখন সংবাদপত্রে তাঁর ছবি দেখে আমার মনে প্রথম থেকেই বিরূপতা এল। আমার মনে হল—ব্রিটিশ সরকার তাঁকে পাঠিয়েছেন ১৯৪২-এ ক্রিপস যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন, তার যেটি মন্দের ভালো অঙ্গ সেটি কারে-প্রকারে ভারতকে মানিয়ে নিতে। একটি অঙ্গ ছিল জিন্নার পাকিস্তান। দ্বিতীয় যে প্রস্তাব ছিল, তা ছিল ভারতকে কয়েক খণ্ডে ভাগ করার—যা নাকি ১৯৪২-এর ২৮শে মার্চ ক্রিপস চেম্বার অভ প্রিন্সেস, হায়দ্রাবাদ ডেলিগেশন এবং

কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তির কাছে উপস্থাপিত করেন। মাউনটব্যাটেনের ছবি দেখে আমার বিরূপতা আর সন্দেহের আরো একটি কারণ ছিল, সেটি রুচিগত। বার্ট্রানড রাসেলকে একবার অ্যালিস্টেয়ার কুক সোজাসুজি জিগ্যেস করেন, অ্যানটনি ইডেনকে তাঁর কী রকম লাগে। কুক লিখেছেন : 'তিনি (রাসেল) আমার দিকে কটমট করে তাকালেন, স্মৃতি থেকে যেন ইডেনের ছবিটি বার করলেন, সেটি ভালো করে দেখলেন। তারপর একটু চিড়বিড়িয়ে উঠে ঘাড় নেড়ে বললেন, 'বড্ড বেশি সাজগোজ করে, ভদ্রলোক নয়।' সত্যি বলতে, মাউনটব্যাটেনের সাজগোজ দেখে মনে হত যেন ম্যাডাম টুসৌর শো-কেস থেকে সদ্যগড়া তাঁর মোমের মডল্ তুলে এনেছে। কবি রবার্ট ব্রাউনিং এর বর্ণনা করতে গিয়ে (ছেলেবেলায় রাসেলদের বাড়িতে রবার্ট ব্রাউনিং আসতেন) কুককে রাসেল বলেন : 'যেন লাফাচ্ছে, একটি চালিয়াত চন্দর। মূর্ত একটি হেলেন হোকিনসন কার্টুন।' এত সব স্বপ্নের রাজপুত্তুরের সাজপোশাক সত্ত্বেও, অতি সযত্নে কথার ফাঁকে-ফাঁকে আলগোছে ইংলণ্ডের রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়া সত্ত্বেও, মাউনট-ব্যাটেনের ছবি, এবং পরে সশরীরে, দেখে আমার গভর্নর জন হার্বার্টের কথা মনে পড়ল। হার্বার্টের ক্ষণিক সংস্পর্শে আসি ১৯৪১ সালে কৃষ্ণনগরে। হার্বার্টের চেহারা দেখে আমার অডেনের লাইনের কথা মনে হয় : And proud bridge and indignant nostril nothing to do but look noble. মাউনটব্যাটেনের অবশ্য অনেক কিছু করার ছিল যা নোব্‌ল্ নয়। ব্রিজের প্রসঙ্গে মনে পড়ল তিনি ভারতে এসেছিলেন সম্রাটের তিন-তিনটি অজেয় ব্যাটলশিপ জাপানিদের হাতে খুইয়ে। পরে আমি ক্লেমেনট অ্যাটলির একটি মন্তব্য পড়ি, সেটি আমার মোটে পছন্দ হয় নি। বলেছিলেন, 'তা ছাড়া, ওঁর (মাউনটব্যাটেনের) আরেকটি মহৎ সম্পদ ছিল তাঁর অসাধারণ স্ত্রী।' যাঁদের সঙ্গে কূটকৌশল করতে হয়, তেমন লোকদের ব্যক্তিগত দুর্বলতা কী, এবং কী করে সে দুর্বলতার সুবিধা নিতে হয়, সে খবরও তাহলে জগদ্বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীদের না রাখলে চলে না, তার কথাও তাঁদের ভাবতে হয়। মাউনট-ব্যাটেনকে আমি চাক্ষুষ দেখি অনেক পরে, ১৯৭৪ সালে। তিনি তখন ব্রিটেনের প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স্ প্রিন্স চার্লসের সঙ্গে রাষ্ট্রপতিভবনে রাষ্ট্রপতির অতিথি হিসাবে এসেছিলেন। আমি তখন রাষ্ট্রপতির সচিব ছিলুম। আমি যতটুকু ভেবেছিলুম, মাউনটব্যাটেন যেন তার থেকেও বেশি লাফাচ্ছিলেন, বোধ হয় চার্লসের পাশে বয়স গোপন করার আগ্রহে। প্রিন্স চার্লসের স্বভাবগত বিনয় ও নম্রতার পাশে মাউনট-ব্যাটেনের জাহির-করা চালচলন বেমানান লাগছিল; সাজপোশাক তো বটেই। প্রিন্স চার্লস সাধারণ মানুষের মতো স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা কথাবার্তা বলছিলেন, কিন্তু মাউনটব্যাটেনের হাবেভাবে মনে হল তিনি যেন দেখাচ্ছেন তিনি কত 'উচ্চস্তরের ভদ্রলোক'। বাইরে থেকে মনে হয় কী ভদ্র আর নম্র, কিন্তু যারা সে ভদ্রতার মুখোসের সঙ্গে পরিচিত, তারাই জানে এই ধরনের মুখোসপরা বিনয়ের ভিতরে কী ঔদ্ধত্য লুকিয়ে আছে। গান্ধীজি এই ঔদ্ধত্য চিনতেন। কিন্তু আমার সময়ে-সময়ে মনে হয়—নেহরুও এই ঔদ্ধত্য চিনতেন কিনা, বা চেনার চেষ্টা করতেন কিনা।

আট

১৯৫৩ সালে নেহরু কৈলাসনাথ কাটজুকে একটি চিঠিতে লেখেন :

> 'ভারতের অদৃষ্ট অনেকাংশে হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি ও চারিত্রিক গড়নের খুঁটে বাঁধা। যদি বর্তমান হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গি আমূল না বদলায়, তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের সর্বনাশ হবে। আমার মতে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি হয়তো, হয়তো কেন অনেকাংশে,

আরো হানিকর। কিন্তু ভারতের ভবিষ্যতের পক্ষে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দু দৃষ্টিভঙ্গির মতো অত গুরুত্বপূর্ণ হবে না।'

ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে, সে পৃথিবীর বা ভারতের বলুন, নেহরুর মতো সামগ্রিক ধারণা এবং সমন্বয়সাধক মূল্যজ্ঞান পৃথিবীতে খুব কম লোকেরই ছিল বা আছে। তার বলে তিনি পণ্ডিতদের মধ্যে পূজ্য আসন অধিকার করেন। তা সত্ত্বেও, ১৯৪০ সালে চাকরিতে ঢুকে যুক্তবঙ্গের অনেক জেলায় কাজ করে এবং পরে ভারতবর্ষের অধিকাংশ জেলায় ঘুরে আমার মনে তাঁর সম্বন্ধে আস্তে-আস্তে একটি ক্ষোভ ক্রমশ জমা হয়। এটি প্রকাশ না করলে আমার মন হালকা হচ্ছে না, এবং যে-কোনো স্বচ্ছদৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিত যদি আমার ক্ষোভ অমূলক বলে বিস্তৃতভাবে লেখেন, তবে আমি নিশ্চয় স্বস্তি পাব। কী কারণে বর্ণাশ্রম আর ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের ভারে ভারত ক্রমশ ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তার প্রতিবাদে বৌদ্ধধর্ম সামাজিক সাম্য বা সমতার প্রবর্তন ক'রে দাসবর্ণের জাতপাত, উপজাতিদের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় আর আত্মসম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে ভারতে আবার কয়েক শ বছর সর্ব বিষয়ে এক স্বর্ণযুগ আনে; কিভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থানে আবার ভেদাভেদপূর্ণ সমাজ কায়েম হয় ও পরে জীর্ণ হয়; কিভাবে ভেদাভেদ ও সামাজিক বিরোধ এবং অসাম্যের সুযোগ নিয়ে মুসলমান আক্রমণের বিদেশী ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে অক্লেশে এদেশ অধিকার করে; কিভাবে হিন্দু উচ্চবর্ণের সৃষ্ট সামাজিক অসাম্য ও অত্যাচার, তার সঙ্গে লৌকিক ও জীবিকার দাসত্ব থেকে মুক্তির আশায় ভারতের সর্বত্র দাসবর্ণের জনগণ, এবং তাদের সঙ্গে উপজাতিদেরও অনেকাংশ ইসলামধর্ম—অতীত যুগে বৌদ্ধধর্ম পরিগ্রহণের মতো—আগ্রহে বরণ করে; কী কারণে ধর্মান্তরিত জনগণ ইসলামীয় সামাজিক ও ধর্মোপাসনার সাম্যের স্বাদ পেয়ে কিভাবে হিন্দু বর্ণাশ্রম সমাজের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়; কিভাবে হিন্দু উচ্চবর্ণগুলি, পূর্বকালের দাস এবং পরে ধর্মান্তরিত হয়ে রাজার জাতের শামিল হওয়া নিম্নবর্ণদের প্রতি নিষ্ফল আক্রোশে এবং জাতক্রোধে বিরুদ্ধভাব পুষে রাখে, ফলে তাদের সমগোত্রের মানুষ বলে গ্রহণ করতে অপারগ হয়—এসব বিষয়ে নেহরুর মতো জ্ঞান ও বোধ নিশ্চয় খুব কম ব্যক্তিরই ছিল বা আছে। উপরন্তু, কিভাবে যুগে-যুগে ভারতীয়দের বিধর্মীকরণস্রোত, এবং একই সাথে হিন্দু সমাজের দৃঢ়ীকরণ ও বিস্তারকল্পে, নানা স্থানে, নানা সমাজে, সর্বধর্মসমন্বয়সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে নতুন-নতুন সমাজ- ও ধর্ম সংস্কারক ভূমিষ্ঠ হয়ে দেশে নবসমন্বিত ধর্মে সামাজিক সাম্যের প্রবর্তন করার প্রয়াস পান; কিভাবে হিন্দুবর্ণাশ্রমধর্মী উচ্চবর্ণের শ্রেণীরা তাঁদের সামাজিক, ধর্মীয়, আর্থিক এবং উৎপাদিকা শক্তির অধিকারবলে সমন্বয়ধর্ম-আন্দোলনগুলিকে একে-একে নির্বাপিত করেন (একমাত্র গুরু নানক -প্রবর্তিত শিখধর্মই ব্যতিক্রম); কিভাবে এমনকী বাঙলার চৈতন্যদেব-প্রণোদিত সমন্বয়কামী বৈষ্ণবধর্মও লোপ পায়; এই শতকের স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুবর্ণাশ্রম কিভাবে ভারতের ঐক্যকে খণ্ডিত করে; কিভাবে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি যুগেই বর্ণাশ্রম শনিপ্রবেশের অমোঘ রন্ধ্র হিসাবে কাজ করেছে, সে বিষয় নেহরুর মতো জ্ঞান খুব কম নেতারই ছিল বা আছে। বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, বিদ্যাসাগর কী বলিষ্ঠ ভাষায় তাঁদের যুক্তি সাজিয়েছিলেন, তাও তাঁর অবিদিত ছিল না। নিম্নবর্ণ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ত্রিশ দশকেও এত বেশি ছিল যে, গান্ধীজী যখন হরিজন আন্দোলন শুরু করেন, এবং "হরিজন" পত্রিকাকে আপন মুখপত্র হিসাবে প্রকাশ করেন, তখন তাঁর সহকর্মীরা আপত্তি করেন এই বলে যে, এ কাজ করে গান্ধীজী ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের গুরুত্ব লঘু করে দিচ্ছেন। তবে বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী গান্ধীজী ন্যায়ের বদলে দয়া ও সমবেদনা বা সহমর্মিতার উপর বেশি নির্ভর করেছিলেন, তা না হলে হয়তো তিনি আম্বেদকরকে আরো কাছে টানতে

পারতেন।

কোনো সমস্যা বুদ্ধি দিয়ে বোঝা এক বস্তু, আর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতায় বোঝা ভিন্ন বস্তু। যেহেতু এটি আত্মচরিত, নিজের দু-একটি অভিজ্ঞতা না বলে পারছি না। আধুনিক ইওরোপীয় সাম্যবাদ সম্বন্ধে আমার শিক্ষাগুরু সুশোভনচন্দ্র সরকার এবং রাধারমণ মিত্র আমাকে অবহিত করার ত্রুটি করেন নি। সে সাম্য-শিক্ষা মুখ্যত ইওরোপীয় সমাজে অর্থোৎপাদনরীতি-জনিত, রাজনৈতিক, শ্রেণীগত ক্রমবর্ধমান অসাম্যের নিরাকরণের শিক্ষা। কিন্তু বর্ণাশ্রমজনিত আমাদের সমাজে যে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অসাম্য গড়ে উঠেছে সে বিষয়েও লিখেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা। ঠিক এই কারণেই হয়তো আমরা উঁচু-জাতের পাঠকরা তাঁদের উচিত সম্মান দিতে পরাঙ্মুখ। নৃতত্ত্বে ও জনসংখ্যাবিজ্ঞানে আমার অন্যতম দুই গুরু, যতীন্দ্রমোহন দত্ত (সাহিত্যিক ছদ্মনাম যমদত্ত) ও শৈলেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ১৯৫১-র সেন্সাসের সময়ে খ্রীষ্টীয় বারো শতক থেকে কত হিন্দু ইসলাম ও খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছে, তার একটি সংখ্যাভিত্তিক আনুপাতিক হিসাব তৈরি করেন। গোড়া থেকে ১৬ এবং ১৭ শতক পর্যন্ত ভারতের বাইরে থেকে কত মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান ভারতে আসেন, তার মোটামুটি হিসাব প্রথমে ক'রেন—ঐতিহাসিক বিবরণ আহরণ করে। যদি ধর্মান্তরকরণ না হত, তাহলে স্বাভাবিক প্রজনন হারে তাঁদের বর্তমান জনসংখ্যা কত হত তা ধার্য করেন। এখন মোট কত মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান আছে তার থেকে স্বাভাবিক বৃদ্ধিজনিত মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ান জনসংখ্যা বাদ দিয়ে তাঁরা এই কয়েক শত বছর ধরে কত ধর্মান্তরিত লোক এই দুটি ধর্মে এসেছে তার হিসাব করেন। যমদত্ত ও সেনগুপ্ত মোটামুটি এই হিসাবে উপনীত হন যে ১৯৫১ সালে মুসলমান ধর্মান্তরকরণের অনুপাত অনুসারে ভারতকে কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা এবং ভারতের সারা পূর্বাঞ্চলে এবং বাংলাদেশে (তখন পূর্ব পাকিস্তান) যত মুসলমান ছিলেন তাঁদের শতকরা ৯৫ জন এই শতকের আগের পুরুষে হিন্দু ছিলেন। অর্থাৎ আদিতে তাঁরা হিন্দু ছিলেন, পরে তাঁদের ইসলামে দীক্ষিত করা হয়। কেরলে, উত্তরপ্রদেশে, বিহারের এক-তৃতীয়াংশে, পানজাবের এবং গুজরাতের কিছু অংশে, এবং মধ্যপ্রদেশের উত্তর ও পশ্চিমাংশে ধর্মান্তরিত মুসলমানের হারাহারি কিছু কম; তাঁদের পূর্বপুরুষদের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ হিন্দু ছিলেন। যেহেতু ধর্মান্তরিত মুসলমানরা এখনও অধিকাংশই কৃষক বা কারিগর শ্রেণীভুক্ত, সেহেতু তাঁদের পূর্বপুরুষ হিন্দুরাও বর্ণাশ্রমের নিম্নসারিতে ছিলেন। এই সম্পদস্বল্পকারী দাস-জাতিদের নিজেদের কবল থেকে হারিয়ে হিন্দু-উচ্চবর্ণের বিদ্বেষ নিশ্চয় আরো বেড়ে যায়। সারা ভারতের জনসংখ্যার মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এখনও তপশিলি, অনুন্নত হিন্দু বর্ণাশ্রমভুক্ত নিম্ন জাতি, উপজাতি ও মুসলমান। তার উপর প্রায় ৩৫ ভাগ যোগ করতে হবে সেইসব জাতির জনসংখ্যা যাঁরা হিন্দু বর্ণাশ্রমে ঠিক দাসবর্ণভুক্ত নন বা অন্যধর্মাবলম্বী, কিন্তু ব্রাহ্মণ কায়স্থ, রাজপুত (ক্ষত্রিয়) বা মধ্য-উচ্চ জাতিভুক্ত নন। আজ যাঁরা উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এবং যাঁরা শিক্ষা, পেশা, অর্থ, সম্পদ আর সম্মানের বলে রাজনীতি বা হিন্দু সমাজের শীর্ষে, সমস্ত হিন্দু জনসংখ্যার তুলনায় তাঁদের আনুপাতিক জনবল শতকরা ১০ থেকে ১৫র বেশি নয়; স্থানে-স্থানে বড়ো জোর ২০। তাঁরাই এখন হিন্দু-ভারত আন্দোলনের পুরোধা। এমনকী যেসব রাজনৈতিক দল ধর্ম-বা বর্ণাশ্রম-নিরপেক্ষতার দাবি করেন, তাঁরাও কার্যত তাদের উচ্চবর্ণের উপর মুখ্য নির্ভরতার প্রমাণ দেন। যেমন ১৯৮২ সালের পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভায় মোট ৪২ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১৭ জন ছিলেন উঁচুস্তরের পদবীধন্য ব্রাহ্মণ, ১২ জন ছিলেন সর্ববিদিত পদবীভুক্ত উঁচু-কায়স্থ, ১ জন পদবীভুক্ত বৈদ্য। বাকি দশজনের মধ্যে পদবী

দেখে মনে হয় অন্তত তিনজন মধ্যশ্রেণীর জাতিভুক্ত। ১৯৫১ সালে সাক্ষরতায় সারাভারতে পশ্চিমবঙ্গের স্থান ছিল দ্বিতীয়; ১৯৮১ সালে সেই স্থান দাঁড়িয়েছে ১৮তম। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে তপশিলি ও জনজাতিদের সাক্ষরতার হার সারা রাজ্যের গড় সাক্ষরতার হারের সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র। তপশিলি মেয়েদের সাক্ষরতার আনুপাতিক হার অ-তপশিলি উচ্চবর্ণের মেয়েদের তুলনায় আরো কম, অর্থাৎ প্রায় দশমাংশ। তপশিলি জাতি ও জনজাতিদের মধ্যে শিশুমৃত্যুর হার রাজ্যের গড় হারের তুলনায় প্রায় আড়াই গুণ। উচ্চবর্ণ হিন্দুদের এই হারগুলির তুলনায় তপশিলিদের হারগুলি আরো নগণ্যের কোঠায় পড়ে। মুখে আমরা যতই অস্বীকার করি না কেন, এই রাজ্যে বর্ণাশ্রম কার্যত এখনও কত প্রবল এইসব হারে বেশ বোঝা যায়।

আমাদের আর্যকুলোদ্ভববিষয়ক দাবি যে কত হাস্যকর, সে বিষয়ে গুরু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি কথা মনে পড়ে। একদিন কথাচ্ছলে তাঁকে আমি বলি—অধ্যাপক মহলানবিশ আর রাজচন্দ্র বসু আমার মাথা মেপে বলেন, আমি মঙ্গোলীয়। ফলে, বাস্তব জীবনে নেপাল থেকে হাওয়াই পর্যন্ত যে দেশেই গেছি, সে দেশের লোক মনে করেছে আমি সেদেশীয়। সুনীতিবাবু হেসে বললেন, অশোক, আমার কুলপঞ্জীতে বলে আমি খাঁটি কনৌজী ব্রাহ্মণ বংশভূত। কিন্তু ১৯৩৬ সালে প্রশান্তবাবু আমার মাথা মেপে বলেন, আমার সেফালিক ইনডেক্স খাঁটি সাঁওতালি। অতএব আমি আমার কোনো না কোনো পিতামহ বা পিতামহীর ডন জুয়ানি বা জেজেরেল প্রবৃত্তির ফল।

নয়

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দু-একটি কথা, যা নাকি আমার মনে চিরতরে দাগ কেটে আছে, বলি।

চাকরির প্রথম অর্থাৎ শিক্ষানবিশির বছরে, ১৯৪০-৪১ সালে, আমাকে পনেরো দিনের জন্য তখনকার নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার ভেড়ামারা থানায় সে স্থানের প্রশাসন বিষয়ে শিক্ষানবিশি করতে হয় থানার বড়ো দারোগার কাছে। প্রথম শিক্ষার বিষয় ছিল, কোনো গ্রামে গিয়ে গ্রামের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে, তাদের অবস্থা সম্বন্ধে জানা। এই উদ্দেশ্যে যে গ্রামেই যাই, দেখি—ঘরের দাওয়ায় বা উঠোনে আমার ও থানা দারোগার এবং স্থানীয় জমিদারের বা হেড মাস্টারের জন্য একসার চেয়ার পাতা। তার সমুখে একটু দূরে কয়েক লাইন চেয়ার, তার উপর ধোপদুরস্ত কাপড়পরা স্থানীয় ভদ্রলোকেরা বসে আছেন। তারও দূরে, বেশ তফাত রেখে মেঝে বা ঘাসের উপর অনেক লোক, শুধু গায়ে, লুঙ্গি বা ধুতি পরে উবু হয়ে বসে আছে। যত বারই আমি উবু-হওয়া লোকদের কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাই, আমার পাশে-বসা জমিদার অথবা সামনের চেয়ারে ফর্সা কাপড়জামা-পরা বাবুদের একজন বলেন, ওরা আপনাকে গুছিয়ে ঠিক বলতে পারবে না, আমি বলছি। মহা বিপদ! এর থেকে উদ্ধারের পথ থানার দারোগা সুনীলবাবু বাতলে দিলেন। তাঁর দোনলা বন্দুক আর কিছু পাখিমারা টোটো আমার হাতে দিয়ে বললেন, মিটিঙের পর আমি পাখি-শিকারের ছলে যেন চাষের জমি ভেঙে দুচার মাইল দূরে কোনো গ্রামে একা-একা যাই। ধুতিপরা ভদ্রলোকরা কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে থাকবেন ঠিকই, আমি কী করি, কী খবর বার করি, কার সঙ্গে কথা বলি—তাই দেখতে। তবে সকালের রোদে দু-চার মাইল চষা খেত আর আল ভেঙে তাঁরা হাঁটতে পারবেন না, তখন আমি নিজের খুশিমতো যেতে পারব। তাই হল। একদিন পোশাকি মিটিং সেরে দারোগাবাবু খুনের তদন্তের ছলে থেকে গেলেন, বললেন আপনি শিকারে যান, দেড়টার মধ্যে ফিরে আসবেন। প্রথম দু-এক মাইল তিনজন ভদ্রলোক সোৎসাহে আমার সঙ্গে চষামাঠে

হাঁটলেন। তারপর হঠাৎ তাঁদের বাড়িতে জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গেল, ফিরে গেলেন। আমি হাঁটতে-হাঁটতে আরো মাইল দুয়েক দূরে একটি ছোটো গ্রামে আমবাগানের ভিতর দিয়ে যেই ঢুকতে যাব দেখি, আমার হাফ প্যানটপরা, মাথায় টুপি, হাতে বন্দুক দেখে বড়ো আর ছোটো মহিলারা, ছেলেরা, যে যার পারে ছুটে পালাচ্ছে। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে কয়েকজন বয়স্ক লোক এলেন, খালি গায়ে পরনে কোমরে শুধু গামছা বা ছেঁড়া ময়লা ছোটো কাপড়। খুব গরিব গ্রাম মনে হল। আমাকে দেখে ভয়ে কাঠ, বিমূঢ়। মনে হল ঠিক জায়গায় এসেছি। তাঁদের আশ্বস্ত করার জন্যে হঠাৎ মুখে বেরিয়ে এল, আমার বড়ো খিদে পেয়েছে, একটু কিছু খেতে দিন। বুঝলুম, অজান্তে আমার মুখ দিয়ে মহাস্ত্র বেরিয়ে গেছে, সেই অস্ত্র আমি পরে ভারতের সর্বত্র ব্যবহার করেছি, কোথাও বিফল হইনি, এমনি ভারতীয় আতিথেয়তা। পুরুষরা জিভ কেটে বলল, সাহেব, আমরা যে জাতে ধাঙড়, আমাদের হাতে খাবেন? 'খাব না তো কী, নিশ্চয় খাব' বলাতে তাঁরা যেন হাতে চাঁদ পেলেন। মুড়ি, গুড়, জল আনার জন্যে সে কী হুড়োহুড়ি। তারপর সকলে মিলে মুড়ি খেয়ে সারা গ্রাম ঘুরে দেখলুম। গেলুম ঘরদোরের ভিতর। সেই আমার ভারতের দারিদ্র্যের আর নিঃস্বতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়। অনেক দুঃখ আর কিছু অত্যাচারের কথাও শুনলুম। কিন্তু সেসব পরে অনেক দেখেছি বা শুনেছি। তবে, সকলে মিলে খাওয়াতে তাঁদের ও মেয়েদের মুখের অপার্থিব তৃপ্তির হাসি আমার চোখে এখনও লেগে আছে।

তারপর ১৯৫২-৫৩ সালে কমিউনিটি ডেভেলপমেনট কাজে বর্ধমান, বাঁকুড়া আর বীরভূমের রাঢ় অঞ্চলে বাগদি, বাউড়ি, ডোম আর সাঁওতাল বাড়িতে মাঝে-মাঝে দু-এক রাত কাটিয়েছি। বাড়িতে রাজার আতিথ্য আর যত্ন দিয়েছে, কিন্তু একেবারে মোটা, আধসিদ্ধ বুকড়ি চাল, এবং গোরুছাগল-স্নান-করানো, সবুজ-পানাভরা পচাডোবার জল খেয়ে প্রতিবারই বাড়িতে এসে ভীষণ আমাশয় হয়েছে। এইভাবে শরীরে ভুগে যাঁদের অভিজ্ঞতা না হয়েছে তাঁরা বুঝবেন না বঙ্কিমচন্দ্রবর্ণিত চরণ বাগদিরা বা পরান মণ্ডলরা কিভাবে থাকে। এ গেল পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবর্ণ হিন্দুর কথা, এবার পূর্ববঙ্গের একটি কথা বলি।

ইসলাম সব মুসলমানকে অন্তত দুটি সামাজিক সমানাধিকার দেয়। প্রথম, খাবার সময়ে সকলে মিলে একত্রে বসে একই থালা থেকে ছোটোবড়ো-নির্বিশেষে সকলের খাবার অধিকার। দ্বিতীয়, ধর্মোপাসনার সময়ে সকলে একই মসজিদে ছোটো-বড়োনির্বিশেষে পাশাপাশি বসে উপাসনা করার অধিকার। তৃতীয় একটি অধিকার আমি বরিশাল, ঢাকা, মৈমনসিং, চট্টগ্রাম সর্বত্র দেখি। মুসলমান জমিদারবাড়িতে যত ছোটো প্রজা বা ভাগীদারই হোক, দাওয়ায় উঠে বসতে পারে। এই তথাকথিত সমান মর্যাদা অনেকে নাম-কা-ওয়াস্তে বলে উড়িয়ে দিতে চান, ভুরু কোঁচকান। কিন্তু নাম-কা-ওয়াস্তেরও একটি মহৎ মূল্য থাকে, সেই সামাজিক সমতার সঙ্গে বৈষয়িক, সাংস্কৃতিক বা অর্থনৈতিক সাম্য যদি নাও আসে, তবুও। তা না হলে আমাদের দেশের কোটি-কোটি তথাকথিত ইতর-জাতের নরনারী ইসলাম বরণ করতেন না, এবং ঠিক এই কারণে আজও বোধ হয় ইসলামীয় ফানডামেনটালিজ্‌ম্ অনেক দেশে শাস্ত্রীয় লেনিনবাদী সাম্যবাদের প্রতিবাদী ও সমকক্ষ প্রতীকমূল্য বা সম্মান পেয়েছে এবং পাচ্ছে।

১৯৫০ সালে আমি কলকাতার সেন্সাস দপ্তরে বহু কর্মী নিয়োগ করার সুযোগ পাই। পূর্ব পাকিস্তানের নানা স্থানে আমার সঙ্গে একদা কাজ করেছিলেন, এমন অনেক উদ্বাস্তু হিন্দু চাকুরিপ্রার্থী হয়ে আমার কাছে আসেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র, বিক্রমপুরের এক বিখ্যাত স্কুলের প্রাক্তন সহকারী প্রধান শিক্ষক। জাতে

ব্রাহ্মণ। তাঁর প্রসিদ্ধির হয়তো এও একটি কারণ ছিল। আমি তাঁকে জিগ্যেস করলুম—তিনি বিক্রমপুর ছাড়লেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, শেষদিন পর্যন্ত কোনোরকম ব্যক্তিগত বা পরিবারগত শঙ্কাবোধের কারণ তাঁর কিছু ঘটে নি। বরঞ্চ, স্কুলে, গ্রামে, এমনকী মহকুমার অনেকেই তাঁকে থেকে যাবার জন্যে সাধাসাধি করেছিলেন। তা সত্ত্বেও একদিন সকালে হঠাৎ তিনি দেশত্যাগের যে অমোঘ সিদ্ধান্ত নিলেন তার কারণটি বললেন। সেদিন সকালে তিনি উঁচু দাওয়ার উপরে চেয়ারে বসে আছেন, এমন সময়ে গ্রামের গণ্যমান্য কয়েকজন মুসলমান ভদ্রলোক এলেন। সকলেই সমাজে মোটামুটি তাঁর সমতুল্য। এসে তাঁরা সোজা দাওয়ার উপর উঠে দাওয়ায় পাতা বেনচির উপর সহজভাবে বসলেন। মাস্টারমশায় বললেন, এরকমটি তাঁরা আগে কখনও করেন নি। সর্বদা উঠোনে বিছানো মাদুরের উপর বসতেন। সেই দিনই তিনি ঠিক করলেন, আর নয়। এই বিবরণ শুনে মুহূর্তে আমার মনে এমন অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হয়ে গেল, যা নিয়ে আমি পূর্ববঙ্গে কাজ করার সময়ে প্রায়ই অত্যন্ত চিন্তিত হতুম, কূল পেতুম না। 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান, অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।' শিক্ষিত উচ্চবর্ণের অথবা মধ্যবিত্ত খুব কম হিন্দু বাঙালিকে আমি শুনেছি মেথর বা মেছুনির সঙ্গে, গলায় কর্কশ বা হুকুমের সুর না এনে, সমানভাবে 'আপনি' সম্বোধন করে কথা বলতে। বাড়িতে এলে বসতে বলার তো কথাই ওঠে না। আবালবৃদ্ধবনিতানির্বিশেষে সকলকে 'আপনি' সম্বোধন করা আমি মুন্সীগঞ্জে বাঙালি মুসলমানদের কাছে শিখেছি।

দশ

আম্বেদকরের লেখা আমি ভালো করে জানি না। সুতরাং বলতে পারব না তিনি নিম্নবর্ণ হিন্দুসমাজে নিজেদের মধ্যে যে আর্থিক অসাম্য আছে তার বিরুদ্ধে কতখানি অসহিষ্ণুতা বা আপত্তি প্রকাশ করেন। আমি সেসব রচনাই পড়েছি যেখানে তিনি নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে সমতার, বিশেষ করে সামাজিক সমতার, স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। গান্ধীজীর বর্ণাশ্রমের সমর্থনে আমি কোনোদিনই স্বস্তিবোধ করি নি। বর্ণাশ্রমের চৌহদ্দির মধ্যে সমাজসংস্কার ও হরিজনদের পক্ষাবলম্বন, তাঁর বাণীর আধারকে "হরিজন" নাম দেয়া সত্ত্বেও, মনে হত কোথায় যেন ফাঁক বা অভাব রয়ে গেল, কোথায় যেন সমতার বদলে দয়ার রেশ আছে; তাঁর অভীপ্সা আর আম্বেদকরের সামাজিক সমতাস্বীকৃতি বা সম্মানের দাবি বর্ণাশ্রমনির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রে সমান সুযোগ এবং প্রাপ্য এক নয়। প্রথম গোলটেবিল বৈঠক থেকেই বোঝা গেল গান্ধীজী আম্বেদকরের পাল থেকে হাওয়া টেনে নিতে পারেন নি। তাঁকে গান্ধীজী কেন একান্তভাবে নিজের দলে টানতে পারলেন না, ভেবে বিমূঢ় হয়েছি। তার ফলে হরিজনদের হৃদয়ে আম্বেদকরের স্থান উত্তরোত্তর দৃঢ় হয়েছে, সে অনুপাতে গান্ধীজীর স্থান কমেছে। আম্বেদকরের বাণী এখন যে-পরিমাণ শক্তি আহরণ করেছে, সে অনুপাতে গান্ধীজীর বর্ণাশ্রম উচ্চবর্ণ হিন্দু রাজনৈতিক পটভূমিতে এখন ভীতিকর দানবাকারে স্ফীত হতে শুরু করেছে। অথচ একটু ভেবে দেখলে সন্দেহ থাকে না—আম্বেদকরকে পাশে রাখলে গান্ধীজীর ভারত আরো কত শক্তিশালী, লোকায়ত, সামাজিক সমতার দিকে এগোত। আম্বেদকরের নির্বন্ধেই আমাদের সংবিধানের প্রিঅ্যাম্বল ও মৌলিক অধিকারগুলি বিধিবদ্ধ হয়। সংবিধানের অধিকাংশ বিধিতেই তাঁর নেতৃত্বের ছাপ আছে। ভারতীয় সিভিল কোড বিলেও তাঁর হাত আর অধ্যবসায় অনস্বীকার্য, অথচ সেই সিভিল কোড বিল কার্যকর হল না। আজ যদি সিভিল কোড আইন হত তাহলে আমাদের সমাজের অনেক আপদ চুকে যেত। ক্ষোভ হয়, এ বিষয়ে তিনি কেন নেহরুর

কাছে উপযুক্ত সমর্থন আর সাহায্য পান নি।

পাঠকের মনে থাকার কথা—১৯৩৭ সালে কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশের মন্ত্রিসভাগুলিতে মুসলমানরা সংখ্যানুপাতিক আসন বা গুরুত্ব পান নি। ১৯৪৬ সালে, বিশেষ করে উত্তর প্রদেশে, এর ব্যত্যয় ঘটে নি। ১৯৩৮ সালে কলকাতায় দু-বার এসে চেষ্টা করা সত্ত্বেও গান্ধীজী কৃষকপ্রজা-কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব সাধনে সফল হন নি। ফলে ফজলুল হক অগত্যা মুসলিম লীগের সমর্থন গ্রহণ করেন। এ ব্যর্থতার মূলে একটি বড়ো কারণ, আমার এখনও বিশ্বাস, কংগ্রেসের জমিদারশ্রেণীভুক্ত হিন্দু সভ্যরা, শ্রেণীগত স্বার্থহেতু, ফজলুল হক-প্রবর্তিত কৃষিঋণখাতক আইনের বিরুদ্ধে ছিলেন। খাতকের অধিকাংশই ছিলেন নীচু জাতের হিন্দু আর উপজাতি এবং ধর্মান্তরিত মুসলমান। আমার এখনও মনে হয়—১৯৩৮ সালে গান্ধীজী যদি ফজলুল হক-কংগ্রেস কোয়ালিশন প্রচেষ্টায় সফল হতেন তবে পরের দশকে বাঙলার এবং ভারতের ইতিহাস সম্পূর্ণ ভিন্ন মোড় নিত, এবং ১৯৪০ সালে লাহোরে পাকিস্তান বেজলিউশন হয়তো অত জোরদার হত না।

অবিভক্ত ভারতে, এমনকী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পরেও জিন্না যে কখনও ইসলামিক প্রশাসনে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য ও সকলের সমান সুযোগ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিলেন, সে মনে করার কোনো নজির নেই। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক পরিধিতে বাঙলার ভৌগোলিক অবস্থান যে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ তা তিনি ভালোভাবে জানতেন। তিনি এও জানতেন যে, বাঙলার ভূমিস্বত্ব আইন ও সংশ্লিষ্ট অন্যসব আইনের দুঃসহ অসাম্য সৃষ্টির ফলে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বাঙালি মুসলমান চাষী-সম্প্রদায়, এবং সেই সম্প্রদায়কে প্রচণ্ড বিস্ফোরক বারুদের কাজে লাগাতে পারা যায়। গান্ধীজীর কৃষক-প্রজা-কংগ্রেস ঐক্য-প্রচেষ্টা যখন বিফল হল, তখন জিন্না এই সত্য উপলব্ধি করে মুসলিম লীগকে নির্দেশ দেন নিরুপায় ফজলুল হকের পার্টির সঙ্গে হাত মেলাতে।

জিন্না জীবন শুরু করেন মুখ্যত ইওরোপীয় উদারপন্থী, যুক্তিবাদী ঐতিহ্যে, যাতে ধর্মীয় গোঁড়ামির স্থান কম। বলা যায়, তাঁর মানসিক জগতের সঙ্গে নেহরুর জগতের যতখানি মিল ছিল, তাঁর নিজের সাঙ্গোপাঙ্গ বা কংগ্রেসের অন্য নেতাদের সঙ্গে ততখানি ছিল না। তাঁর কাজ আর কথা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, এই শতকের বিশ দশকের শেষ পর্যন্ত তিনি ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। সেই যুগে ইংল্যানডে একটি বক্তৃতায় সরোজিনী নাইডু জিন্নাকে 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের রাজদূত' বলে অভিহিত করেন। এমনকী বলা যায়, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জিন্না, কাজে আর কথায়, এখন আমরা ইসলামিক ফানডামেনটালিজম বলতে যা বুঝি, তাকে শতহস্ত দূরে রাখতেন। আমার ধারণা ছিল—ইসলাম কথাটি তিনি রাজনৈতিক সংজ্ঞা হিসাবে বুঝতেন, ধর্ম হিসাবে নয়। আমার সহপাঠী আর সহকর্মী বন্ধু, হুমায়ুন কবির মহাশয়ের ভাগিনেয় আখতারুজ্জামান প্রায়ই বলতেন, বিভেদ ঘুচিয়ে হিন্দু-মুসলিম ঐক্য আনতে হলে সব ভারতীয়ের একটি আহারের পদ 'অবশ্য' হওয়া উচিত, সেটি ভীল-অ্যানড-হ্যাম পাই, অর্থাৎ ষাঁড় আর শুয়োরের মাংসের মিশ্র কাবাব গোছের তরকারি। পাঠক হয়তো লঘুচিত্ততা ভাববেন, কিন্তু আমার ভাবতে ভালো লাগত যে জিন্না বোধহয় একই মত পোষণ করতেন। ব্যক্তিগত জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত জিন্না মুসলিম ধর্মীয় আচারনীতি, বিধিনিষেধ মানতেন না। এমনকী সেগুলির অনেক বর্জন করেছিলেন; নেহরু যদিও কোনোদিন মন্দিরে গিয়ে পূজা দেন নি, তবুও তিনি হিন্দু রীতিনীতি অগ্রাহ্য বা অবহেলা করতেন না। গান্ধীজী ও নেহরু যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে নিশ্চয় হিন্দু-মুসলিম এবং অন্যান্য হিন্দু জাতি ও উপজাতির উন্নতিকল্পে অনমনীয় মনোভাব নিতে

পারতেন। তা যদি করতেন, তাহলে তাঁরা নিশ্চয় জিন্নার নৌকার পাল থেকে হাওয়া টেনে নিতে পারতেন এবং ভারতের ভাগ্য অন্যরকম হত।

আমার ধারণা, জিন্না মনে করতেন—হিন্দু-গরিষ্ঠতার তরফ থেকে মুসলমান সম্প্রদায়কে যেসব আশ্বাস দেয়া হত তা দাক্ষিণ্যের শামিল; তাকে সাম্যভিত্তিক ন্যায় অথবা সমান অংশীদারি স্বীকার বলা যায় না, যা নাকি ছিল তাঁর দাবি। আমার এখনও মনে হয়—তাঁর অন্তরের আশা ছিল, ঠিক যেমন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী উনিশ শতকের প্রথম থেকে ভারতের সাংস্কৃতিক, আর্থিক, প্রশাসনিক, পেশাগত, বিজ্ঞানপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং ভারতীয় জীবনে ন্যায্য স্বীকৃতি আদায় করেছে, সেইমতো আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যুগ থেকে উদ্ভূত নতুন মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীও হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণীর সঙ্গে সমানে হাত মিলিয়ে সমান সুযোগে, সমান তালে, সসম্মানে ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে চলার সুযোগ পাবে। জিন্না এমন একটি ধর্মে জন্মগ্রহণ করেন যাতে, অন্যান্য অসাম্য সত্ত্বেও, দু-তিনটি মুখ্য সাম্য-নীতি প্রথম থেকেই স্বীকৃত হয়েছে, যথা—সকলে একসঙ্গে আহারে আসন গ্রহণ, একত্রে একপাতে খাওয়া, এবং একই সাথে মসজিদের মেঝেতে পাশাপাশি বসে ধর্মোপাসনার অধিকার, যার কথা আগে বলেছি। সেইসঙ্গে চেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সমান মর্যাদা দাবির স্বীকৃতি। এই এই স্বীকৃতি পূর্ণভাবে না পেয়ে বোধহয় তিনি দেয়ালে পিঠ দিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। মনে রাখতে হবে—পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র তাঁর মৃত্যুর পর ঘোষিত হয়। তিনি এই ধরনের ঘোষণার সপক্ষে ছিলেন—এই প্রমাণ বোধ হয় নেই। ১৯৪৬-এর অগস্টের পর থেকে আমার সর্বদা পরিতাপ হত যে কংগ্রেস, লীগ ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি নৈবেদ্যের মতো কেন নিজেদের ব্রিটিশদের হাতে তুলে ধরলেন। 'সমান' অংশীদারি কী, কিভাবে তাকে কার্যকর করা যেতে পারে, সে বিষয় কেউই যথেষ্ট চেষ্টা করেন নি বলে আমার মনে হত। পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অধৈর্য আর অসহিষ্ণুতা দুই নেতৃত্বকে ব্রিটিশের কোলে ঠেলে দিল, ঈশপের দুই বেড়াল আর বানরের গল্পের মতো। তবে, দেশভাগের পর জিন্নার একটি কাজে আমি বিশেষ খুশি হই: মাউনটব্যাটেনকে স্বাধীন পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর-জেনরল পদে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তিনি ব্রিটেন এবং মাউনটব্যাটেনকে সমুচিত জবাব দেন।

জিন্না একদা নেহরুর হাবভাবকে পিটার প্যান ধাঁচের বলেছিলেন। নেহরুর দ্বিধার ফলে পঞ্চাশের দশকে হিন্দু কোড বিল তাকে তোলা হয়, ফলে সামাজিক সংস্কারে আর অগ্রগতির পথে পাথর-চাপা পড়ে। সামাজিক আর আর্থিক অসাম্যের ভুক্তভোগী-দের জন্য একের পর এক অসার্থক নাম-কে-ওয়াস্তে কার্যসূচি চালু হয়, সত্তর আর আশির দশকে যাদের সাধারণ নাম হয় 'গরিবি হটাও' কর্মসূচি। এর ফলে গরিবি যত না হটল, তার চেয়ে বেশি হল আমলা-ফয়লার প্রসার আর তাদের মধ্যে হরির লুঠের ব্যবস্থা। আমার বরাবরই অবাক লেগেছে, পণ্ডিতজী এবং পরে তাঁর কন্যা সরাসরি অন্য অনেক আত্মসম্মান-ও আত্ম-নির্ভরতা-সূচক ব্যবস্থা ফেলে দিয়ে কেন এই ধরনের কর্মসূচির প্রশ্রয় দিলেন, যার ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আঞ্চলিক ও আর্থিক অসাম্যগুলি বজায় থাকল, অথচ সরকার একের পর এক এমন সব কার্য-সূচীতে টাকা ঢাললেন, যার মধ্যে ব্যর্থতার বীজ প্রথম থেকেই নিহিত হল, এবং দেশের অর্ধেকের বেশি নাগরিককে অনিশ্চিত কালের জন্য ভিক্ষার পথে জোর করে ঠেলে দেয়া হল।

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেহরু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মাসে দুবার নিয়মিত চিঠি লিখতেন। সম্প্রতি সেগুলি প্রকাশিত হয়েছে। সে চিঠিগুলি পড়ে সন্দেহ থাকে না—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বে ভারতের গরিমাময় স্থান তৈরি সম্বন্ধে তিনি কত যত্নবান ছিলেন। ভারত

যদি তাঁর নেতৃত্বে শুরুতেই কৃচ্ছ্রসাধনের পথ না নিত, এবং সেই সঙ্গে শিল্পোন্নয়ন, পঞ্চবার্ষিকী যোজনা, আমদানি দ্রব্যের বিকল্প উৎপাদন, সেচ, বিদ্যুৎ, যানবাহন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি এবং স্বয়ং-সম্পূর্ণতার পথে দৃঢ়পদে না এগোত, তাহলে সঞ্চিত স্টার্লিং তহবিল নষ্ট হত এবং কবে বড়ো-বড়ো শক্তি-গুলি ভারতকে পদানত রাখার ব্যবস্থা কায়েম করত, যেমন নাকি অন্যান্য বহু বড়ো দেশকে তারা এখনও রেখেছে। ভবিষ্যৎ শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে ভারতের নিজস্ব স্বাধীনতা তথা ক্ষমতা লোপ পেত। দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও অতি প্রিয় ঐতিহ্য, আকাঙ্ক্ষা, উদ্যম ও অনেক ব্যবহারিক মান তিনি সৃষ্টি করে যান। ব্যক্তিগত ভদ্রতা, ভব্যতা, স্বাভাবিক ব্যবহার, এমনকী বেশভূষায় শালীনতার মানও তিনি রেখে যান। চিন্তায় ছিলেন মহাজ্ঞানী অথচ কথাবার্তায় ছিল তাঁর শিশুবোধ্য চলিত ভাষার প্রয়োগ। অপরের যুক্তির প্রতি সহিষ্ণুতা আর শ্রদ্ধা, ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনে যা কিছু মূল্যবান, তার মান তিনি ধার্য করে যান। মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই ছিলেন বোধহয় একমাত্র ভারতীয় সুসভ্য, সুশিক্ষিত, সর্বজনসম্মানার্হ বিশ্বনাগরিক। তাঁর উদ্যমে আমাদের বিদ্যুৎ, অন্যান্য শক্তি-উৎপাদন, আণবিক প্রচেষ্টা, সেচ, পরিবহণ, সঞ্চার ও যাবতীয় গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষার প্রসার হয়। নেহরু নিজে ১৯৫৬ সালে শিল্পীকরণ রীতির দ্বিতীয় রেজলিউশনের প্রবর্তন করেন। তখন অনেক কঠোর নীতিবাদীদের মতে সে প্রস্তাব হানিকর পেরেস্ত্রোইকার মতো মনে হয়েছিল। এই রেজলিউ-শনের ফলে শিল্পের খাতে পাবলিক ও প্রাইভেট সেকটরের মধ্যে নতুন শিল্পসৃষ্টি অধিকারের পুনর্বণ্টন হয়। ফলে পঞ্চবার্ষিকী যোজনাগুলিতে সব কিছু ভরতুকি ও মূল্যনির্ণয়বিধির বলে সারা ভারতে প্রাইভেট সেকটরের অংশ বৃদ্ধি পায়। নেহরুর উদ্যোগেই সারা ভারত একটি অখণ্ড বিক্রয়স্থলে পরিণত হয় এবং তাঁরই নেতৃত্বে আমাদের মুদ্রাস্ফীতির হার পৃথিবীর অন্যান্য বহুদেশের হার থেকে এখনও কম আছে। আমাদের বিদেশী ঋণ অনেক দেশের তুলনায় এখনও অনেক কম। বহু দেশের তুলনায় বিশ্বব্যাঙ্ক ও আই-এম-এফ আমাদের উপর ঋণের শর্ত এখনও অনেক নরম আকারে প্রস্তাব করে। সেও নেহরু-প্রতিষ্ঠিত ঐতিহ্যের ফলে।

এসব তো বটেই। উপরন্তু ভারতের মঙ্গলকল্পে তাঁর প্রধান অবদান ছিল বহু পার্টির সংসদ গঠন আর ক্ষমতাবণ্টন এবং সংবিধানমতে প্রত্যেক পার্টিকে ক্ষমতালাভের গণতান্ত্রিক সুযোগ দান, সরকারের সমস্ত কার্যাবলী পার্লামেনট ও রাজ্যবিধানসভাগুলির অধীন করা। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ককে ভোটদানের অধিকার দিয়ে সরকার গড়ার ক্ষমতা এবং আমাদের যুগের বহুবিতর্কিত গ্লাসনস্ত তিনি গড়ে যান। চীন প্রভৃতি দেশে আমরা যে রকম কয়েক বছর অন্তর প্রচণ্ড ওলটপালট, ব্যক্তিপূজার চূড়ান্ত, ইতিহাসের পুনঃপুন মিথ্যাকরণ ও পুনর্লিখন, মানবিক দাবি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার লোপ ইত্যাদি দেখেছি, যার ফলে আমার জীবদ্দশায় অনেক দেশে নানা দিকে বারবার হানিকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে, সেসব থেকে আমাদের দেশ অনেকাংশে বেঁচে গেছে।

এসব সত্ত্বেও মনে একটি ক্ষোভ আমার থেকেই গেছে। এব্রাহাম লিঙ্কন বলেছিলেন, কোনো জাতি অর্ধেক দাস এবং অর্ধেক স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। আমার ক্ষোভ, কেন তিনি লিঙ্কনের সূত্র অবহেলা করলেন। ভারত-আবিষ্কারপথে তিনি নিশ্চয় জেনেছিলেন যে তাঁর দেশ অর্ধেক কেন, এক-চতুর্থাংশেরও কম স্বাধীন এবং তিন-চতুর্থাংশের থেকেও বেশি দাস, যদি দ্বিতীয় বিভাগে হিন্দু সম্প্রদায়ের তপশীলি ও অনুন্নত জাতি, অনুন্নত উপজাতি ও সংখ্যালঘু অন্য ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে ধরা যায়। তাঁর জানতে বাকি ছিল না যে দাসত্বের প্রধান চিহ্ন হচ্ছে নিরক্ষরতা, অপুষ্টি; বাসস্থান, সুস্থ পরিবেশের এবং

জীবিকার অভাব। এবং তাদের সাথী হয় উঁচু শিশু-ও প্রসূতি-মৃত্যুর হার, মাথাপিছু অতি স্বল্প ধনোৎপাদন, যার থেকে আবার আসে স্বাস্থ্যাভাব, অপুষ্টি, জ্ঞানাভাব, প্রযুক্তির দৈন্য। তিনি নিশ্চয় জানতেন, ভারতে যারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন তারা অধিকাংশই উচ্চবর্ণের হিন্দু, যারা সবকিছু সুযোগ-সুবিধার প্রায় একচ্ছত্র অধিকারী, যারা চিরকাল ধরে ভারতের ইতিহাসে ছলে-বলে-কৌশলে আধিপত্য বজায় রেখে এসেছে এবং ভবিষ্যতে যতদিন সম্ভব বজায় রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করবে না। এ বিষয়ে তাঁর মনে যদি বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকত, তাহলে গান্ধীজীর হত্যায় সে সন্দেহের নিরাকরণ হওয়া উচিত ছিল। এও তিনি অন্য সকলের থেকে নিশ্চয় বেশি গভীরভাবে জানতেন যে, আমাদের দেশের শক্তি-বৃদ্ধির জন্য মানবিক, সামাজিক, আর্থিক ও জীবিকার সুযোগের সমতার বিশেষ প্রয়োজন, এবং এই সুযোগ-সমীকরণের পথে দৃঢ়পদে না এগোলে ভারতের শক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হবে। এবং এই অভাবের দরুন অতিকায় দেহ সত্ত্বেও ভারতের পা দুটি এখনও কাদায় গড়া থেকে গেছে, এবং ঠিক এই কারণে সে জগৎসভায় তার ন্যায্য সম্মান পূর্ণভাবে পাচ্ছে না। বিদেশনীতি ইত্যাদি নীতির পাশে আমি এক কথায় একে গার্হস্থ্যনীতির অবহেলা বলব। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বে নেহরু ছিলেন সম্মানিত নেতা, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের সর্বত্র তিনি ছিলেন আদর্শস্বরূপ। তবুও এই গার্হস্থ্য-নীতি অবহেলার ফলে তৃতীয় বিশ্বেও ভারতের যতখানি গরিমাময় আসন লাভ সম্ভব হত, তা হয় নি। এই গার্হস্থ্যনীতির অবহেলা শুধু ভারতে নয়, হয়েছে পাকিস্তানে, বাংলাদেশে, নেপালে, ভুটানে, এমনকী শ্রীলঙ্কাতেও।

এমন দু-একটি 'অতি অবশ্য' ক্ষেত্রের কথা ধরা যাক, যেখানে নেহরু যদি প্রথম থেকেই দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করতেন তাহলে কোনো বিরুদ্ধতা বা গাফিলতি পাত্তা পেত না। ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে তিনি জানতেন ১৮৬৯ সালে মেইজি যুগের প্রারম্ভে জাপান-সম্রাট অন্য কোনো জনকল্যাণ খাতে কোনো সরকারি দায়িত্ব নেন নি। একমাত্র দায়িত্ব নিয়েছিলেন প্রতি শিশুর বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চার বছরে সম্পূর্ণ করার সার্বজনীন আইনের ও তার পালনের। নেহরুর কাছে অবিদিত ছিল না যে ব্রিটেন ১৮৭০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করে, যার ফলে সে দেশ দ্রুত শিল্পোন্নতির শীর্ষে ওঠে। সঙ্গে-সঙ্গে জন্মহার কমে এবং শিশু ও স্কুলের বয়সী ছোটো ছেলেমেয়েদের অর্থকর কর্মে নিয়োগ আইন-মতে রদ হয়ে যায়। শিশু ও ছোটো ছেলেদের মারফত পরিবারের রোজগার বন্ধ হওয়ায়, উপরন্তু স্কুলে শিশুদের প্রতিপালনে ও শিক্ষার খাতে পরিবারের খরচ বৃদ্ধি হওয়ায় মা-বাবারা জন্মহার হ্রাস করতে বাধ্য হয়। নেহরু সোভিয়েত দেশের যোজনা-দর্শনের ভক্ত ছিলেন। সোভিয়েত যুগের প্রথম দিকে দেশময় দ্রুত বিদ্যুৎসঞ্চারকল্পে লেনিন যখন গোয়েলরো প্লানে প্রচুর অর্থব্যয়ের সঙ্কল্প নিলেন, তখন সংখ্যাতত্ত্ববিদ স্ট্রুমিলিন তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য পেশ করে লেনিনের কাছে আবেদন করেন—যেন বিদ্যুৎসঞ্চারের থেকে টাকা কেটে সারা দেশময় অন্তত চারবছর-ব্যাপী সার্বজনীন ও আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, কারণ সে ব্যবস্থা দেশের পক্ষে আরো দ্রুততর উন্নতির সহায়ক হবে। তিনি নানা যুক্তি দিয়ে বলেন যে, দেশের সর্বপ্রকার দ্রুত উন্নতির মূলে আছে প্রাথমিক শিক্ষা, এমনকী, সনাতনী প্রথায় তিন শিক্ষা : পড়া, লেখা ও পাটীগণিত। তা ছাড়াও, আমাদের দেশেই নেহরুর সমুখে ছিল গান্ধীজীর বুনিয়াদি শিক্ষা এবং রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার আদর্শ। যদি প্রথমেই তিনি জেদ করতেন আগামী নির্দিষ্ট কয়েকটি বছরের মধ্যে দেশে পুরোপুরি সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করতেই হবে, নিরক্ষরতা দূর করতে হবে, যা সোভিয়েত রাশিয়া বা জাপানে সম্ভব হয়েছিল; যদি তিনি

তপশিলি, অনুন্নত জাতি, উপজাতি ও সংখ্যালঘু-ধর্মসম্প্রদায়গুলির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অসাম্য দূর করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ব্যবস্থা নিতেন; তাহলে সার্বিক ঐক্য, দেশের প্রতি আনুগত্য ও নির্ভরতা অনেক বাড়ত যার ফলে জাতির শক্তি আর সম্মান বৃদ্ধি পেত। আপামর সকলের মনে আসত প্রকৃত আত্মসম্মান, আত্মনির্ভরতা, স্বেচ্ছায় পরিবারনিয়ন্ত্রণ, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে পারিবারিক উন্নতির আকাঙ্ক্ষা, ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ও অর্জন—শক্তি এবং প্রতিক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রয়োগের দৃষ্টিভঙ্গি। সঙ্গে-সঙ্গে আসত সমাজের সর্বনিম্ন স্তর থেকে স্বাস্থ্য, বাসস্থান, জীবিকা, পরিবেশ ইত্যাদির উত্তরোত্তর উন্নতির দাবি।

এগারো

২৯শে অকটোবর ১৯৪৬-এ নোয়াখালির পথে গান্ধীজী কলকাতায় আসেন। ৭ই নভেমবর কলকাতা থেকে রওনা হয়ে চাঁদপুর পৌঁছন। ৩০শে অকটোবর থেকে ৫ই নভেমবর পর্যন্ত সোদপুরে প্রত্যহ বিকেলবেলা তিনি প্রার্থনাসভা করতেন। এরই মধ্যে একদিন আমরা গঙ্গা পার হয়ে চন্দননগর থেকে সোদপুরে তাঁর প্রার্থনাসভায় গেছলুম। এই প্রার্থনাসভায় তিনি বলেন তিনি নোয়াখালি-ত্রিপুরায় ছয় দিন কাটাবেন। শেষ পর্যন্ত থেকে গেলেন চার মাস। আমি তখন ভাবতুম—এই যে উনি চার মাস থাকলেন তার পিছনে প্রতিটি দুঃখীর চোখের জল মুছিয়ে দেবার ইচ্ছা তাঁর বেশি প্রবল ছিল, না তার থেকে অন্তর্বর্তী সরকারে লিপ্ত কংগ্রেস শরিকদের কাজে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা থেকে দূরে থাকার সংকল্প ছিল বেশি? ৩০শে জানুয়ারি ১৯৪৮ সালে গান্ধীজী আততায়ীর হাতে প্রাণ দেন। এর কয়েকমাস পরে রাইটার্স বিল্ডিং-এ ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের অফিসে আমি তাঁর সহকারী শ্রীসরোজ চক্রবর্তীর কাছে শুনি—হত্যার দশদিন আগে ২০শে জানুয়ারি ১৯৪৮-এ ইওরোপ থেকে ফেরার পথে বিধানবাবু গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য বম্বেতে নামেন এবং তাঁর কাছে যান। সরোজবাবু যা বললেন তাতে আমার চোখে জল আসে। ডা. রায়কে গান্ধীজী নিজের ঘরে ডেকে, পাশে বসিয়ে, তাঁর কাঁধে হাত রেখে, ছোটো শিশুর মতো কেঁদে ফেলেন। বলেন, 'বিধান, গত পঞ্চাশ বছর ধরে স্বাধীনতার জন্যে যে সংগ্রাম করেছি, সে কি খণ্ডিত ভারত লাভের আশায়? আমি লড়েছি অখণ্ড ভারতের আশায়।' দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে সংযুক্ত ভারতের যে স্টার্লিং তহবিল জমে ওঠে, পাকিস্তানকে তার ন্যায্য অংশ দিতে হবে—এ বিষয়ে গান্ধীজী জোর করেন। এই জোর করা অনেকের পছন্দ হয় নি। ১২ই জানুয়ারি তিনি অনশন শুরু করেন এই ঘোষণা করে যে ভারতস্থিত মুসলমানদের জীবন ও নিরাপত্তা রক্ষা করতেই হবে। এতেই বোঝা যায়—ভারতীয় উপমহাদেশকে অখণ্ড ভাবাই ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। রবীন্দ্রনাথের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয় গান। সে গান আমি যখন সোদপুরে, নোয়াখালি রওনা হবার আগে, তাঁর প্রার্থনাসভায় শুনি তখন মন আমার ভারাক্রান্ত হয়; গানের মধ্যে যেন আরো গভীর কোনো তাৎপর্য ছিল। তিনি ফিরে আসার পর সোদপুরে পুনরায় ৪ঠা মার্চ ১৯৪৭-এ তাঁর প্রার্থনা-সভায় আমরা যাই। ওই গান আবার শুনি। তখন তাঁকে আরো নিঃসঙ্গ দেখাচ্ছিল। প্রার্থনাসভায় গান যখন হচ্ছিল হঠাৎ আমার মনে হল আমি যেন অপার্থিব এক মহত্ত্বের সমুখে বসে আছি, যা আমার বোধশক্তির অতীত। হঠাৎ আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সেইদিনের কথা মনে হলেই আমার সেই অনুভূতি হয়, যদিও আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে তাঁর বাণীর কিছু-কিছু সম্বন্ধে আমার সংশয় ছিল, এবং আমি এখনও বিভ্রান্ত। যেমন বর্ণাশ্রমের প্রতি তাঁর অনুরাগ। তা সত্ত্বেও আমার স্বীকার করতে একটুও দ্বিধা নেই যে তিনি এমন একজন মানুষ,

যার মন আর চেতনা এত বিচিত্রভাবে ভারতের সর্ব-সত্তাব্যাপী এবং অখণ্ড ছিল, যা নাকি নেহরুরও ছিল না। তিনি যেন অজর, অমর, অথচ নিতান্ত মাটির মানুষের রক্তমাংসে গড়া একাকী বিরাজমান একটি বিরাট গ্র্যানিট।

স্বীকার: লেখকের *Three Scores And Ten: Memoirs of a Bengal* ICS; Vol II : The Fifteen Fateful years 1940-1955 প্রকাশাপেক্ষ বইয়ের অংশানুবাদ।

ভদ্রলোক

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

আমার ছেলের নাম দেবপ্রিয়। এ যাবৎ সকলের কাছে শুনে এসেছি—ছেলেটি ভালো। আজকাল কারো সঙ্গে কোনো বিষয়ে একমত হওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। নিজের ছেলের প্রশংসা কার না ভালো লাগে? আমারও ভালো লাগত যদি দেবপ্রিয় যথার্থই প্রশংসার যোগ্য হত। যোগ্য নয়, তবু অনেকে তার প্রশংসা করে। কেন করে তারা জানে, তাদের বিচার-বুদ্ধিতে আমার আস্থা নেই।

ছেলের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ আছে। আমার ছেলের বর্ণনাটা আগে দিয়ে রাখি। বাপের মতোই লম্বা সে, গায়ের রঙ উজ্জ্বল। লম্বা বলেই বোধহয় একটু রোগা দেখায়। এক সময় নিয়মিত যোগাভ্যাস করত, এখন করে না। করলেও অনিয়মিত। তবে অসুখ-বিসুখ বড়ো একটা হয় না। ছেলেবেলায় জল-বসন্ত হয়েছিল, দু-একটা চিহ্ন রয়ে গেছে মুখে। দু-একটা মানে দু-একটাই, এবং তাতে ওর মুখে একটা গাম্ভীর্যের ছাপ পড়েছে। অবশ্য আমার ধারণা—বসন্তচিহ্ন না থাকলেও ওকে গম্ভীরই দেখাত—কেননা ও স্বভাবে চুপচাপ, চোখে ওর লাইব্রেরি-ফ্রেমের চশমা।

ও কেন যে এত নিরীহ, গোমড়ামুখো তা আমি বুঝি না। ছেলেবেলাতেই ওর মা মারা গেছে, তবু ছেলেবেলা থেকেই ও যথেষ্ট হইচইয়ের মধ্যে মানুষ। এই তো সেদিনও আমরা ছিলাম একান্নবর্তী পরিবার। আমার ভাইবোনেরা চাকরি, বিবাহ ইত্যাদি নির্ভেজাল কারণে একে-একে দূরে গেছে। এখন সবারই সংসার স্থাবর-অস্থাবরে জটিল। এখন কেউ আর বিশেষ আসে-টাসে না। আমারও বয়েস হয়েছে, যোগাযোগ রাখতে পারি না। ছেলেকে বলি, সে হয়তো যোগাযোগ রাখে, আমি ঠিক জানি না।

যাক, যা বলছিলাম—আমার ছেলের মুখ গোমড়া। চোখ তার বড়ো-বড়ো—তার মায়ের মতো; কিন্তু একটু যেন রক্ত কম, ফ্যাকাশে। কপাল চওড়া, নাকি টাক পড়ছে! ওর বয়স হল আটাশ।

আমাদের কালে আটাশ বছর বয়সেই ছেলেরা বিয়ে-থা সেরে ঘোর সংসারী হত। এখন ছেলেরা একটু বেশি বয়সে বিয়ে করছে। সেটা ভালোই। আমি কখনও ওর বিয়ের জন্য তেমন ব্যস্ত হই নি। দু-একবার বলেছি, ও কোনো আগ্রহ দেখায় নি। ভেবেছি, হয়তো কোনো মেয়েকে ভালবাসে তার জন্য অপেক্ষা করছে—দেখাই যাক না। অবশ্য এ যাবৎ দু-চারজন ছাত্রী ছাড়া অন্য কোনো মেয়েকে ওর কাছে আসতে দেখি নি। ও কোনো মেয়ের বাড়ি যায় কিনা বলতে পারব না। শুনি—ছাত্রীরা নাকি ওকে যমের মতো ভয় পায়, মহিলা বলে কোনো বিশেষ খাতির নেই। মেয়ে দেখলে গলে যায় না, টলে যায় না। এটা নাকি ওর চরিত্রের দৃঢ়তার লক্ষণ। লোকে বলে, আমি বলি না। আটাশ বছরের ছেলে সুন্দরী তন্বী তরুণী দেখলে যদি গলে যায়, যদি টলে যায়—বরং সেও ভালো, থেঁকিয়ে ওঠা কোনো ভালো লক্ষণ নয়।

সেদিন এই নিয়ে জোর তর্ক হয়ে গেল বাসবের সঙ্গে। বাসব আমার পুরোনো বন্ধু। একসাথে সান্ধ্য-ভ্রমণ সেরে সেদিন ফিরছি রেলব্রিজের তলা দিয়ে। ব্রিজ পেরিয়ে রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। সে কারণেই হোক বা যাই হোক, শহরের এই অংশে সবচেয়ে বেশি আলো। লোকজন, দোকান-পাট বাজারের চেয়ে কম, ছিমছাম। শহরটা এখন এদিকে বাড়ছে। বাড়িঘরও বেশ ঝকঝকে।

বাসব মোড়ের একটা দোকান দেখিয়ে বলল, ওই দোকানটার নাম সুরুচি। ছেলে-ছোকরাদের প্রধান আড্ডা। গুলতানি, রাজা-উজির মারা, মেয়ে দেখলেই হুমড়ি খেয়ে পড়া, শিশ দেওয়া—এই ওদের কাজ। আমার ছেলেকেও সেদিন এখানে দেখলাম।

—ভালোই তো।

বাসব আমার কথায় প্রচণ্ড চটে গেল। বুড়ো মানুষের রাগ। রাস্তায় দাঁড়িয়ে, হাতের লাঠি উঁচিয়ে, শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে বাসব আমাকে যা নয় তাই গালাগালি দিল, অভিশাপ দিল।

শাপশাপান্তে আমার ভয় নেই। বাসব কাঁপছিল রাগে। আমার ভয় হচ্ছিল ওর চেহারা দেখে। কৌতূহলী দু-চারজন এগিয়ে আসবে কিনা হয়তো ভাবছিল। তাও কম অস্বস্তির না। বাসবের পিঠে হাত রেখে বললাম, শান্ত হও বাসব, তোমার শরীর তেমন ভালো না। ও কথাটা আমি কিছু ভেবে বলি নি। কথার কথা। আমারও খারাপ লাগছে খুব কথাটা বলে।

বাসব শান্ত হল, স্নিগ্ধ হল না। ক্ষোভ রয়ে গেল। দুজনে পাশাপাশি হাঁটছি, কথা নেই। বাসব তখন কী ভাবছিল জানি না, আমি ভাবছিলাম নিজের কথা। নিজেকে চিমটি কাটতে, খামচাতে ইচ্ছে করছিল। কত বছর ধরে তপস্যা করে চলেছি যে যা মুখে আসবে তা তক্ষুনি বলে ফেলব না। বলার আগে শব্দগুলো, বাক্যগুলো নেড়েচেড়ে বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে দেখব। কোথায় কী—এতদিনেও শিক্ষা হল না।

অনেকক্ষণ পরে বাড়ির কাছাকাছি এসে বাসব মুখ খুলল—আসলে তোমার তো কপাল ভালো, অমন ছেলে পেয়েছ, তুমি আমার দুঃখ বুঝবে কী করে? চায়ের দোকানে রাজা-উজির মেরে দিন কাটালে কি সিনেমার লাইনে বেল্ট নিয়ে, চেন নিয়ে যুদ্ধ করলে, বা মেয়ে দেখলে হুমড়ি খেয়ে পড়লেও তা তুমি খারাপ বলতে পার না। পারতে যদি তোমার নিজের ছেলেটি অমন হত। তোমার ভাবনা কী?

সত্যি আমার ছেলে সেসব করে না। কিন্তু করে না বলে ভাবনা নেই, এ আবার কী কথা? করলে একরকম ভাবনা, না করলে আর-একরকম ভাবনা। আমার ছেলে পাস করার সাথে-সাথেই একটা রিসার্চ স্কলারশিপ পেয়েছিল। একটা দিনও বসে থাকতে হয় নি। বাসবের ছেলে চাকরি পেলে রাত-দিন রাজা-উজির মারার সময় পেত? তার মানে এই নয় যে, সে যা করছে তা ভালো—কিন্তু কেন

করছে তাও তো দেখতে হবে। আর মেয়ে দেখলে হুমড়ি খেয়ে পড়া? ভাবলাম বাসবকে বলি—বাসব, নিজেদের কথা একবার ভাবো তো। তখন তো তোমার বিয়েও হয়ে গেছিল। তবু তুমি আমাকে টেনে নিয়ে যেতে মল্লিকপুকুরে মেয়েদের স্নানের দৃশ্য দেখতে। তুমিই তো। —যেতে না? সে পুকুর আর নেই। সেখানে এখন বাড়ি উঠেছে, রাস্তা হয়েছে। কিন্তু সেই স্মৃতিও নেই!

ওসব কিছু না, বয়সের ধর্ম। যৌবনে এরকম হয়, না হওয়াটাই অসুস্থতা। আমার ছেলে যদি মেয়ে দেখে চঞ্চল না হয়, তবে সে নিশ্চয়ই অসুস্থ। আজ না হোক কাল সে রোগ ধরা পড়বেই। তখনও কি তোমরা তাকে ভালো বলবে?

বাসবের ছেলে ভালো—এ কথা আমি বলতে চাই নি। বলতে চেয়েছিলাম, মেয়ে দেখলে হুমড়ি খেয়ে পড়লেই যে ছেলে খারাপ, তা নয়। আবার উলটোটাও খারাপ হতে পারে। প্রমাণ তো আমি দিতে পারব না। প্রমাণ ছাড়াও অজস্র কিছু মানুষ বিশ্বাস করে, আমিও করি। কার্যকারণ দ্বারা কোনো সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত আমি আমার বিশ্বাসকে ত্যাগ করব কেন?

আমার ছেলে নাকি ভালো, সোনার টুকরো। কেন?—না, সে তো কোনো রকে বসে আড্ডা দেয় না, মেয়ে দেখলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না। মুখে সে রাজা-উজির মারে না।

তা এর মধ্যে ভালোত্ব কোথায়? সমাজের কোন্ উপকারে লেগেছে সে। আমি নিজের কানে শুনেছি, এই বাসব একদিন তার ছেলেকে বলছিল, দেখ, দেবপ্রিয়কে দেখে শেখ। তোদেরই বয়সী তো, মানুষ তো দেখেও শেখে।

কী শিখবে? এটা তো ঠিকই, পড়াশুনা সবার হয় না। যেমন খেলাধুলো সবার হয় না। সবার সব হয় না। সবাই কি ছবি আঁকতে পারে, গান গাইতে পারে বা নাচতে পারে?

বাসবের ছেলের ঝোঁক ছিল ছবি আঁকায়। আমিই তো কতবার বলেছি—বাসব, ওকে আর্ট স্কুলে দাও।

বাসব বলেছে, ও কি নন্দলাল হবে, না পিকাসো? যেন ছবি-আঁকিয়ের অন্তত নন্দলাল বা পিকাসো না হলেই চলে না। তা আমার ছেলে কোন্ আইনস্টাইন হয়েছে? কেন তাহলে ওর ছেলের চোখে দেবপ্রিয় আদর্শ হবে?

আইনস্টাইন হওয়া তো দূরের কথা, আমার ছেলে সেতুবন্ধনের কাঠবিড়ালিও নয়। গবেষণায় নাম লিখিয়েছিল, কিন্তু চাকরি পাওয়া মাত্র তা ছেড়ে দিল। আমি আপত্তি করেছিলাম। শোনে নি। ওর ধারণা, মূল লক্ষ্য যখন চাকরি তখন মিছেমিছি সময় নষ্ট করে লাভ কী?

চাকরি ওকে করতেই হবে এমন তাড়া ও কেন অনুভব করল তা আমি জানি না। চাকরি নেবার আগে ওকে আমিই টাকা দিতাম, চাকরি নেবার পর দিই না। এইটুকুই যা তফাত। আমার সংসারে ওর টাকার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু চাকরির জন্য কেন যে ছটফট করত!

—চাকরির বাজার খারাপ। পরে কী পাব না পাব!

যুক্তি ওর অকাট্য। মেনে নিতে হয়, কিন্তু খুশি হই না। কেন হব? পড়াশোনায় ভালো, বরাবর ভালো সুযোগ পেয়েছে—অন্তত অন্য অনেকের চেয়ে ভালো সুযোগ।—ও কেন স্বপ্ন দেখে না?

আমি ওকে বহুবার বহুদিন বলেছি, স্বপ্ন ছাড়া মানুষের বেঁচে থাকা অর্থহীন।

নদীর ধারে ভোরের হাওয়ায়, সূর্যের প্রথম নরম আলোকরেখায়, ফুলের বনে—যেখানে যখন দেখেছি ওর চোখে সুন্দরের ছোঁয়া, ওকে বলেছি, এই ছবি তুলে রাখো মনে, হারিয়ো না।

হয়তো আমি ভুল জানি, হয়তো দেবপ্রিয় স্বপ্ন দেখে। কিন্তু কী দেখে স্বপ্নে? সে কি সুন্দরের স্বপ্ন

দেখে? আমি নিশ্চিত, ও কোনো নদীর স্বপ্ন দেখে না, স্বপ্নে দেখে না কোনো সবুজ উপত্যকা কি সুনীল আকাশ। ওর স্বপ্নে কোনো ভ্রমণ নেই। ও হয়তো স্বপ্নে দেখে ভালো চাকরি, সুন্দরী স্ত্রী, গোছানো সংসার, আর সুখ। ব্যক্তিগত সুখের স্বপ্ন দেখে।

প্রমাণ?

না, এরও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। কিন্তু স্বপ্নই যদি দেখবে তাহলে কেন ঝুঁকি নেয় না জীবনে? চাকরির বাজার খারাপ, তাই যা পেল তাই চটপট লুফে নিল। সুযোগ পেয়েছিল, তবু গবেষণা করল না। ছাত্র-জীবনে ছাত্র-রাজনীতি থেকেও দূরে থেকেছে রাজনীতির চোরাবালিতে ডোবার ভয়ে; আম-জাম-জামরুল গাছে চড়ে নি কখনও হাত-পা ভাঙার ভয়ে; সাঁতার শেখা সত্ত্বেও কখনও সে নদীতে স্নান করে নি; ফুল ভালোবাসে অথচ কখনও সে কোনো ফুল-বাগানে ঢোকে নি পাঁচিল টপকে!

দেবপ্রিয় স্থানীয় কলেজে পড়ায়। এটা তেমন লোভনীয় কোনো চাকরি নয়। তবু আমি এই ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছি যে, একটা মহৎ পেশাই বেছে নিয়েছে সে। শুধু নেবে না, কিছু দেবেও; এতে অন্তত সমাজ-সংসারের উপকার হবে। কিন্তু হচ্ছে কি? বোধহয় না। যদি হবেই তবে স্কুল-কলেজগুলির এ দশা কেন? বছরের অর্ধেকদিনই তো দেখি সে ঘরে বসে থাকে। শুধু যে ছুটি, তা তো নয়। আজ নির্বাচন, কাল ধর্মঘট, পরশু প্রতিবাদদিবস—একটা না একটা লেগেই আছে। এর কোনোটার জন্যই আমার ছেলে দায়ী নয়। দায়ী আমার সময়, আমার সমাজ।

কিন্তু স্থান আর সমাজের কি কোনো অপরিবর্তনীয় চরিত্র আছে? নেই। স্থান আর সময়ের ফ্রেমে দাঁড়িয়ে আছে যে মানুষ, তারাই স্থান আর সময়ের চরিত্র নির্ণয় করে। আর মাস্টারমশাইরাই তো মানুষকে শিক্ষা দেয়। আমার ছেলে তাদেরই একজন। কী শিক্ষা সে দেয়? নিউটনের গতিসূত্র, কোয়ানটাম থিয়োরি, ইলেকট্রনিকস···ব্যস!

ছেলেকে একবার বলেছিলাম, ছাত্ররা আজকাল তো পরীক্ষায় ভালো ফল করছে। দেশটাও এগোচ্ছে, কিন্তু কোন্ দিকে এগোচ্ছে ভেবে দেখেছিস?

ছেলে আমার প্রশ্ন শুনে বিস্মিত হয়েছিল। হয়তো বিরক্তও। বলেছিল, আমাকে যা পড়াতে দেয় পড়াই। ছেলেরা পড়ে। এর বেশি কিছু জানি না। দেশ এগোচ্ছে কোন্ দিকে সে বড়ো জটিল বিষয়। ও নিয়ে আমি ভাবি না।

সত্যি বিষয়টা জটিল। কিন্তু জটিল বলে এড়িয়ে গেলে চলবে? ছাত্ররা ভাববে না, শিক্ষক ভাববে না, অভিভাবক ভাববে না—ভাববে কে? কার দায়?

ছেলেকে বলেছিলাম, ভাবি না বললে চলবে কেন? ভাবো। দায়িত্ব এড়িয়ে বড়ো হওয়া যায় না।

ছেলে নিশ্চয়ই মনে-মনে বলেছিল—পাগল!

আমার চারপাশের বহু লোকই আমাকে পাগল ভাবে। আসলে তাদের দৃষ্টিশক্তি কমে এসেছে। বেশিদূর দেখতে পায় না। দেখতে চায়ও না হয়তো। সামান্য সুখ, সামান্য স্বস্তির জন্য ব্যস্ত সবাই। এদের একটু চিমটি কাটলেই এরা কিন্তু লাফিয়ে ওঠে। অথচ আস্তে-আস্তে শ্বাসনালী চেপে ধরলে টুঁ শব্দটিও করে না। এদের কারো চলার পথে আমার ছেলে যদি সামান্য বাধা হয়, তবে ছেলে আমার হবে মন্দ, নইলে ভালো। এইসব লোকের কথায় কী আসে যায়? এরা ভালো বললেই ভালো বলে মেনে নিতে হবে? এমন ভালো ছেলে কি আমি চেয়েছিলাম?

কয়েক বছর আগের কথা। বন্যায় চতুর্দিক ভেসে গেলেও আমাদের শহরটা কী করে যেন বেঁচে যায়। শহরের বাইরে যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর তার মাঝে-মাঝে দ্বীপের মতো ভূখণ্ড। শয়ে-শয়ে মানুষ গ্রাম থেকে এল শহরে, যত্রতত্র আশ্রয়শিবির। আমি নিজে ঘুরে-ঘুরে দেখে এলাম একদিন। এই সমাজ আর সময়ের ভাঁজে-ভাঁজে ক্লেদ আর হতাশা। তবু, মানুষের ওপর আস্থা হারানো পাপ—এই সরল সত্যটি পুনর্বার আমার চোখে ধরা পড়েছিল তখন। বিড়ম্বিত, লাঞ্ছিত যে মানুষগুলো শহরে নিতান্ত অনাকাঙ্ক্ষিত, তাদের সেদিন এ শহর সাদরে গ্রহণ করেছিল। ঘৃণা নয়, করুণা নয়—মানবিকতা তখন এ শহরের বাতাসে।

আমি অবশ্য কাজের কাজ কিছু করতে পারি নি। শুধু দেখেছি আর সান্ত্বনা পেয়েছি, তৃপ্তি পেয়েছি। সময় আর সমাজের কাছে মানুষ দায়বদ্ধ, একথাটা মানুষ যে অনুভব করেছে তা দেখে আনন্দ পেয়েছি। তবে সে আনন্দও ক্ষণিকের।

ছেলে আমার নাকি লাজুক, সবাই বলে। আমি তো জানি আসলে সে ঘরকুনো। এত বড়ো একটা বিপর্যয়েও সে ছিল ঘরে। আমিই তাকে ঠেলেঠুলে পাঠালাম। ত্রাণ আর উদ্ধারের কাজে বহু ছাত্রছাত্রীও যোগ দিয়েছে, মাস্টারমশাইরা সেখানে থাকবেন না—এ কী কথা! বরং মাস্টারমশাইরাই তো এসব কাজে উৎসাহ দেবেন, নেতৃত্ব দেবেন। হয়তো ওর সহকর্মীরা কেউ-কেউ ছিলেন। আমি জানি না। জানব কী করে? কখনও ওর কোনো সহকর্মী তো ওর কাছে আসেন নি। এলেও আমি চিনি না। যা হোক, সে আমার তাড়ায় গেল। কিন্তু মাত্র দুদিন। তারপর আমি তাড়া দিয়েও আর পাঠাতে পারি নি। কারণ?

প্রথম দিকে ত্রাণ আর উদ্ধারের কাজটা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। সকলেই সেখানে ছিল। গোলমাল বাধল সরকারি সাহায্য এসে পৌঁছোতে শুরু করলে। তখন কমিটি আর তার নেতৃত্ব; তার এক্তিয়ার নিয়ে দলাদলি খেয়োখেয়ি।

আমার ছেলে আর গেল না। গেল তো না, উলটে আমার ওপর তার সে কী রাগ! —তোমার জন্যই গিয়েছিলাম, ওসব দলাদলিতে কোনো ভদ্রলোক যায়?

বোঝো! শয়ে-শয়ে হতভাগ্য মানুষ সামান্য মানবিক সাহায্যের প্রত্যাশী। মৃত্যুর দোরগোড়ায় তারা দাঁড়িয়ে, তারা সর্বস্বান্ত। এখন কারো ভদ্রলোক থাকাটা জরুরি, না তাদের বাঁচাটা?

সেই মানুষগুলোকে সাহায্য দেওয়া নিয়ে দলাদলি, খেয়োখেয়ি। তাই দেখে বিরক্ত অথবা বিব্রত অথবা সন্ত্রস্ত দেবপ্রিয় পালিয়ে এসেছে। দেবপ্রিয় ভদ্রলোক এবং সে চায় না তার সেই শখের পোশাক-আশাকে ধুলো লাগুক বা কাদা লাগুক। এমনই জরুরি তার কাছে ভদ্রলোক হয়ে থাকা। কিন্তু কেন? কী লাভ? আমার কী ভীষণ লজ্জা। লজ্জা তাদের দেখে—যারা কাজ ছেড়ে কৃতিত্বের ভাগ বুঝে নিতে ব্যস্ত। লজ্জা আমার ছেলের জন্য, আমার ছেলের মতো ভদ্রলোকদের জন্য—যারা প্রকৃতির রোষে বিপর্যস্ত মানুষগুলোর পাশ থেকে তুচ্ছতম অজুহাতে পালিয়ে গেল।

অবশ্য আমার ছেলে ভদ্রলোক। অবশ্যই। পাড়ার লোকেও বলে।

এমন গুণী ছেলে, অথচ যেমন বিনয়ী, তেমন নম্র ব্যবহার। সর্বদা মুখে হাসি লেগেই রয়েছে। কারো সাতে-পাঁচে নেই। খাঁটি ভদ্রলোক।···

দেবপ্রিয়ও যেন এই "ভদ্রলোক" শিরোপাতে পরম তৃপ্ত। ভদ্রলোকের তো কোনো দায় নেই, দায়িত্ব নেই—না সমাজের কাছে, না সময়ের কাছে। তাই সে দিব্যি আছে—পরিতৃপ্ত, নির্বিকার, নিশ্চিন্ত। তার এই সুখী অস্তিত্বটা আমার অসহ্য। এই আচরণটা ছিঁড়তে, এই খোলসটা ভাঙতে ইচ্ছে করে আমার, আমি ছটফট করি, আমি প্রার্থনা করি। বৃথাই—আমার প্রার্থনা ব্যর্থ।

এবার আমি প্রতিবাদ করতে চাই। এই ভদ্রলোকের মন্দমধুর হাওয়ায় এমন তরণী বাওয়া আর নয়। তার অমলধবল পালে একটু লাগুক কাদা।

কেন?

আমার পাড়ায় একটা ভাঁটিখানা আছে। দিনের বেলা তেমন টের পাওয়া যায় না। তবে সন্ধে হলেই ওখানে হল্লা শুরু হয়। আমার ধারণা, ভাঁটিখানাটা

বেআইনি। শহরের বুকে এরকম ভাঁটিখানা থাকতে পারে? ছেলেকে বলেছিলাম এ বিষয়ে খোঁজখবর নিতে। কয়েকবারই বলেছি—লাভ হয় নি।

—এসব ব্যাপারে নাক গলানো উচিত হবে না। ছেলে আমাকে বারবার এরকম বোঝাতে চেয়েছিল।

পাড়ার লোকেরও তাই মত—কী দরকার মশাই ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর? কেউ-কেউ বলেছে, এসবের মধ্যে ঢুকলে খুব বিপদে পড়বেন, মশাই। ছেলেছোকরারা ওখানে নিয়মিত যায় আসে, ওদের ঘাঁটাবেন না। আড়ালে কেউ-কেউ এমনও বলেছে যে ওটা আমার বাড়ির ঠিক পেছনে বলেই আমার যত জ্বালা।

ঠিকই। ওটা আমার বাড়ির ঠিক পেছনে। কিন্তু ওটা তো পাড়ার মধ্যেই—কারো বাড়ির পেছনে, কারো বাড়ির সামনে। আর ওখানে যে ছেলে-ছোকরারা ভিড় জমায় তারা তো আমাদেরই ঘর থেকে বেরিয়ে ওখানে যাচ্ছে। কারো কোনো চিন্তা নেই, চলছে চলুক। নিজের ছেলেকেও শাসন করে না, অথবা সেই সাহসটুকু হারিয়ে ফেলেছে।

বলেছিলাম, পিকেটিং। সত্যাগ্রহ……

লোকে হেসেছে। গান্ধীবাদের যুগ শেষ। আমি পিকেটিং, সত্যাগ্রহ দেখেছি। আমি জানি জোরটা মানুষের, জোরটা শেকড়ের—গান্ধীবাদ তো একটা পতাকা।

—তা তোমরা ওড়াও না লাল পতাকা, মার্কস-বাদী পথেই না হয় যাহোক কিছু করো। বিষবৃক্ষ উপড়ে ফেলো। আসল কথা—কিছু করতে হবে।

আমার ছেলে বারবার বলেছে, কিছু করার নেই। চেষ্টাও কোরো না। এসবের পেছনে আছে রাঘব-বোয়ালরা, এসবের মধ্যে যেয়ো না বাবা, বিপদে পড়বে।

রাঘব-বোয়াল কারা এবং এর পেছনে কারা কতখানি আছে না আছে আমি জানি না, জানতে চাই নি। শুধু আমি এটুকু জেনেছি, আমার একার চেষ্টায় কিছু হবে না। আমার সে জোরও নেই।

পাঁচজনে বলেছে, ছিটেল বুড়ো।

এভাবেই চলছিল। হঠাৎ গত সন্ধ্যায় প্রচণ্ড শব্দে একটা বোমা ফাটল আমার বাড়ির পেছনে। তারপর আরও কয়েকটা। তখন সবে সন্ধে হয়েছে, ছেলে তখনও বাড়ি ফেরে নি। টিউশনি করছে হয়তো কোথাও, অথবা লাইব্রেরিতে। তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম দোতলায়। আমার ছেলে থাকে দোতলায়। তার ঘর খুলে বাতি জ্বালালাম। জানালাটা খোলাই ছিল। বাইরে তাকিয়ে দেখি আগুন লেগেছে ভাঁটি-খানায়। ওটা আসলে একটা ঝুপড়ির মতো—ছিটেবেড়ার ঘর, খড়ের চাল। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওপরে উঠছে। আশেপাশের ঘরগুলির আলো নেভানো।

মধু উঠে এসেছে পায়ে-পায়ে। মধু আমার কুড়ি বছরের সঙ্গী, আমার ভৃত্য। আলো নিভিয়ে জানালা বন্ধ করে মধু আমাকে নামিয়ে আনল নীচে। মাতালদের ঝগড়া আমারও দেখার ইচ্ছে ছিল না। ওরা এভাবেই যদি নিজেদের ধ্বংস করে তো করুক।

খানিক পরে মধু আবার এল। তখনও বোমবাজি চলছে। আগুন নিভেছে কি নেভে নি জানি না।

মধু বলল, দাদা যে এখনও ফিরল নি।

অন্যদিন কখন ফেরে?

এ সময়েই তো ফেরে।

ব্যাপারটা তো ভাববার মতোই। তবে এমন হতে পারে যে গোলমাল দেখে ও পাড়ায় ঢোকার চেষ্টা না করে নিরাপদ স্থানেই চলে গেছে।

মধুকে বললাম—চিন্তা করিস না, দেখ আর খানিকক্ষণ।

বাইরে তাণ্ডব চলছে। থেকে-থেকেই ভেসে আসছে চিৎকার।

ছেলে ফিরল রাত দশটার পর। সঙ্গে পুলিস।

—কী ব্যাপার, সঙ্গে পুলিস কেন?

ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখি, তার চোখেমুখে আতঙ্ক আর উত্তেজনা। বেশবাস অবিন্যস্ত। সে কিছু

বলতেই পারল না। পুলিসের লোকটিই উত্তর দিলেন:

—ব্যাপার আর কী। জানেন না? সন্ধে থেকেই তো চলেছে। আপনার বাড়ির পেছনে। দু-দল গুণ্ডার মধ্যে মারপিট। একদল ভাঁটিখানায় আগুন লাগায়। খবর পেয়ে আমরা আসি। ততক্ষণে মারপিট বেশ জমে উঠেছে। আমরা এগোই নি, দেখছিলাম। ভালোই লাগছিল। এভাবে যদি ওরা শেষ হয় তো ওদেরও ভালো, আমাদেরও ঝনঝাট কমে। তা, মাস্টারমশাই এর মধ্যে বাড়ি ফিরছিলেন। হারাম-জাদারা তো স্ট্রীটলাইট নিভিয়ে দিয়েছিল। মাস্টার-মশাই ব্যাপারটা ধরতে পারেন নি, তাই না? আমরা সে সময় ওখানে না থাকলে……

লোকটি দেবপ্রিয়র মুখের দিকে তাকালেন, সে কোনো জবাব দিল না, কোনো মন্তব্য করল না। তার শ্বাস তখনও স্বাভাবিক হয় নি। স্পষ্টত ক্লান্ত, অবসন্ন সে।

লোকটি বোধহয় একটু বেশি কথা বলতে ভালোবাসেন, আর ধৈর্য কম। দেবপ্রিয় কিছু বলছে না দেখে আবার নিজেই শুরু করলেন তিনি:

—মাস্টারমশাই না বুঝে গোলমালের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। লড়তে-লড়তে ওরাও তখন এসে পড়েছিল সামনের রাস্তায়। কেউ একজন ধাক্কা দিয়ে মাস্টারমশাইকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল। হয়তো ধাক্কা দেবে বলে বা মারবে বলেও নয়, হঠাৎ-ই ঘটে গেছে। আমরা কাছেই ছিলাম। এক-জন যখন ওঁকে লাথি মারল আর উনি চিৎকার করে উঠলেন—আমাকে মারছ কেন তোমরা, আমি দেবপ্রিয়, দেবপ্রিয় বসু, কলেজে পড়াই—আর আমরা চুপ করে থাকতে পারলাম না। পারা সম্ভবও নয়। সীমানা ছাড়ালে তো আমাদের কিছু করতেই হয়। সমাজের গণ্যমান্য ভদ্রলোকদের ওপর হামলা হলে তো আমরা তা সহ্য করতে পারি না। ধরেছি দুটোকে। হারামজাদাদের এমন শিক্ষা দেব—

—শুধু দুটো কেন? এবার আমার ছেলে মুখ খুলল। তার চোখেমুখে তখনও উত্তেজনার ছাপ। সে বলল, যদি সব কটাকে ধরতে পারেন তবেই কিছু কাজ হয়। রোজ ওরা এখানে মদ খায়, হল্লা বাধায়, পাড়ায় টেঁকাই দায়।

—আপনি চেনেন ওদের?

—চিনব না? অনেককেই চিনি, সকলেই চেনে। রোজই তো দেখছি। শুধু যে এ-পাড়ায় তা তো না। কী সিনেমাহলে, কী বাজারে, কী স্কুলকলেজে, খেলার মাঠে—সর্বত্র এরা যায়, গোলমাল বাধায়, ভয় দেখায়। এদের এক-দুটোকে ধরে কী হবে, এদের সব কটাকে শায়েস্তা করা দরকার।

লোকটি এতক্ষণ যে কথা বলছিলেন তার মধ্যে একটা রঙ-তামাসার সুর ছিল। মাস্টারমশাই—সমাজের গণ্যমান্য একজন ভদ্রলোককে সাহায্য করার তৃপ্তিবোধ ছিল। এবার তাঁর চোয়াল শক্ত হল। চাহনি তীব্র হল। কপালে ভাঁজ। দু-এক মুহূর্ত। তারপর আবার তেমনই হঠাৎ পেশীগুলো শিথিল হয়ে গেল।

—বেশ তো, আপনি একটা স্টেটমেনট দিন। আমি সব কটাকে চালান করে দেব। আপনারা সাহায্য করলে এদের টাইট করতে আর কতক্ষণ?

উনি উঠলেন, মাথায় টুপি চাপালেন, মৃদু হাসলেন। পিছন ফিরতে আমি বললাম, চললেন যে! স্টেটমেনট নেবেন না?

—ব্যস্ত হবেন না, লোকটি আমার ছেলের দিকে ফিরে বললেন, বিশ্রাম নিয়ে আপনি ভেবেচিন্তে লিখুন। কাল সকালে তো আমাকে একবার আসতেই হবে এ পাড়ায়। তখন না হয় স্টেটমেনটটা নিয়ে যাব।

লোকটি আমাকে বা দেবপ্রিয়কে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে দ্রুতপায়ে চলে গেলেন।

আমি তবু বললাম, কী দরকার ছিল—আজই নিয়ে যেতে পারতেন। আবার কাল কেন—

শুনলেন অথবা শুনলেন না। বাগানে, আমার বাগানে তখন মৃদু জ্যোৎস্নার আলো আর হাসনুহানার

গন্ধ।

অনেক দিন পর রাতে একসঙ্গে খেতে বসলাম আমরা। তবে কেউ কারো সঙ্গে কথা বিশেষ বলি নি। আমি দু-একটা প্রশ্ন করেছি, ও তার উত্তর দিয়েছে। স্পষ্টত ক্লান্ত আর অন্যমনস্ক। অথবা সে মগ্ন ছিল কোনো ভাবনায়। কী সে ভাবছিল? পুলিশের কাছে কী বলবে কাল?

সকালে চা খেয়ে ওপরে উঠলাম। কাল সন্ধেয় গিয়েছিলাম একবার, দেখা হয় নি। আজ বহুকাল পরে ঘরটা দেখলাম। বেশ ছিমছাম, গোছানো। একপাশে ছেলের খাট, মাথার দিকে একটা টেবিল, চেয়ার। পশ্চিমের দেওয়ালে আলমারি, আলমারির মাথায় ওর মায়ের ছবি। ছবিটা বেশ উঁচুতেই, অল্প ধুলো জমেছে সম্ভবত। বেডসাইড টেবিলে চা। দেব-প্রিয় এখনও ঘুমোচ্ছে। চিরকাল সকালের এই ঘুম ওর খুব প্রিয়। পুবের খোলা জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ওর পায়ের কাছে। জানালা ভেজিয়ে দিলাম। সেই শব্দেই সম্ভবত ওর ঘুম ভাঙল। উঠে বসল। বলল, কিছু বলবে?

যেন ব্যস্ততা ফুটে উঠল ভঙ্গিতে। আমি কিছু বলতে আসি নি। দেখতে এসেছি। বাড়ির দক্ষিণে ভাঁটিখানা। ওই জানালাটাও খুলে দিতে চাই, দেখতে চাই পরিত্যক্ত রণক্ষেত্রের চেহারা। তা আর দেখলাম না। কী জানি, হয়তো ও বিব্রত বোধ করছে। দুধারে মাথা নেড়ে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

তখনও নটা বাজেনি। দেখি দেবপ্রিয় বেরোনোর জন্য তৈরি। সাধারণত সকালটা সে বাড়িতে থাকে। আজ কেন বেরোচ্ছে?

—জরুরি কাজ আছে নাকি? আমি আমার কাজ ফেলে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে এসে ওকে প্রশ্ন করি। হাতে অল্প কাদা। ফুলগাছগুলোর গোড়ায় মাটি দিচ্ছিলাম।

—হ্যাঁ।

—এখুনি ফিরবে?

—না।

—কাল যে ভদ্রলোক বলে গেলেন সকালে আসবেন।

—পুলিশের লোকের কথার ঠিক আছে নাকি, কখন আসবে না আসবে। হয়তো আসবেই না।

—এলে কী বলব? তোমার স্টেটমেনট—

—আমার কিছু বলার নেই।

পুলিশের লোকটি এসেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছি, আমার ছেলের কিছু বলার নেই।

তিনি মুচকি হেসে বললেন, ঠিক আছে। আমি তাঁর মুখের দিকে তাকাতেই হাসিটি বড়ো হল, মোলায়েমও হল। তারপর অর্ধেক মোচড়ে শরীরটা এক পাশে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, জানতাম। সেজন্যই তো কাল রাতে স্টেটমেনটটা নিই নি। বুঝলেন তো।

আবার আধা-মোচড়ে পুরো ঘুরলেন। চলে যাচ্ছিলেন। থামালাম। বললাম—শুনুন, আমার ছেলের কিছু বলার নাই থাকতে পারে, আমার বলার আছে। আমার অভিযোগ আছে।

—কার বিরুদ্ধে?

—আমার ছেলের বিরুদ্ধে।

লোকটি ঘুরে দাঁড়ালেন আবার। কোনো চপল হাসি নেই, চঞ্চলতা নেই। শুধু কপালে খান দুই ভাঁজ।

কমিউনিস্ট দুনিয়া ভাঙনের মুখে কেন?

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

[এ যুগের ভগীরথ, মিখায়েল গোর্বাচেভ চেষ্টা করে যাচ্ছেন যাতে পৃথিবী থেকে কমিউনিস্ট বংশ লোপ না হয়। স্তালিনের শাপে ভস্মীভূত কমিউনিস্ট নেতা, সেনট্রাল কমিটির সদস্য, সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তা, লেখক, সাংবাদিক, অর্থাৎ কমিউনিস্ট আন্দোলনের পূর্বপুরুষেরা যেন সাচ্চা কমিউনিস্ট হিসাবে ইতিহাসে স্থান লাভ করেন। এটাই তাঁর কামনা। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে গণতন্ত্রীকরণ এবং মুক্তসমাজ গঠনে যে ভাবের গঙ্গাকে তিনি আনতে চাইলেন সাম্যবাদী দুনিয়ায়—এতদিনে হয়তো সেই গঙ্গার পতনবেগ সেই দুনিয়া সহ্য করতে পারবে। গোর্বাচেভের ভাবগঙ্গা অনেক দেশকে স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কেউ বলছেন, এই স্রোত সাম্যবাদী দুনিয়াকে রসাতলে নিয়ে যাবে। কেউ-বা বলছেন, গোর্বাচেভের নির্দিষ্ট পথ ধরে চলেই এই স্রোতোধারা মৃত কমিউনিস্ট শহীদদের ভস্মরাশির উপর দিয়ে প্লাবিত হয়ে তাঁদের মুক্তি দেবে, জীবন্ত তদের (মন যাদের মৃত অর্থে ব্যবহার করেছি) দেবে নতুন জীবন, নতুন প্রাণসঞ্জীবনী সুধা।

কিন্তু, এখনও সেই ভাবের গঙ্গা মতান্ধতা, মূঢ়বিশ্বাস, মন্ত্রবদ্ধ সংস্কারের জটায় আবদ্ধ হয়ে আছে কয়েকটি অঞ্চলে—আলবেনিয়ায়, মহাচীনে, কিউবায়, ভারতবর্ষের দুটি রাজ্যে—হয়তো ভিয়েতনামে।]

ভারতের "সাচ্চা" মার্কসবাদী দল মার্কসবাদেরই মুখপাত্র হিসাবে মুখ খুলেছেন। মার্কসবাদের ইতিহাসেও এমন দৃশ্য কমই মেলে যেখানে কোনো মার্কসবাদী দল পূর্ব ইউরোপের এবং পূর্ব জার্মানির বিস্ফোরক ঘটনাবলী দেখে শুধু বিস্ময় আর অনুতাপ প্রকাশ করে। যাঁদের "জনগণে"র প্রতি আনুগত্যের শেষ নেই, "জনতা"র ইচ্ছাকে তাঁরা যখন অসম্মান দেখান তখন তাদের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। পূর্ব-ইউরোপের ও পূর্ব জার্মানির জনগণের রায় দেশী মার্কসবাদীদের বিচলিতই করে নি, রুমানিয়ার ডিক্‌টেটর মহামতি চেসেস্কুর পরিণতিতেও তাঁরা বিষণ্ণ এবং ক্ষুব্ধ। সব ঘটনাই তাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়েছে 'সাম্রাজ্যবাদের ও আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া'র যোগফল হিসাবে। দেশী মার্কসবাদীদের মতে, সাম্যবাদবিরোধী শক্তিগুলিই ওইসব দেশের জনগণের বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে সাম্যবাদী গণতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র'কে খাড়া করার চেষ্টা করছে। 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে'র নাম করে, সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে বিসর্জন দিয়ে তারা চেষ্টা করছে 'ধনতন্ত্র'কে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে। আর এ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির 'প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য' তো আছেই। সাম্রাজ্যবাদই চাইছে পূর্ব-ইউরোপের জনগণকে তাদের ফ্যাসিবাদবিরোধী এবং সাম্যবাদী সমাজগঠনের দীর্ঘদিনের সাফল্যগুলিকে ভুলিয়ে দিতে, চাইছে সাম্যবাদী সমাজের কৃতিত্বগুলিকে হেয় করতে। তাই এদেশী মার্কসবাদীদের আশা, পূর্ব-ইউরোপের 'জনগণ'ই এইসব অপচেষ্টা রুখবেন তাঁদের সর্বশক্তি দিয়ে। আবার পুরনো সাম্যবাদী জমানা ফিরে আসবে ওই সবদেশে।

বোঝা যাচ্ছে, দেশী মার্কসবাদীরা রোগটা কী আজও তা নির্ণয় করতে অসমর্থ। ফলে, রোগের 'কারণ' নির্ণয়েও তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন। যেসব সমাজে কয়েক দশক ধরে একপার্টি-সাম্যবাদী-নায়কতায় সমাজ পরিচালিত হল, যেখানে সর্বস্তরে মার্কসবাদী শাস্ত্র অধ্যয়ন আবশ্যিক ছিল, যেখানে 'শিক্ষা, বাসস্থান ও স্বাস্থ্যের অধিকার' যে সুরক্ষিত, তা জনসাধারণ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেই জানে; যেসব দেশে অন্য কোনো দল নেই, "এক মত, এক পথ"—এটাই যেসব দেশের মানুষকে শেখানো হয়েছে নিরবচ্ছিন্নভাবে, সেইসব দেশেই অকস্মাৎ আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার

শক্তি এল কোথা থেকে? তবে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য? বালির স্তূপে দেশলাইকাঠি ফেললে আগুন জ্বলে না, দাহ্যপদার্থে ফেললে তবেই জ্বলে। অর্থাৎ প্রযোজক (agent) থাকলেই শুধু ঘটনা ঘটে না, তার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র বা সংস্থান (collocation) প্রয়োজন। সাম্যবাদী দেশে, পূর্ব-ইউরোপে, এবং পূর্ব জার্মানিতে "একনায়কীসাম্যবাদ"-বিরোধী "ক্ষেত্র" কিভাবে তৈরি হল, কেনই বা হল—যাতে সাম্রাজ্যবাদীরা উশকানি দিলেই খাণ্ডব-দাহন ঘটে? এসব প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে সাম্যবাদী দুনিয়ার ভাঙনের চরিত্র বোঝা যাবে না। সমস্যা না বুঝলে সমাধানও নেই।

২

আসল প্রশ্নটা তাই এই: কেন নানা সাম্যবাদী দেশে সাম্যবাদবিরোধী মানসিকতা আর আবেগ জমা হল? কেন টোটালিটারিয়ান সমাজগঠন আর অর্থনীতির বিরুদ্ধে এত জনরোষ? কেন ওসব দেশের মানুষ বহু-দলীয়, নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাইছে? কেন ওখানকার মানুষ "কমিউনিস্ট শাসন" অবসানের জন্য উঠেপড়ে লেগেছে? কেন তারা চাইছে অর্থনীতিতে "বে-সরকারি উদ্যোগ"? আন্তর্জাতিক "ব্যক্তিমালিকানাধীন" ক্ষেত্রের সঙ্গে সহযোগিতা, অত্যাধুনিক প্রযুক্তি আর বৈদেশিক সাহায্য? এর আগে দুটি প্রবন্ধে তার আলোচনা আছে। মৌলবাদী, মন্ত্রমুগ্ধ দেশী মার্কস-বাদীরা যেভাবে মার্কসশাস্ত্র বুঝেছেন এতদিন, তাতে এর ব্যাখ্যা হবে না।

৩

১৯১৭ সালে, রুশদেশে প্রথম যে বিপ্লব ঘটে, ইতিহাস তাকে চিহ্নিত করেছে "মার্চ বিপ্লব" হিসাবে। এই গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল অগোছালো এবং অনেকটাই আকস্মিক। কেরেনস্কি-পরিচালিত যে "অস্থায়ী সরকার" গঠিত হয় এই বিপ্লবের ফলে, তারা "বাক্-স্বাধীনতা", "সমিতিগঠনের স্বাধীনতা", "মুদ্রণের স্বাধীনতা", "ধর্মঘট ঘোষণার অধিকার", তাবৎ রাজ-বন্দী ও নির্বাসিতদের মুক্তিদান, এবং যাবতীয় ধর্ম ও জাতিসমূহের জন্য "সমানাধিকার" ঘোষণা করে। কিন্তু যুদ্ধকালীন রুশদেশের সংকটদীর্ণ অবস্থায়, লেনিনের নেতৃত্বে, সযত্নে পরিচালিত ও সুসংগঠিত "নভেম্বর বিপ্লব" সম্পন্ন হয়। কেরেনস্কির অস্থায়ী সরকারের সদস্যরা গ্রেপ্তার হন, কেরেনেস্কি পালিয়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচান। একদিক থেকে "নভেম্বর বিপ্লব" সাম্যবাদী আন্দোলনের মাহেন্দ্রক্ষণ, অন্যদিকে পরবর্তী কালের টোটালিটারিয়ান সাম্যবাদের অঙ্কুরও এখানে। বলশেভিকরা ক্ষমতাসীন হল রাশিয়ায়—এমন একটি সমাজে যে সমাজ পাশ্চাত্য দেশগুলির তুলনায় অনগ্রসর, এবং যে সমাজ কৃষিপ্রধান, শিক্ষা-বিহীন, প্রথানুসারী সমাজ। এমন দেশে প্রতিষ্ঠিত হল এক মায়াময় "গণতন্ত্র"—যার নাম প্রলেতারি-য়েতের "গণতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র" (dictatorship)।

লেনিন অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমতা রাখতেন। তাঁরই নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি অনগ্রসর রুশ সমাজের ঘড়ির কাঁটাকে এগিয়ে দিয়ে, "সময়কে অনেকটা এড়িয়ে দিলাম" ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করলো। তাঁদের উপর যেন দায়িত্ব এসে পড়ল একশ বছরের পথ দশ বছরে অতিক্রম করে যাওয়ার। ফলে ধনতন্ত্র সম্পূর্ণ-ভাবে গড়ে উঠবার এবং সমাজ 'আধুনিক' হবার আগেই ভূমিষ্ঠ হল "সমাজতান্ত্রিক" নবজাতক।

এ নবজাতক অনেকটা দশমাস দশদিনের অনেক আগে ভূমিষ্ঠ-হওয়া ইনকিউবেটর-শিশুর মতো। একে পালনের সমস্যা অনেক, আবার এ শিশু বড়ো হলে স্বাভাবিক হবে, না ভারসাম্যহীনতায় ভুগবে—সর্বদা সেই ভয়।

বিপ্লবীরা তো পাকার আগেই সমাজতন্ত্র-রূপ ফলটিকে ইতিহাসবৃক্ষ থেকে তড়িঘড়ি পেড়ে ফেলে-ছিল। ভেবেছিল—প্রদীপের উত্তাপে রেখে, নয়তো কারবাইড দিয়ে ফলটিকে পাকিয়ে নিলেই হবে। আমরা তো শুনি, কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাবার কথা। তেমনি বিপ্লবীরাও ভেবেছিল—হোক না রুশ সমাজ অপ্রস্তুত অপরিপক্ব সমাজ। প্রলেতারীয় ডিক্টেটর-শিপের শক্তির জোরে রুশ সমাজ রূপান্তরিত হবে সাম্যবাদী সমাজে।

তর্কের দিক দিয়ে, এমনকী তত্ত্বের দিক দিয়ে, হয়তো এ বক্তব্যকে সমর্থন করাও চলে। তবে ফলিত সমাজতন্ত্রের দেশের ইতিহাসদেবতা অলক্ষে সেদিন হেসেছিলেন। সম্প্রতি তিনি দেখিয়ে দিলেন যে, ঘড়ির কাঁটাকে এগিয়ে দিলেই সমাজকে এগিয়ে দেওয়া যায় না; তড়িঘড়ি সমাজকে পাকিয়ে তুলতে গেলে অস্বাভাবিক পরিণতির প্রবল আশঙ্কা থাকে। অবশ্য বলশেভিক সাম্যবাদীদের বিশ্বাস ছিল অন্য ধরনের। তাঁদের স্থিরবিশ্বাস ছিল, ইচ্ছামন্ত্রের ও সংগঠনের জোরে তারা অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে; যা পরিপক্ব হয়ে ওঠে নি তাকেও অকালে পাকিয়ে তুলতে পারে। তার জন্য দরকার চতুরানন দেবতার, যার একটা মুখ: "পার্টি", দ্বিতীয় মুখ: "রাষ্ট্র", তৃতীয় মুখ: আমলাতন্ত্র; এবং চতুর্থ মুখ: পার্টি-নিয়ন্ত্রিত "সেনাবাহিনী"।

এই চতুরমুখ দেবতার দাক্ষিণ্যে শিশু সোভিয়েত রাষ্ট্র অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা কাটিয়ে, মিত্রপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফ্যাসিবাদবিরোধী যুদ্ধে জয়লাভ ক'রে বড়ো হতে লাগল। ক্রমশ এই দেশে স্থাপিত হল পার্টি-রাষ্ট্রের একচেটিয়া ধনতন্ত্র। ব্যক্তিমালিকানাহীন সোভিয়েত দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত মূলধন সমস্ত "জাতীয় সম্পত্তি"র মালিক হয়ে ওঠে; মূল্যনিয়ন্ত্রণসংস্থা, বাণিজ্যসংঘ, জমি, কারখানা, যন্ত্রপাতি, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক—রাশিয়ার সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনকে নিজেদের বিচার, অভিরুচি, মর্জি-মাফিক পরিচালিত করতে থাকে।

এই "পার্টি-রাষ্ট্র-মোড়লতন্ত্র" ক্রমশ ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে সমাজে। বাজারের অর্থনীতির নিয়ম এবং আধুনিক অর্থনীতির বস্তুগত নিয়মাবলী ভেঙে, চাহিদার দিকে না তাকিয়ে, এক "কৃত্রিম" পরিকল্পিত অর্থনীতির কাহিনী দুনিয়াময় রটিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবেই শিশুরাষ্ট্রটি বড়ো হচ্ছিল, যদিও এর দেহ-গঠনে সুষমা এবং সামঞ্জস্যের অভাব লক্ষিত হচ্ছিল। কিন্তু সোভিয়েত সমাজে গোড়াকার কাজ ছিল কৃষি-প্রধান দেশকে শিল্পায়িত করে তোলা।

সোভিয়েত রাষ্ট্রের একচেটিয়া মূলধন হোঁচট খেতে-খেতে পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত কোনোরকমে এই কাজ সম্পন্ন করে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত।

৪

কিন্তু তারপর "নতুন যুগ" এল—সাইবারনেটিকসের যুগ। এল ইলেকট্রনিকস্ শিল্প, এল দূরদর্শন। এল যন্ত্রগণক। আসছিল স্বয়ংক্রিয় উৎপাদনব্যবস্থা, যন্ত্র-মানবিক—রবোটিক্সের যুগ। এ যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি ভাবুকেরা অনেক আগেই চিহ্নিত করেছিলেন। বলেছিলেন—এ যুগে নিখিলবিশ্বের সঙ্গে যোগসাধন করতে হবে, কেননা আজকের দুনিয়া "এক ও অবিভাজ্য" এবং এ দুনিয়াটা হয়ে উঠছে প্রযুক্তি-নিবিড় (technology-intensive) এবং বার্তা-সমৃদ্ধ (information rich)। এ যুগে শিল্পায়িত সমাজের উত্তরণ ঘটবে শিল্পোত্তর (post-industrial society) সমাজে। ফলে, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে, সমাজে, মানুষের চিন্তায়, ভাবনায়, সংস্কারে দেখা দেবে রূপান্তর।

আগেই বলেছি, একপার্টিনায়কতাধীন সাম্যবাদী সমাজ বদ্ধ জলার মতো। এতে নদীর বহমানতা নেই, নেই সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গ। সাম্যবাদ নামে যে সমাজ একদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সমাজ "সামাজিক সম্পত্তির" অধীশ্বর-রূপে "পার্টি-রাষ্ট্র" জনগণকে বঞ্চনা করেছে। অনেক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত "বাক্-

স্বাধীনতা", "দলগঠনের স্বাধীনতা", "অবাধ নির্বাচন", "পক্ষপাতশূন্য আদালত", "মুদ্রণ-স্বাধীনতা" প্রভৃতি মৌলিক নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে মানুষকে। ইতোমধ্যে দেশে শিক্ষাবিস্তার ঘটেছে। দূরদর্শনের দৌলতে দুনিয়ার সব কাহিনী আর সংবাদ মানুষ ঘরে বসে শুনেছে আর প্রত্যক্ষ করেছে। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে, মোহমুক্তি ঘটেছে ধীরে-ধীরে। স্বাধীনতাহীনতায় তাদের জীবন বিতৃষ্ণায় ভরে গেছে। অন্যদিকে পার্টির, রাষ্ট্রের এবং রাষ্ট্রীয় মূলধনের কর্তারা চর্ব্যচোষ্যলেহ্যপেয় আত্মসাৎ করেছে, বিত্ত আর ক্ষমতার চূড়ায় উঠেছে, জনসাধারণকে বিপ্লবী বুলির আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চেয়েছে। ১৯৬৯ সালে ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রোজার গারোদি তাই কমিউনিস্ট দুনিয়ার কাণ্ডারীদের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—সাম্যবাদের সম্মুখে সমূহ সংকট। কাণ্ডারী হুঁশিয়ার। একনায়কী আসুরিক, "সনাতনী সাম্যবাদ" ছাড়ো, গণতান্ত্রিক মানবিক সাম্যবাদের ক্ষেত্র তৈরি করতে আরম্ভ করো। যুগ পালটাচ্ছে—যুগধর্ম বুঝে পরিবর্তনকে স্বাগত জানাও। তিনি লিখেছিলেন—

'It is as a militant Communist and in the certainty that socialism alone is capable of creating social relations commensurate with the exigencies of the tremendous mutation wrought by science and technology, and of exploiting that change in the service of the freedom of all men without exception—it is because of these two factors that I say unequivocally to the Soviet leaders:

'The socialism we want to build in France is not the socialism you are forcing upon Czechoslovakia !'

"গণতন্ত্রসম্মত মানবতাবাদী সমাজতন্ত্র গড়ো",—তাঁর দুই দশক আগেকার এই আহ্বানে কোনো সাম্যবাদী দেশের মোড়ল-প্রধানেরা সাড়া দেয় নি। আর এই বই লেখার অপরাধে গারোদিকে শেষ পর্যন্ত ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়তে হয়।

৫

দীর্ঘদিন ধরে সাম্যবাদী দেশগুলি যে "অর্থনীতি" গড়ে তুলেছে তার কেতাবি নাম সমাজতন্ত্র হলেও আসলে তা "রাষ্ট্রায়ত্ত একচেটিয়া ধনতন্ত্র"। কথাটা ১৯৬৯ সালে মিলোভান জিলাস তুলেছিলেন। তাঁর এই নাস্তিক্যধর্মী কথায় গোঁড়া সাম্যবাদীরা কান দেয় নি। অথচ জিলাস ছিলেন যুগোশ্লাভিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় নেতা—টিটোর পরেই যাঁর স্থান ছিল। তিনি বলেছিলেন—কমিউনিজমের ভবিতব্য ভালো নয়। কেননা, সাম্যবাদী দেশগুলিতে উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে উৎপাদনসম্পর্কের বিরোধ দেখা দিচ্ছে। ফলে, যে ভবিতব্য দেখতে পেয়েছিলেন মার্কস, রাষ্ট্রায়ত্ত ধনতন্ত্রের দেশের ভবিষ্যৎ-ও একই রকম হবে। আলাদা কিছু হবে না।

Under Communism the productive forces have come into conflict with the relationships of production; and if we substitute 'Party' for 'Capital', then we can see before our eyes a vision of Communism's destiny, the one that Marx had assigned to Capitalism:

"Monoply capital (party monopoly) becomes fetters on the mode of production which flourished with it and under it.

[The Unperfect Society : M. Dijlas : London : Unwin Books : 1972 edition, pp 133)

জিলাস আরও বলেছিলেন—একচেটিয়া আধিপত্য আর মতান্ধতা মিলিয়ে সাম্যবাদী সমাজের "সম্পত্তি" [জাতীয় অর্থনীতি] বিকাশের নৌকা ভাঁটার টানে আটকা পড়ে যাবে। তখন কাদা আর পাঁক থেকে একে আর টেনে তোলা যাবে না।

পাশ্চাত্য দেশের অর্থনীতি যে প্রতিযোগিতার দৌড় আরম্ভ করেছে, তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাধ্যও এদের নেই। কারণ হিসাবে জিলাসও গারোদির যুক্তিগুলিই হাজির করেছেন। তিনি বলেছেন: সাধারণভাবে সাম্যবাদী সমাজ যা করতে সক্ষম হয়েছে তা হল, ছোটো-শিল্প-নির্ভর, কৃষি-অর্থনীতিকে রূপান্তরিত করা আধুনিক অর্থনীতিতে। হয়তো তাতে দাম দিতে হয়েছে অনেক, জোরজুলুমও খাটাতে হয়েছে। কিন্তু যেই নতুন যুগের দাবি এল, শিল্পায়িত সমাজ থেকে শিল্পোত্তর সমাজে উত্তরণের দায় এল, তখনই এরা পড়ে গেল বিপদে। জিলাসের লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি—

To put the matter simply, Communism has in the main shown itself capable of effecting the transformation of a craft and peasant economy albeit with harsh and costly methods; but it has plunged into difficulties, as was inevitable, because it now has to pass out of the industrial stage, with the aid of electronics and massive education programmes and the employment of skilled scientific workers, into a new and more complex stage—the age of automation and mass production and mass consumption. (তদেব, পৃ ১৩৪)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, আধুনিক ধনতান্ত্রিক দেশে অল্পসংখ্যক বড়ো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে উৎপাদনের একীকরণ হলেও, মাঝারি আর ছোটো আকারের প্রতিষ্ঠানও আছে। কিন্তু একথাও মনে রাখা দরকার যে এখনকার বড়ো-বড়ো প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগই হল যৌথ কারবার (joint stock company)। একক কোনো মূলধনীর পক্ষে গড়ে তোলা অসম্ভব এমন সব কারবার ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এই যৌথ কারবার। উন্নত ধনতান্ত্রিক সমাজ অর্থনীতিতে বহুত্ববাদী, একচেটিয়া মূলধনের প্রাধান্য থাকলেও, অন্যান্য মূলধনকেন্দ্র আছে বলেই এই বহুত্ববাদ বহাল আছে ওই সমাজে।

৬

অ-সাম্যবাদী সমাজে জয়েনট স্টক কোম্পানি গড়ে না উঠলে রেলপথ, খনি, ধাতু-কারখানা, বড়ো মোটর-কারখানা, জাহাজ-নির্মাণ কারখানা—সবই অসম্ভব হত। সাম্যবাদী অর্থনীতিতে যেমন প্রতিযোগিতারই প্রশ্ন নেই, কারণ সম্পত্তির একচেটিয়া মালিক "পার্টি-রাষ্ট্র", অসাম্যবাদী ধনতান্ত্রিক সমাজে একচেটিয়া ব্যবসায়ী সমিতির মধ্যেও কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর সংগ্রাম থাকে। এবং এই প্রতিযোগিতা থাকে বলেই উৎপাদনব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হয়, যথাসময়ে। ফলে উৎপাদনব্যবস্থার উন্নতি হয়। গোঁড়া কমিউনিস্টরা ভুলে গেছে অথবা চেপে গেছে মার্কসের নিজের কথা:

'The Capitalist Joint Stock Companies should be considered, just as the cooperative factories, as forms in transition from the Capitalist to collective mode of production, except that in the former an antagonism is abolished negatively, while in the latter it is abolished positively'. (Marx : Capital)

৭

পূর্বে এক প্রবন্ধে বলেছি, কেন অতিকেন্দ্রিক আমলাতান্ত্রিক সাম্যবাদী সমাজের অর্থনীতির রথ কাদায় আটকে গেছে। রথের বোঝা কমালে যেমন কাদা থেকে রথকে তুলে আবার চালানো যায়, তেমনি পার্টি-রাষ্ট্র-আমলাতন্ত্রের বোঝা নামিয়ে সমাজতন্ত্র যদি অর্থনীতির নিয়ম মেনে চলে, তবে হয়তো এর উদ্ধার ঘটবে। সেই উদ্ধারকর্মে ব্রতী হয়েছে সাম্যবাদী সমাজের জনগণ। সাম্যবাদী দেশগুলিতে

"প্রলেতারীয় গণতন্ত্রে"র নামে একপার্টিনায়কতার টোটালিটেরিয়ান রাষ্ট্রকাঠামো তৈরি হল, তার কারণ রাজনীতি বহুলাংশে শাসককুলের জরুরি অর্থ নৈতিক স্বার্থকে প্রতিফলিত করে। অর্থনীতিতে একচেটিয়া মালিকানা (পার্টির) বহাল রাখতে গেলে পাশ্চাত্যের ধাঁচে নিয়মতান্ত্রিক, বহুদলনির্ভর গণতন্ত্র চালু করা সম্ভব নয়; নতুন শাসককুলের স্বার্থসম্মতও নয়। সাম্যবাদী দেশের রাজনীতিও তাই রাষ্ট্র, পার্টি, আমলাতন্ত্র, সেনাবাহিনী নিয়ে গঠিত যে "নতুন সুবিধাভোগী শ্রেণী", সেই শ্রেণীর স্বার্থরক্ষাই করে এসেছে এতকাল। এই সুবিধাভোগীরাই দেশের রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়ার শক্তি। আজ এদের ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে চাইছে সাম্যবাদী দেশগুলির লক্ষ-লক্ষ মানুষ।

তারা গণতন্ত্র চাইছে, মৌলিক সংস্কার চাইছে, চাইছে একপার্টিনায়কতার অবসান। তারা ফিরিয়ে আনতে চাইছে বহুদলীয় সাংবিধানিক প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। শাস্ত্রবচন আউড়ে দেশী মার্কসবাদীরা এদের বিদ্রূপ করে বলছে, এরা বুর্জোয়া গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে চায়, ফিরিয়ে আনতে চায় ধনতন্ত্রকে।

জানি, বলশেভিক সাম্যবাদে (মার্কসবাদে নয়) বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে "ধোঁকাবাজি" বলা হয়েছে। ডায়ালেকটিকসের হিং-টিং-ছট্ মন্ত্রোচ্চারণ করে বলা হয়েছে—একপার্টিনায়কতাধীন প্রলেতারীয় গণতন্ত্রই "সাচ্চা নির্ভেজাল গণতন্ত্র"। এই মন্ত্রে বশ করে বেশ কিছুকাল সাম্যবাদী সমাজে পার্টির ও রাষ্ট্রের পাণ্ডারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। কিন্তু ক্রুশ্চেভ-আমল থেকেই মানুষ মোহমুক্ত হচ্ছিল। এ যেন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো। গোর্বাচভ এসে সোভিয়েত দেশে যেসব ব্যবস্থা চালু করলেন, তাতে স্বাধীনতা, সংস্কার ও মুক্ত সমাজের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা সার্থকতার পথ খুঁজে পেল। সাম্যবাদী দেশের মানুষ দাবি করল একপাথুরে সমাজ, একপাথুরে (monolithic) সংকীর্ণ, "একমাত্র দল" নয়; একদলীয় রাজনীতি রাষ্ট্রীয় আধিপত্যাধীন অর্থনীতি আর নয়। চাই বহুত্ববাদী রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ। চাই—যত মত, তত পথ। কেন এ দাবি, অন্য আর-এক দিক থেকে বিচার করা যাক।

৮

যেসব দেশে এতদিন কমিউনিস্টদের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা করায়ত্ত ছিল, সেসব দেশে পার্টি হয়ে উঠেছে ক্ষমতালাভের প্রবেশপথ। "ঐক্যবদ্ধ, সুশৃঙ্খল পরিচালন"-ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পার্টির শাসনকার্য চলে। সরকারি শাসনব্যবস্থায়, শিল্পে, কৃষিতে, সশস্ত্র সৈন্যবাহিনীতে, গুপ্তপুলিশ বিভাগে, স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থাৎ কিনা 'সমাজতান্ত্রিক' ছাপ্পাধারী সব দেশেই প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে পার্টির একজন না একজন অধিষ্ঠিত হবেই। প্রশাসনের প্রত্যেক পর্যায়ে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে পার্টির যে-সমস্ত সংগঠন আছে, তাদের কাজ হল সরকারি নীতিকে কাজে রূপায়িত করা, অন্যদের কাজের তদারকি করা। ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্যে একটি "যন্ত্র" হিসাবে কাজ করানোর জন্য লেনিন পেশাদার বিপ্লবীদের নিয়ে যে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, গত সাত দশক ধরে লেনিনের পদাঙ্ক আজও বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি অনুসরণ করে চলেছে। যুগ পালটেছে অনেক দিন, কিন্তু সোভিয়েত দেশে, পূর্ব ইউরোপে, পূর্ব জার্মানির অভ্যন্তরে—সেই পুরনো ধাঁচের দলই রয়ে গেছে। সাংগঠনিকভাবে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো পরিবর্তন হয় নি ভিতর থেকে। হবেই বা কী করে? এবং কেন?

এটা ধরে নেওয়া হয় যে, অ-দলীয় ব্যক্তিদের চাইতে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যেরা (অল্পশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, শিক্ষিত যাই হোন না কেন) বেশি নিষ্ঠাবান আর কর্মদক্ষ। পার্টি যতদিন বিপ্লববাদী আর আদর্শবাদী থাকে, ততদিন পর্যন্ত এই বিশ্বাসের কিছুটা যাথার্থ্য থাকে। কিন্তু আংশিক বা সম্পূর্ণ ক্ষমতা করায়ত্ত হলে পার্টি হয়ে ওঠে কর্মজীবনে উন্নতিলাভের একটা পথ। সব সমাজতান্ত্রিক দেশেই পার্টি-সদস্যরা সমাজে "সুবিধাভোগী গোষ্ঠী" হিসাবে গড়ে উঠেছে। বিপ্লবকালীন সেই জ্বলন্ত উৎসাহ ক্ষমতাসীন সব পার্টিতে বিলুপ্ত হয়েছে। লেনিনের প্রবর্তিত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পার্টির সভ্যেরা আজ আর অর্থ এবং ক্ষমতা সম্পর্কে উদাসীন নয়। বাড়ি, গাড়ি, শৌখিন বেশভূষায় বা বিলাসের মধ্যে জীবন যাপনে তাদের যে অরুচি, এমন কথা আজ আর বলা চলে না। শ্রমিকটুপি ও সাদাসিধে জীবন যাপন করার দিনগুলি আজ বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। এখনকার আদর্শ কমিউনিস্ট হলেন হোনেকার, কিংবা চেসেস্কু। আজকাল খুদে নেতারাও ভালো দর্জির পৃষ্ঠপোষক। সপ্তাহান্তে কিংবা মাসান্তে পল্লীভবনে কিংবা পাহাড়ে, কিংবা সমুদ্রতীরস্থ হোটেলে তাঁরা ছুটির দিন কাটাতে যান। আরও খুদে সভ্যরা নেতাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে নিজ-নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী আত্মসুখ খোঁজেন। প্রচারে, বক্তৃতায় অবশ্যই বলা হয় যে, কমিউনিস্ট পার্টি হল "এক নতুন ধরনের পার্টি" (party of a new type); সব দেশের মানুষের অভিজ্ঞতা কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। এইসব সভ্যদের নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি নিজেকে জাহির করেছে সমাজের অভিভাবক, অন্তত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসাবে। নানান অভিযোগের নিষ্পত্তির জন্য, চাকরি-বাকরি, ফ্ল্যাট-বাড়ি বণ্টনের ব্যাপারে, সাংসারিক বিবাদ-বিসংবাদ বিচার করবার জন্য নানা স্তরের পার্টি-সভ্যদের ধরতে হয়। পার্টির আস্থাভাজন ব্যক্তিরাই নানা বিভাগে অধিষ্ঠিত হন। এ ছাড়াও পার্টির কর্মচারীদের জানা-অজানা অনেক কাজ করতে হয়।

৯

সাম্যবাদী দেশগুলিতে অনেকদিন ধরেই পানাসক্তি, অপরাধপ্রবণতা, মাদকাসক্তি, উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এইসব পাপ আর অপরাধকর্ম নিরোধের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি সমাজ-সংস্কারের কোনো আন্দোলন করে নি। তত্ত্বগতভাবে তাদের বক্তব্য ছিল এই যে, অপরাধ, দুষ্কৃতি ও পাপকর্ম—সবই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ফল বা উপবৃত্তি। তাই ধনতন্ত্র যতদিন থাকবে ততদিন এইসব অন্তর্হিত হবে না। সাম্যবাদী সমাজে এসব দোষ দেখা যাচ্ছিল কেন, তার জবাবে বলা হত—এগুলির জন্য সাম্যবাদী ব্যবস্থা দায়ী নয়। এর জন্যও ধনতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু চিন্তা-ভাবনা, নীতিবোধই প্রকারান্তরে দায়ী। কুযুক্তি খাড়া করে, "যত দোষ নন্দ ঘোষ" তত্ত্বের আড়ালে সব দেশের কমিউনিস্ট পার্টি-ই এ-যাবৎ সমাজের, বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের কুকর্মের দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়ে দায় সেরেছে; নতুন মানুষ, নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে।

এহেন পার্টিকে সাম্যবাদী দেশে মানুষ মেনে চলত ভয়ে—শ্রদ্ধায় কিংবা ভালোবাসায় নয়। আজ সেই ভয় কেটে গেছে মানুষের। ফলে নানা দেশে আজ কমিউনিস্ট পার্টি যাচ্ছে রঙ্গমঞ্চের পিছনে।

১০

সাম্যবাদী দেশের মানুষ গণতন্ত্র চাইছে কেন? এজন্য নয় যে, প্রতিনিধিত্বমূলক "গণতন্ত্র" সর্বাঙ্গসুন্দর, শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রব্যবস্থা। তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে তারা শিখেছে, "প্রলেতারীয় গণতন্ত্র" বন্ধ্যামাতা কিংবা আকাশ-কুসুমের মতো মিথ্যা। এক ঘোড়ার দৌড় যেমন নিরর্থক, এক পার্টির আজ্ঞাধীন "গণতন্ত্র" তেমনিই লোক-ঠকানো ব্যাপার। সার্থক ঘোড়দৌড়ে যেমন অনেক ঘোড়া চাই, তেমনি গণতন্ত্রকে সার্থক করতে গেলে, একাধিক পার্টি চাই। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে চার বছর, পাঁচ বছর পরে-পরে "নির্বাচন" চাই।

এসব হলেই গণতন্ত্রের "চরম আদর্শ" ধরিত্রীতে

নেমে আসবে, "আদর্শ সমাজ" তৈরি হবে, তা নয়। আসলে ব্যবহারিক জীবনে "চরম আদর্শ", "সর্বাঙ্গ-সুন্দর সমাজ"—কথাগুলিই অবান্তর। এসব কথা মুগ্ধ-করে, মুগ্ধ ক'রে মানুষকে মারে। সাম্যবাদী সমাজের মানুষ "গণতন্ত্র" চাইছে এই জন্য যে, ওসব দেশে গণতন্ত্রের গোড়াপত্তন হয় নি এতদিন। মানুষ বাস করেছে স্বেচ্ছাতন্ত্রী সমাজে। গণতন্ত্র কেন? তার জবাবে একদা চার্চিল বলেছিলেন হিটলারের পতনের পর, অশুদ্ধ ইংরাজিতে (ইচ্ছা করে) পরিহাস-রসিকতার ভঙ্গিতে: 'Democracy is the worst form of Government, except the others,—"গণতন্ত্র নিকৃষ্টতম গভর্নমেনট; অবশ্য অন্যান্য সরকারকে বাদ দিয়ে।" অর্থাৎ পাশ্চাত্যের আধুনিক গণতন্ত্র, ফ্যাসিবাদী গণতন্ত্র কিংবা প্রলেতারীয় গণতন্ত্র, কিংবা জনগণতন্ত্র, কিংবা চৈনিক গণতন্ত্র থেকে উৎকৃষ্টতর। এই চার্চিলীয় বক্তব্য বোধ হয় সাম্যবাদী দুনিয়ার মানুষের মাথায় ঢুকেছে। আর একবার স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানবতার পোকা জনগণের মাথায় ঢুকলে তা হয়ে দাঁড়ায় অপ্রতিরোধ্য শক্তি।

গ্রন্থসমালোচনা

আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতা-বাদ : সমাধানের সূত্রসন্ধান

খালিদ আহ্‌মেদ

আধুনিক ভারত-ইতিহাসের অসামান্য বিশ্লেষক বিপানচন্দ্রের "কমিউনালইজম ইন মডার্ন ইনডিয়া" (১৯৮৪) গ্রন্থের অনুবাদ "আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ"। বিশ্ববিদ্যালয় মনজুরি কমিশনের জাতীয় বক্তা হিসেবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতার ভিত্তিতে দশটি প্রবন্ধ নিয়ে বইটি রচিত। আলোচ্য গ্রন্থটি সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের সময়ানুবর্তিক আখ্যান নয়; এতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিবর্তনের রেখাচিত্র নেই। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও এর বিষয়বস্তু নয়।

বিশাল এই বইটিতে 'সাম্প্রদায়িকতাবাদের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির বিশ্লেষণ এবং আধুনিক ভারতে তার বিকাশের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক যুগে সাম্প্রদায়িকতাবাদের উৎস ও সামাজিক ভূমিকা নির্ণয়, তার চরিত্র···ও স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা এবং কেন তা দেশভাগ ঘটাতে পারল সেটা নির্ধারণ করা' বিপানচন্দ্রের উদ্দেশ্য। এদেশের মধ্যশ্রেণীগুলির ভীতি, ঈর্ষা আর নৈরাশ্যকে ব্যবহার করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদ নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে কী ভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদকে উৎসাহিত করেছিল, তার অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ পেশ করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা-বাদ 'ভারতের ঐতিহাসিক বিকাশের যুক্তিসঙ্গত ও অনিবার্য ফল'—ব্যাপক প্রচারিত এই তত্ত্বটিকে লেখক পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছেন। বর্তমান পর্যালোচনা প্রাক-১৯৪৭ পর্বে সীমাবদ্ধ। যদিও 'আজকের সাম্প্রদায়িকতাবাদ-সমাধানের উপায়'-ও তিনি সন্ধান করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার মতো একটি জটিল বিষয়ের উত্থানে বহু উপাদান কাজ করে থাকে। এই উপাদানগুলোর ক্রমোচ্চতাও নির্ধারণ করতে আগ্রহী তিনি। তাঁর উদ্দেশ্য কেবল সাম্প্রদায়িকতা-বাদ সম্পর্কে গবেষণা এবং বিশ্লেষণ করা নয়, জাতীয় জীবন থেকে তাকে নির্মূল করতে সাহায্য করা। ড. বিপানচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন, সাম্প্র-দায়িক মতাদর্শ এবং রাজনীতি কোন্ কোন্ জটিল প্রক্রিয়ায় ঔপনিবেশিকতাবাদ এবং ঔপনিবেশিক নীতির সঙ্গে জড়িয়ে ছিল, তার বিশ্লেষণ করা ছিল আমার অন্যতম অভিপ্রায়।

সাম্প্রদায়িকতার হিন্দু এবং মুসলিম উভয় অভি-ব্যক্তিরই নির্মোহ বিশ্লেষণ স্ফুরিত হয়েছে বইটির প্রতিটি অধ্যায়ে। শুধুমাত্র মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা-বাদের ওপরই লেখকের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নি। সাম্প্রদায়িকতাবাদ আর বিচ্ছিন্নতাবাদ সম্পর্কে তাঁর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আর নিপুণ পর্যালোচনা হচ্ছে—সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদের সমীকরণের অর্থ দাঁড়ায় এই যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদ কখনো ছিল না, বা হতে পারে না, কারণ হিন্দুরা ধর্মীয় সংখ্যাগুরু হিসেবে "বিচ্ছিন্নতাবাদী" হতে পারে না। তা হলে বলতে হয় যে, কেবল মুসলিমদেরই সাম্প্রদায়িক হওয়ার প্রবণতা ছিল, এবং হিন্দুরা যেহেতু বিচ্ছিন্নতাবাদী ছিল না, তাই তারা সর্বদাই জাতীয়তাবাদী ছিল, ···। ১৯৪৭-এর আগে এবং পরে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা চিরকাল একথাই

আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ—বিপান চন্দ্র। অনুবাদ: কুণাল চট্টোপাধ্যায়। কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি, সত্তর টাকা।

বলে এসেছে। ভারত-ইতিহাসের এই জটিল বিষয়টি সম্পর্কে বিপানচন্দ্রের সন্ধানী আলোকপাত উদার-বাদীদের চমকিত করবে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা নড়ে-চড়ে বসবেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদের ওপর ভারতে ও বিদেশে সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু গবেষণা হয়েছে। ব্যাপক-সংখ্যক লেখকের চিন্তা ও বিশ্লেষণাত্মক অন্তর্দৃষ্টি বিপানচন্দ্রের গবেষণাকর্মটিকে প্রভাবিত করেছে। লেখক পরিষ্কার উচ্চারণ করছেন যে, বহুক্ষেত্রে তিনি সেগুলিকে আত্মসাৎ করেছেন। আদতে গ্রন্থটি সংশ্লেষণধর্মী।

'সাম্প্রদায়িকতাবাদ কী'? বিপানচন্দ্রের ভাষ্য: 'সাম্প্রদায়িকতাবাদ হল এমন এক বিশ্বাস, যে একদল মানুষ একটি বিশেষ ধর্মে বিশ্বাস করলে তাঁদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ সব একই হয়।...যা অনুযায়ী ভারতে হিন্দু, মুসলিম, ক্রিশ্চান ও শিখরা বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, যারা স্বাধীনভাবে এবং স্বতন্ত্রভাবে বিন্যস্ত এবং সংহত।' সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মতে, ভারতীয়দের মধ্যে ধর্মীয় প্রভেদ হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বা মৌলিক প্রভেদ বা ফাটল বা নির্দেশচিহ্ন। এই অধ্যায়টিতে দেখানো হয়েছে যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এমন কোনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করেন নি যা তাঁদের সহধর্মীদের সমস্যা সমাধানের সহায়ক হয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থান ঘটেছিল আধুনিক রাজনীতির উত্থানের ফলে। বিগত এক শতাব্দী ধরে মধ্যশ্রেণীগুলিকে এবং বুদ্ধিজীবীদের স্থায়িভাবে ঘিরে ছিল একটি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি, যা রাজনীতিতে, পত্রপত্রিকায়, সাহিত্যে, এবং বিশেষ করে শিক্ষা-ব্যবস্থায় সর্বব্যাপী হয়েছিল। ভারতীয় সমাজের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ও গোষ্ঠীর মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশ হওয়ার একটি কারণ ছিল, তারা যথাযথভাবে নতুন জাতীয় চেতনা, ভাষাগত সাংস্কৃতিক সংহতি এবং শ্রেণীপরিচিতির বিকাশ ঘটাতে পারে নি। (পঞ্চম অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদ-এ এই বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে)। বিপানচন্দ্র বিশ্বাস করেন যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল বিগত ১৫০ বছরের ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ভ্রান্ত চেতনা, কারণ বিষয়গত-ভাবে হিন্দু আর মুসলমানদের স্বার্থের মধ্যে কোনো বাস্তব সংঘাতের অস্তিত্ব ছিল না। তাঁর মতের সমর্থনে জওহরলাল নেহরু আর হুমায়ুন কবিরের সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করেছেন: 'একথা যেন কখনো বিস্মরণ না হয় যে ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদ একটি আধুনিক ঘটনা যা আমাদের চোখের সামনে গড়ে উঠেছে।' (নেহরু, সিলেক্টেড ওয়ার্কস, ৭ম খণ্ড, পৃ ৬৯)। 'কথা শোনা যাচ্ছে, "সাম্প্রদায়িকতাবাদের জোয়ারের"। আমি মনে করি কথাটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য নয়। বস্তুত, সাম্প্রদায়িক প্রভেদ ভারতীয় রাজনীতিতে একটি দুষ্টক্ষত হিসেবে আছে কেবল আধুনিক যুগের গোড়া থেকে।' (কবির, মুসলিম পলিটিকস, পৃ ৮৬)। বিপানচন্দ্র বলছেন, ধর্মীয় প্রভেদ থেকে সাম্প্রদায়িকতা-বাদ ঘটে নি, বরং সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং মতাদর্শগত প্রয়োগ ধর্মীয় প্রভেদকে সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদে রূপান্তরিত করেছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদ, জনগণের সার্বভৌমত্বভিত্তিক আধুনিক রাজনীতিকে ধর্মীয় অভিজ্ঞানের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করতে সেদিনও চেয়েছিল, আজও সেই প্রশ্নে ক্রিয়াশীল রয়েছে।

'মূলতঃ, সাম্প্রদায়িকতাবাদ ঔপনিবেশিকতা-বাদের..., ধনবাদ কর্তৃক অর্থনীতি ও সমাজের বিকাশ ঘটাবার অক্ষমতার অন্যতম উপজাত ফল।'

ঔপনিবেশিক অধঃবিকাশ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রতিযোগিতার জন্ম দিয়েছিল। চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের অধিকতর হারকে 'হিন্দু অর্থনৈতিক আধিপত্য' এবং মুসলমানদের বৃহত্তর অংশকে 'হিন্দু অবস্থানের' প্রতি 'মুসলিম হুমকি' হিসেবে ভাবার প্রবণতাকে তীব্রতর করেছিল। বস্তুত, এই বোধ গোটা পেটিবুর্জোয়া শ্রেণীকে গ্রাস করে। লেখকের স্থির প্রত্যয়—'একদিক থেকে সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন

ছিল সর্বাগ্রে পেটিবুর্জোয়া প্রশ্ন'। স্বভাবতই সাম্প্রদায়িক সংঘাত যে প্রধানত ঘটেছিল সরকারি চাকরি, শিক্ষাগত ছাড় এবং সেগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে দিত যে আইনসভা ও পৌর প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক স্থান তা দখল করার জন্য, সেটা আকস্মিক নয়। মুসলিম ধনিকরা 'হিন্দু একচেটিয়া ধনিক গোষ্ঠীর অধীন হওয়া বা অর্থনৈতিক অবদমন রুখতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ' ছিল (ডব্লু. সি. স্মিথ. মডার্ন ইসলাম ইন ইনডিয়া, পৃ ২১১-২১২)—এই মত বিপানচন্দ্র সমর্থন করেন না।

সাম্প্রদায়িকভাবে চিন্তা আর কাজ করার মধ্য-শ্রেণীর যে প্রবণতা, তার বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতৃত্ব দৃঢ় সংগ্রাম চালাবার সাহস পেতেন না। হিন্দু এবং মুসলিম উভয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরুদ্ধে যুগপৎ ও বলিষ্ঠ সংগ্রাম পরিচালনা করার অর্থ হত প্রাথমিকভাবে সমর্থন হারানো, এমনকী নির্বাচনী বনবাসযাত্রা। ১৯৩৬ পর্যন্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব উভয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের তোষণনীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিপানচন্দ্র নেহরুর একটি মূল্যায়নের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, 'আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমান পরিস্থিতিতে, এবং যতদিন মধ্যশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিরা আমাদের নীতির উপর আধিপত্য রাখে, ততদিন আমরা সাম্প্রদায়িকতা-বাদকে পূর্ণরূপে বাতিল করতে পারব না।' (নির্বাচিত রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, পৃ ১৮৯)। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, মধ্যশ্রেণী সাম্প্রদায়িকতাবাদের মূল সামাজিক ভিত্তি রচনা করলেও সাম্প্রদায়িকতাবাদকে একটি 'মধ্যশ্রেণীর আন্দোলন'রূপে দেখা ভুল হবে। (চতুর্থ ও অষ্টম অধ্যায়ে এর বিশদ বিশ্লেষণ রয়েছে)।

জনগণ ও নিম্নশ্রেণীগুলির স্তরে সাম্প্রদায়িকতা-বাদ অনেক সময়ে শোষক ও শোষিতের মধ্যে সামাজিক টানাপোড়েন ও শ্রেণীসংঘর্ষকে বিকৃত করে বা ভ্রান্ত ব্যাখ্যা করে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে পরিণত করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণ-অসন্তোষ দেখা দিত অর্থনৈতিক উপাদানের দরুন। কিন্তু পশ্চাৎপদ সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার ফলে তা এক বিকৃত প্রকাশ খুঁজে পেত সাম্প্রদায়িক উত্তেজনায়। শ্রেণীগত নিপীড়নকে সাম্প্রদায়িক নিপীড়নরূপে চিহ্নিত করা হত। এই বক্তব্যের সমর্থনে বিপানচন্দ্র, সি. জি. শাহের একটি সিদ্ধান্তের সাহায্য নিয়েছেন —'সাম্প্রদায়িক প্রচারের চাপে জনগণ তাঁদের শোষণ, নিপীড়ন ও যন্ত্রণার প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে ব্যর্থ হন এবং সেগুলির উৎস সম্পর্কে এক কাল্পনিক উৎসের চিন্তা করেন।' এই সামাজিক সংঘর্ষের ওপর সাম্প্রদায়িক রূপ আরোপ করেন রাজকর্মচারীরা, সাংবাদিকরা, রাজনীতিবিদ্‌রা এবং সর্বোপরি ইতিহাসবিদ্‌রা। লেখক পেশ করেছেন জুতসই উদাহরণ। বহু লেখক ১৯২১-এ মালাবারের মোপলা কৃষি-অভ্যুত্থানকে হিন্দুবিরোধী হিসেবে দেখেন, কিন্তু ১৮৭০-এর দাক্ষিণাত্যের দাঙ্গাকে মহাজনবিরোধী মনে করেন, মাড়ওয়ারি-বিরোধী নয়। একই ভাবে সৎনামী, জাট, শিখ বা মারাঠা দলপতিদের মুঘল-বিরোধী সংগ্রামকে মুসলিমবিরোধী মনে করা হয়। কিন্তু অন্য মারাঠা শাসকদের পেশওয়া-বিরোধী সংগ্রামকে ব্রাহ্মণ-বিরোধী বলে মনে করা হয় না।

"সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতিক্রিয়াশীলতা"-শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়টিতে দেখানো হয়েছে যে সাম্প্রদায়িকতা-বাদ জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিক্রিয়াশীল তথা পশ্চাদভিমুখী শক্তিদের প্রতিনিধিত্ব করত, এবং সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক দল আর ব্যক্তিরা রাজ-নৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ঘটনায় প্রতিক্রিয়াশীল অবস্থান গ্রহণ করত। এখানে এটিও বিশ্লেষিত হয়েছে যে, স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খান এবং রাজা শিবপ্রসাদ ১৮৮০-র দশকে জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধিতা করার চেষ্টা করেছিলেন জাতি (race), জন্ম, সামাজিক মর্যাদা এবং জাত বিচারের মাধ্যমে। এই প্রয়াস ব্যর্থ হওয়ার পর সাম্প্রদায়িকতা-বাদের প্রশস্ততর মতাদর্শ ব্যবহার করা হয়েছিল।

এই অধ্যায়ের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হচ্ছে : 'গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সাম্প্রদায়িক যুক্তি ছিল যে তা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের দিকে যাবে, কার্যত যার অর্থ হবে সংখ্যালঘুর উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ "সম্প্রদায়ের" আধিপত্য। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা এই যুক্তি উত্থাপন করত সর্বভারতীয় স্তরে, চিরকালীন সংখ্যালঘু স্তরে থাকা মুসলিমদের উপর হিন্দুদের কার্যকর ক্ষমতা এবং স্থায়ী আধিপত্য রোধ করার নামে। আর হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রায় হুবহু একই কথা বলত সেইসব প্রদেশে, যেখানে মুসলিমরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।' এই বোধ থেকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা "সহানুভূতিবিহীন সংখ্যাগরিষ্ঠের দয়ায়" বেঁচে থাকার কল্পনায় বিচলিত হয়ে পড়েন। পানজাবে হিন্দুসভা গঠনের মাধ্যমে মুসলিমবিরোধী রাজনীতির ব্যাপক প্রচার হতে থাকে ১৯০৯ থেকে।

বিপানচন্দ্র পরিষ্কার বলেছেন—১৮৮০-র দশক থেকে পানজাবে এক তেজিয়ান গোরক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের যাত্রা শুরু হয়। এই আন্দোলন পরে যুক্তপ্রদেশে ও বিহারে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনটি পুরোপুরি মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। মজার কথা, ব্রিটিশ ফৌজি ছাউনিগুলোতে ব্যাপকভাবে গোহত্যা করার স্বাধীনতা থেকে যায়।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের অন্যতম প্রধান তাত্ত্বিক, ১৯০৯-এ পানজাব হিন্দুসভার প্রতিষ্ঠাতা রাইবাহাদুর লালচাঁদ কংগ্রেসকে প্রকাশ্যে আক্রমণ করে কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন, যেগুলি পরে গ্রন্থিত হয়েছে, "সেলফ অ্যাবনেগেশন ইন পলিটিক্স" পুস্তিকায়। তিনি কংগ্রেসকে হিন্দুদের 'স্ব-আরোপিত দুর্ভাগ্য' এবং 'নিছক হিন্দু স্বার্থের জন্য দুর্বলতার এক উৎস' বলে বর্ণনা করেন। পত্র-পত্রিকাগুলো 'খাঁটি হিন্দু দায়িত্ব' পালন করছে না বলে অভিযোগ তোলেন। তাঁর ধারণা ছিল, কংগ্রেস 'মুসলিম-তোষণ' নীতি গ্রহণ করেছে। 'ঐক্যের যূপকাষ্ঠে' হিন্দু স্বার্থকে বলি দেবার জন্য তিনি কংগ্রেসকে দায়ী করেন এবং এই দলটির ধ্বংস কামনা করেন। লালচাঁদ আরও বিশ্বাস করতেন যে, গোড়া থেকেই হিন্দুরা যদি স্বতন্ত্রভাবে এবং স্বাধীনভাবে তাদের নিজেদের স্বার্থকে সাহায্য করত এবং তাদের বিশেষ শ্রেণীগত সুবিধা দাবি করত তবে ফল হত ভিন্নতর। হিন্দুমহাসভার সভাপতি এন. সি. কেলকার (১৯৩২) এবং ভাই পরমানন্দ (১৯৩৩) আর মহাসভার বিশিষ্ট নেতা বি. এস. মুঞ্জে একই মনোভাব পোষণ করতেন। ১৯৩৭-এর পর হিন্দু মহাসভায় বিনায়ক দামোদর সাভারকারের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ প্রবলতম সাম্প্রদায়িক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। ১৯৩৮-এ হিন্দু মহাসভার সভাপতির ভাষণে সাভারকার মন্তব্য করেন, কংগ্রেস কর্মীরা পদে-পদে হিন্দু স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে কিন্তু মুসলিম লীগের কাছে একপায়ে খাড়া হয়ে থাকে। হিন্দু মহাসভার নেতৃবর্গ মনে করতেন যে, ব্রিটিশ সরকারের বিরোধিতা করে সরকারি শুভদৃষ্টি হারানো হিন্দুদের অনুচিত হবে। সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তলার সারি আরো খোলাখুলিভাবে রাজানুগত্য প্রকাশ করে। যেমন, লাহোরের হিন্দু যুবলীগ ১৯৩৩-এর মে মাসে বলে, 'আমরা মনে করি, এখন সময় যত না মুসলিম ও হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যের তার বেশি ব্রিটিশদের ও ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যের।'

আর. এস. এস.-এর রাজনীতি মুসলিম লীগের চেয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের তাঁবে কম ছিল না। ১৯৩৯-এ এম. এস. গোলওয়ালকার কংগ্রেস নেতৃবর্গকে 'বিশ্বাসঘাতক' জাতীয়তার ধ্বংসকারী, নীচ, স্বার্থপর এবং 'আমাদের সর্বনাশের', কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী ভি. ডি. সাভারকার এবং গোলওয়ালকার এমনভাবে ভারতীয় হিন্দু জাতির সংজ্ঞা দিলেন যাতে মুসলিমরা চিরকাল তার পরিধির বাইরে থাকে। মুসলিমদের দেখা হল

ভারতীয় সামাজিক আর রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এক চিরকালীন বৈরী ও বিজাতীয় অংশ রূপে যারা 'বিদেশী' হিসেবে হয় হিন্দুদের কাছে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করবে, অথবা মুসলমান ধর্ম (ইসলাম) ত্যাগ করবে নয়তো বহিষ্কৃত হবে। বিপানচন্দ্র 'হিন্দু রাষ্ট্রদর্শন', 'হিন্দুত্ব', 'উই', 'বানচ অব থটস' থেকে বিস্তর উদ্ধৃতি দিয়েছেন মূল আলোচনার মধ্যে এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের টীকা-অংশে।

মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও এই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। এই শতাব্দীর শুরু থেকেই তাঁরা সম্প্রদায়গতভাবে সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেন। ঔপনিবেশিক শাসনের সমর্থক ছিলেন তাঁরাও। ১৯০৭ সালে 'মুসলিমদের দাসের স্তরে নেমে যাওয়ার এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরতন্ত্রের সম্ভাবনা···এবং সংখ্যালঘুরা তাদের প'রিচিতি হারানোর বিপদ' (মইন শাকির, 'খিলাফৎ টু পার্টিশান', পৃ ১৯৫) প্রসঙ্গে ভিকার-উল-মুলক আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২৬ সালে বাঙলাদেশের "মোসলেম দর্পন" সতর্ক করে দিয়েছিল যে সরকারি সাহায্য না থাকলে ২৩ কোটি হিন্দু '৭ কোটি মুসলিমকে সম্পূর্ণ ভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেবে।' (এম. এন. ইসলাম, বেঙ্গল মুসলিম ওপিনিয়ন অ্যান্ড রিফ্লেকটেড ইন দ্য বেঙ্গল প্রেস ১৯১০-১৯৩০, পৃ ১২৭)। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ১৯৩৭-র পর এম. এ. জিন্না লীগকে জনপ্রিয় করার জন্য তাঁর রাজনৈতিক প্রচারাভিযান গড়ে তোলেন। ১৯৪৭-তক জিন্না পৌনঃপুনিকভাবে এই বক্তব্যটি তুলে ধরেন যে, কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এই দেশের অন্য সব সম্প্রদায় ও সংস্কৃতিকে গুঁড়িয়ে দিতে এবং হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ১৯৪১-এ জিন্না ঘোষণা করেন যে যুক্ত ভারতবর্ষে 'মুসলিমদের অস্তিত্ব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।' ক্রমেই তিনি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এগিয়ে যান।

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও বিপন্ন অস্তিত্বের প্রসঙ্গটি জোরেশোরে তুলেছিলেন। ১৯০৯ সালে লেফটেন্যানট কর্নেল ইউ এন. মুখার্জী একটি বই প্রকাশ করেন, যার ইঙ্গিতপূর্ণ নাম "একটি মৃত্যুপথযাত্রী জাতি" (A Dying Race) প্রয়োগ করা হয়েছিল হিন্দুদের প্রতি। বলেছিলেন, "ওরা (মুসলিমরা) তাকিয়ে আছে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম জগতের জন্য—আমরা অপেক্ষা করছি আমাদের বিলুপ্তির জন্য।' লালা লাজপত রাই পর্যন্ত আশঙ্কা করেন যে, মুসলিমরা হিন্দুদের 'খেয়ে ফেলবে আর হজম করবে'। ১৯৩৭-এ ভি. ডি. সাভারকার বলেন যে, মুসলিমরা 'হিন্দুদের নিজ বাসভূমিতে ভূমিদাসের পর্যায়ে নামিয়ে দিতে চায়।' (দেখুন ১৩৮-১৪৬ পৃ, প্রচুর তথ্যের সাহায্যে অসাধারণ বিশ্লেষণ রয়েছে। বিপানচন্দ্র সদর্থে সেকুলার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন। টীকা অংশে রয়েছে আগ্রহ-উদ্দীপক উদ্ধৃতি, পৃ ১৫৯-১৬৫)। সোজাসুজি বলতে কী, 'জিন্না যে দরজার মধ্য দিয়ে তাঁর লক্ষ্যে পৌঁচেছিলেন, তা ঠেলে খুলে দিয়েছিলেন অন্যরা।'

বিপানচন্দ্র তাঁর বিশ্লেষণে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, জাতীয় চেতনার ব্যর্থতা, হতাশা, ভীতি এবং সংখ্যালঘু মানসিকতা, ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের কাজে আর চিন্তায় হিন্দুত্বের সংশ্লেষ, সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা, নৈতিক শূন্যতা এবং সামাজিক বাধা সাম্প্রদায়িকতাবাদের উত্থানে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল। এক সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতিক্রিয়ায় আরেক সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রসার ঘটেছিল। অতিমাত্রায় ধর্মভাব এবং ধর্মীয় উপাদানকে ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করতে দেওয়ার ফলে জনগণকে সাম্প্রদায়িকতাবাদের ধর্মের নামে আবেগপূর্ণ আবেদনের ফাঁদে পা দেওয়ার অবস্থায় এনে দিয়েছিল। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের পথ নির্দেশ করেছেন তিনি। তাঁর মতে, আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারের মারফত এই বিপর্যয় রোধ করা সম্ভব হত।

সংখ্যালঘুদের সন্ত্রস্ত মানসিকতার বিষয়টি নিয়ে

অধ্যাপক বিপানচন্দ্র সবিশেষ আলোচনা করেছেন। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ক্রমান্বয়ে মুসলিমদের স্বাভাবিক সংখ্যালঘুত্বজনিত ভীতির মানসিকতা নিয়ে কাজ করত। তাদের আশঙ্কা ছিল সংখ্যাগত দুর্বলতার অবস্থানের ফলে তাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বার্থহানি হতে পারে। স্বভাবতই তারা বিশেষ রক্ষাকবচ ও সুযোগসুবিধার জন্য লড়াই করেছিল। এই বিষয় নিয়েও তারা ভাবিত ছিল যে, অখণ্ড স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারতে তাদের রক্ষাকবচগুলো সংরক্ষিত হবে—এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। লেখক বলেছেন যে, এখানেই ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের বিশেষ দায়িত্ব। তাদের কথায় আর কাজে প্রমাণ করা উচিত ছিল যে সংখ্যালঘিষ্ঠের এই ভয় আর সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতি তাদের অবিশ্বাস ভিত্তিহীন। কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধারাবাহিকভাবে বিপরীত ভূমিকা পালন করেছিল। সংখ্যালঘুদের ভয় কমানোর বদলে তারা হিন্দুদের মধ্যে মুসলিম ভীতি ও তাঁদের প্রতি ঘৃণার মানসিকতা তৈরি করেছিল। তারা হিন্দুদের দুর্বলতা ও তার ফলে মুসলিমদের হাতে অধীনতা, ধর্মান্তরকরণ ও চূর্ণ হওয়ার বিপদের তত্ত্ব প্রচার করেছিল। জাতিগঠনের প্রক্রিয়ায় সংখ্যালঘুদের সক্রিয় অংশীদার হতে উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে তারা হিন্দুত্ব, সংখ্যালঘুদের হিন্দুকরণ এবং ভারতে হিন্দুজাতি হওয়ার তত্ত্বগুলো প্রচার করেছিল। ফলত, মুসলিম সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ শক্তি অর্জন করেছিল।

"ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের কাজে ও চিন্তায় হিন্দুত্বের সংশ্লেষ"-সম্পর্কিত আলোচনাংশে বিপানচন্দ্র বৈজ্ঞানিক ইতিহাস দৃষ্টির পরিচয় রেখেছেন। জাতীয় নেতৃত্বে 'হিন্দুধর্মের গোঁড়া পুনরভ্যুত্থানবাদী ধারা'র প্রভাব মুসলমানদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। স্বভাবতই মুসলিমরা সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী মূল আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঝোঁক দেখাতেন। বহু চরমপন্থী, জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনকে অভিন্ন বলে দেখতেন। তাঁরা জাতীয়তাবাদকে দেখতেন একটি ধর্মরূপে—যে ধর্ম অনিবার্যভাবে হিন্দুধর্ম। যেমন অরবিন্দ ঘোষ ১৯০৮-এ লিখেছিলেন: 'জাতীয়তাবাদ একটি ধর্ম, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে……আপনাদের মনে রাখতে হবে যে আপনারা ঈশ্বরের হাতিয়ার।' অনুরূপভাবে, বিপিনচন্দ্র পাল ১৯১০-এ বলেছিলেন: 'ভারতের নতুন জাতীয়তাবাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুদের প্রাচীন বেদান্তবাদ।' বঙ্কিমচন্দ্র এবং তিলক এই পর্যালোচনায় উপস্থিত রয়েছেন। ১৯১১ এবং ১৯১২ সালে মহম্মদ আলি 'কমরেড' পত্রিকায় এই বিষয়টি নিয়ে মুসলিম মনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন।

গান্ধীর রাজনৈতিক চিন্তা ধর্মীয় ভাষায় গঠিত ছিল। স্বাধীনতাকে রামরাজ্য হিসেবে ব্যাখ্যা করা হল—গান্ধীর ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহারের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। 'রাজনীতিকে আত্মিকতাপূর্ণ করা' এবং 'অন্তরীণ কণ্ঠ'—এইসব ধারণাও হিন্দু ধর্মীয় ঐতিহ্যে সিক্ত ছিল। সন্দেহাতীত যে, জাতীয়তাবাদে ধর্মীয় চেতনার অনুপ্রবেশ সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধির সহায়ক ছিল।

ভারতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা সাম্প্রদায়িকতাবাদের বৃদ্ধিকে সাহায্য করেছিল। বিপানচন্দ্র খোলাখুলি বলছেন যে, ব্যাপক-সংখ্যক শিক্ষিত ভারতীয়ের-ও সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিগত মান নীচু ছিল। ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার ঔপনিবেশিক চরিত্র স্বাধীন চিন্তার বিকাশকে রুদ্ধ করেছিল। কায়েমি স্বার্থ এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়েছিল। চিরাচরিত নৈতিক মূল্যবোধের ক্ষয় ও ভাঙন এক নৈতিক শূন্যতা ও শিকড়বিহীন অবস্থার সৃষ্টি করার ফলে 'নগ্ন আত্ম-স্বার্থ' বড়ো হয়ে ওঠে। সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের দিকে হিন্দুদের গতি পরকে আপন করে নি। সাধারণ একজন হিন্দু মুসলিমের হাত থেকে খাদ্য বা জল গ্রহণ করত না, এমনকী তাদের ছোঁয়া কিছুই স্পর্শ করত না। রেলের প্লাটফর্মে ছিল 'হিন্দু পানি' এবং 'মুসলিম পানি'-র চিৎকার। এইসব

সামাজিক ছুৎমার্গ ও স্বাতন্ত্র্যবোধ মানসিক বিচ্ছেদের কারণ হয়ে উঠেছিল। লেখক বলছেন যে, গণরাজনীতির সঙ্গে-সঙ্গে এদেশে একটি সাংস্কৃতিক বিপ্লব জরুরি ছিল। যার ভিত্তি হত সামাজিকভাবে র‍্যাডিকাল গণমতাদর্শ। কেবল রাজনৈতিক র‍্যাডিকালবাদ যথেষ্ট ছিল না।

বিকৃত ইতিহাসচর্চা কিভাবে সাম্প্রদায়িকতাবাদের উজ্জীবনে অশেষ এবং সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর ভূমিকা পালন করেছিল তার বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে "ইতিহাসের ব্যবহার" শীর্ষক অধ্যায়টিতে। গ্রন্থকার লিখেছেন, 'বস্তুত, এ কথা অত্যুক্তি হবে না যদি বলা হয় যে ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ভারতীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রধান মতাদর্শ, এবং তা না হলে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের খুব কম অবশিষ্ট থাকবে। একথা বিশেষভাবে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্য সত্য।'

বিপান চন্দ্রের আলোচ্য গ্রন্থটির (ইংরেজি সংস্করণ) ওপর ভিত্তি করেই লিখিত "ইতিহাসচর্চা ও সাম্প্রদায়িকতা" নামক একটি আলোচনা "চতুরঙ্গ" (মার্চ, ১৯৮৮) পত্রিকার পাঠকসজ্জনের সামনে পেশ করা হয়েছিল, ফলত এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হল না। বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য তিনটি উদ্ধৃতিই খুব সম্ভব যথেষ্ট হবে।

'যেদিন মুহম্মদ গজনী সিন্ধুনদ পার হয়েছিলেন …সেই দিন জীবনমরণের সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। …শেষ হয়েছিল—বলা যায় কি, আবদালীর সঙ্গে? …দিনের পর দিন, দশকের পর দশক, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই বীভৎস সংঘাত চলতে থাকে…। শত যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করা হচ্ছিল।' (ভি. ডি. সাভারকারের উক্তি আলোচ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে, দেখুন—পৃ ২২২ এবং ২৪০ পৃষ্ঠার ১২, ২০ এবং ৩৬৫ পৃষ্ঠার ২৮নং টীকা)। ১৯৪৭-র পর দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষাজগতের স্তরে ব্যক্ত হয়। ভারত যে "কমপোজিট কালচার"-এর দেশ—সেই ধারণাকে উপেক্ষা করে রমেশচন্দ্র মজুমদার লেখেন যে, মধ্যযুগের ভারত 'স্থায়িভাবে দুটি শক্তিশালী একককে বিভক্ত ছিল যাদের প্রত্যেকের ছিল নিজের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব, ফলে যাদের মিলন বা এমনকী স্থায়ী নিবিড় সমন্বয় সাধ্য ছিল না।' বিকৃত ইতিহাসচর্চার নজির হিসেবে ভি. ডি. সাভারকারের আর-একটি বক্তব্য উদ্ধৃত হল: 'অবশেষে জন্মগ্রহণ করেন শিবাজী, হিন্দু জয়োল্লাসের ঘণ্টা বেজে ওঠে, মুসলিম আধিপত্যের দিন অস্ত যায়।' পরিষ্কার বলতে কী, সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা 'প্রাচীন হিন্দু ভারত'-এর যশোগানে মুখর হয়ে ওঠে। এর ফলে যে খেসারত দিতে হয়েছে তা ছিল কল্পনারও অতীত।

আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের তিনটি প্রধান রূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন অধ্যাপক বিপান চন্দ্র। ১. সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ, ২. উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং ৩. উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ বা ফ্যাসিস্ট সাম্প্রদায়িকতাবাদ। লক্ষ করার বিষয় এই যে, লেখক সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদকে সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে চিহ্নিত না করে জাতীয়তাবাদের বিচ্যুতি বা দুর্বলতা বলেছেন। উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল মূলত সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী এবং তার অনুশীলনকারী। উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ ছিল যৌক্তিকতাবর্জিত, ভয় এবং ঘৃণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। স্মর্তব্য যে, ১৯৩৭-এর পর থেকে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদ উত্তরোত্তর গণভিত্তি অর্জন করে।

ব্রিটিশ নীতির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক মন্তব্য করেছেন যে, আধুনিক ভারতে সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিকাশের জন্য ব্রিটিশ শাসনের এক বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। তাঁর মতে ভারতে ব্রিটিশ শাসকরা কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রতি ভালোবাসা থেকে সেই 'সম্প্রদায়' বা সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সমর্থন করেন নি। 'ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল'-এই নীতির লক্ষ্য ছিল ভারতীয় জনগণের মধ্যে রাজনীতির বিকাশকে খর্ব করা, তাদের সমন্বয়

ও ঐক্যকে খর্ব করা, ভারতীয় জাতিগঠনের প্রক্রিয়াকে বিশৃঙ্খল করা। প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক হিংসাকে বরদাস্ত করার ব্যাপারে ব্রিটিশদের অনীহা ছিল। দেশের শাসক হিসেবে আইন শৃঙ্খলা ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করার বিষয়টিতে তারা গুরুত্ব দিত। ১৯৩৭-এর পর ব্রিটিশরা সুষম থেকে অনিয়ন্ত্রিত সাম্প্রদায়িকতাবাদের দিকে চলে যায়। বল্গাহীন সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্প্রদায়িক হিংসা তখনো আইন শৃঙ্খলার সমস্যা সৃষ্টি করতে পারত কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের অস্তিত্বই যখন বিপন্ন, তখন তা গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছিল। এই নীতির ফলেই ১৯৪৬-৪৭-এ সাম্প্রদায়িকতাবাদ ভয়ংকর রূপ নিতে পেরেছিল।

সাম্প্রতিক কালের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের সূত্র সন্ধান করেছেন বিপানচন্দ্র। সাম্প্রদায়িকতার মত একটি সামাজিক সমস্যার তাৎক্ষণিক সমাধান হয় না। তাঁর বিশ্বাস, ভারতীয় রাষ্ট্রের এবং বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের ধর্মনিরপেক্ষতার গুণগত মানে অনেক দুর্বলতা থেকে গেছে। উপরন্তু সাম্প্রদায়িকতা রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে গভীরভাবে ঢুকে পড়েছে। অনেক সরকারি পদস্থ কর্মচারী ও নেতাদের প্রকাশ্যে বা গোপনে সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে আপোস করতে দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরাও এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখেন না; অনেক সময় বৌদ্ধিক কাপুরুষতায় ভোগেন। হাল আমলে লক্ষিত হচ্ছে যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদের বর্বর রূপ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে আটকানো যাচ্ছে না। মার্কসবাদী অবস্থান থেকে বিপান চন্দ্রের এই প্রত্যয় জন্মেছে যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদকে সফলভাবে বিরোধিতা করার জন্য তার বিকাশের অনুকূল সামাজিক অবস্থাকে উচ্ছেদ করা দরকার, অর্থাৎ সমাজব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তার সামাজিক শিকড়গুলিকে উৎপাটন করা দরকার। যেহেতু ধনবাদ আর জাতীয় ঐক্যের অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে না, এই ঐক্য বজায় রাখা যায় কেবল সমাজবাদী পরিবর্তন ঘটানোর জন্য লড়াই করা এবং তা সাধন করার মাধ্যমে। সাম্প্রদায়িকতাবাদ থেকে বেরোবার পথ মানে সর্বস্তরে জনগণকে নিঃসাম্প্রদায়িকীকরণ করা। ইতিহাসের পাঠ্য বইয়ের প্রভাব নিরূপণ করার, ধর্মীয়তা, অযৌক্তিকতা, 'সাম্প্রদায়িক' জাতীয়তাবাদ ছড়ানো থেকে ফিল্ম, রেডিও ও টেলিভিশনকে বিরত রাখার, ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তার বহু অংশের গভীরে ঢুকে-যাওয়া হিন্দুত্বের সংশ্লেষ মুছে ফেলার, ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য সৃষ্টি করার এবং সাধারণভাবে বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে হবে। উপন্যাস, কবিতা, গল্প, জনপ্রিয় পত্রপত্রিকা এবং শিশুদের পত্রিকা, গল্পের বই এবং কমিকেও সাম্প্রদায়িকতাবাদের সাহিত্যিক ও চিত্রানুগ প্রকাশ ঘটে। ওইসব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়া দরকার। রাষ্ট্রীয় নীতির ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক জীবনে তার অনুপস্থিতি ব্যাপক অসঙ্গতির সৃষ্টি করেছে। সার্বিক জাতীয় চেতনার বিকাশ এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। বিপানচন্দ্র অসাধারণ একটি মূল্যায়ন করেছেন সমতাভিত্তিক, সামাজিক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, জাতীয় স্তরে ঐক্যবদ্ধ এবং অর্থনৈতিকভাবে বিকাশমান সমাজ অর্থাৎ একটি সমাজবাদী সমাজে বিশেষত সংখ্যালঘুরা পূর্ণ মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিয়ে নির্ভয়ে বাঁচতে পারে। আবিদ হুসেন বলেছেন যে এমন একটি পরিস্থিতিতেই মুসলিমরা 'সন্দেহের উপত্যকা' থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। (এস. আবিদ হুসেন, 'দ্য ডেফিনি অভ ইনডিয়ান মুসলিমস"- পৃ ৬। উদ্‌ধৃত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থের ৩৪৬ পৃষ্ঠায়, টীকা নং ৩)। রাষ্ট্রযন্ত্রে সাম্প্রদায়িক মতাদর্শের অনুপ্রবেশকে অবশ্যই থামাতে এবং উচ্ছেদ করতে হবে। পুলিশ, গোয়েন্দা ও প্রশাসনিক যন্ত্রকে সাম্প্রদায়িকতামুক্ত করার বিষয়টি সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। পদস্থ কর্মচারী যারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মদত যোগায় তাদের শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে হবে, এবং কঠোরভাবে শাস্তি দিতে হবে। এটা করতে ব্যর্থ হওয়া ১৯৪৭-এর পর ভারতীয় রাষ্ট্রের এক প্রধান দুর্বলতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদারপন্থী সাম্প্রদায়িকতাবাদের বিরোধিতা করতে হবে অনিবার্যভাবে মতাদর্শের মাধ্যমে। কিন্তু উগ্র সাম্প্রদায়িকতাদের ক্ষেত্রে বহু সময়ে রাষ্ট্রীয় বলপ্রয়োগ জরুরি। ধর্মনিপেক্ষ প্রশাসন যদি কঠোরভাবে যে-কোনো মূল্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দমনের মানসিকতা পোষণ করত তাহলে সাম্প্রদায়িক হিংস্রতার বিপদটাই কমে যেত।

আলোচ্য গ্রন্থে বিপান চন্দ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদের উজ্জীবনের ক্ষেত্রে বস্তুগত স্বার্থের ওপরই ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের সম্ভাবনা অবশ্যই রয়ে গেছে। তর্ক-প্ররোচক বলেই বইটির গুরুত্বও বেড়েছে। বৃহদায়তন এই গ্রন্থটিতে বিপুল তথ্যের হদিশ পাওয়া গেছে। টীকা অংশ সচেতন পাঠকদের বিস্ময়ে আপ্লুত করবে। অনুবাদক কুণাল চট্টোপাধ্যায় কঠোর পরিশ্রমের পরিচয় রেখেছেন। বলে রাখা দরকার যে বইটির শরীর থেকে কিছু মেদ ঝরিয়ে দেবার সুযোগ ছিল। অতিকথন বিপানকে কিছু ক্ষেত্রে গ্রাস করেছে, কিন্তু একথাটিও মনে রাখতে হবে যে 'যাঁরা সাম্প্রদায়িকতাবাদ ও অনুরূপ ঘটনাকে বোঝা ও তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রত, তাঁদের কাছে এই বইটি অত্যন্ত মূল্যবান হবে।'

প্রসঙ্গ ভারতবিভাগ

সুরঞ্জন দাস / অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দক্ষিণ এশিয়ায় ঔপনিবেশিকতার বিদায়পর্বের রাজনীতির এক গভীর তথা দৃষ্টিপ্রসারী বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে আলোচ্য গ্রন্থে, যদিচ একান্তই উচ্চবর্গীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে। একটা হুইগ ধারণাকে প্রধানত অপ্রমাণিত করার চেষ্টা করেছেন লেখিকা; সেটি এই: দেশভাগ হল ক্ষমতার সাংবিধানিক বিকেন্দ্রীকরণ-প্রক্রিয়ায় স্বাভাবিক এবং ক্রমিক পরিণতি, যার শুরু একেবারে বিশ শতকের গোড়ায়। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, লেখিকা এই প্রয়াসে দেশভাগ-রাজনীতির ব্যাখ্যাকে বহুশ্রুত বিশ্লেষণের গণ্ডীর বাইরে নিয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর ব্যাখ্যা সীমিত থেকেছে উপর থেকে চালিত রাজনৈতিক আন্দোলনের বিবরণে আর সাংবিধানিক বোঝাপড়া আর বিতর্কের জটিলজটা উন্মোচনে। এর ফল হিসাবে আমরা পেয়েছি ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত উচ্চবর্গীয় রাজনীতির বিতর্কের ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যময় সংযোজন, কিন্তু তা দেশভাগকে কেন্দ্র করে গণমন তথা গণ-অভিলাষের অনুধাবনে কোনো মৌলিক পরিবর্তন সূচিত করে নি।

১৯৩৬ সালকে গ্রন্থকার সূচনাকাল হিসাবে গ্রহণ করেছেন একান্তই যুক্তিসংগতভাবে। এর তাৎক্ষণিক পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান প্রশ্নে প্রথম জাতীয় নির্বাচন এবং ১৯৩৭ সনে উত্তর প্রদেশে কংগ্রেস আর লীগের সংযোগ-বিতর্ক (coalition controversy) প্রতিভাত হয়; মামুলি আলোচনায় 'ভাগ বন্দোবস্ত' (truncate settlement)-এর বল এখান থেকেই প্রকাশ্যে ছোঁড়া হয়েছিল মনে করা হয়। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে তাই ১৯৩৬-এর নির্বাচনের ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে। বর্ধমান হিন্দু-মুসলিম সমস্যায় 'ক্ষমতায় কংগ্রেসে'র তাৎপর্যও প্রসঙ্গত বিশ্লেষিত হয়েছে। ভোটের ফলে 'সর্বভারতীয় শক্তি হিসাবে কংগ্রেসের ক্ষমতা প্রকাশিত হল' (পৃ ১১), তবে কিছু কংগ্রেসকর্মীর মধ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক 'বিদ্বেষ ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার' অংশবিশেষ দেখা দিলেও (পৃ ৪১) ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগ 'রাজনৈতিকভাবে কোনো সুবিধাজনক স্থান খুঁজে পায় নি' (পৃ ৪৩)। সিং লিখেছেন: 'কংগ্রেস থেকে

The Origins of the Partition of India, 1936-1947—A. I Singh. Oxford University Press, Rs. 140.

মুসলমানদের বিচ্ছেদ স্পষ্টতই তাদের ঐক্যবদ্ধ করে নি অথবা ১৯৩৯ সালের মধ্যে তাদের লীগের সমর্থকেও পরিণত করে নি। ১৯৩৭ সাল থেকে নির্বাচকমণ্ডলীর মধ্যে যে রাজনৈতিক বিস্তার (politicisation) ঘটেছে তার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেও লীগের মতো সাম্প্রদায়িক দলগুলির সাফল্য আসে নি' (পৃ ৪৪)।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় ভারতের ভূমিকার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। হিটলারের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্রিটিশ-ভারতের যোগদানের ঘোষণা হয় ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ ভারতের রাজনৈতিক শক্তিগুলির সঙ্গে কোনো পূর্ব পরামর্শ ছাড়াই—যা 'ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন অধ্যায় সূচিত করে' (পৃ ৪৫)। হিটলারের মোকাবিলায় ব্রিটিশের সহযোগিতায় কংগ্রেস রাজি হয় সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতির এই শর্তে যে, যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতার আশু উত্তরাধিকার আসবে; লীগ সহায়তায় রাজি হয় ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতির আশায়। কংগ্রেস চেয়েছিল এক 'স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ ও গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ', কিন্তু লীগের বিচারে এই ধারণা ছিল 'দেশের জনসমূহের স্বাভাবিক প্রকৃতির অনুপযোগী, যে দেশ বহু জাতীয়তার সমন্বয়ে গঠিত এবং জাতীয় রাষ্ট্রের পরিপন্থী' (পৃ ৪৮)। এই অবস্থায় ভাইসরয় লিনলিথগো লীগকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে 'জাতীয় কংগ্রেসে'র ইচ্ছুক 'সমবল' (counterpoise) হিসাবে দেখেছিলেন, যদিচ গ্রন্থকারের সতর্ক বিচারে ভাইসরয় তখনও পর্যন্ত মুসলিম-সংখ্যাগুরু প্রদেশগুলিতে লীগের শাসনের কথা ভাবেন নি।[১] তৎসত্ত্বেও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সমর্থনের প্রেক্ষাপটেই মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে তার লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তানের জন্য সংগ্রামের সংকল্প নেয়। তা ছাড়া, পরস্পরবিরোধী ভাবনা সত্ত্বেও, লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবং প্রাদেশিক নেতারা বেশির ভাগই সমস্যা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে অবহিত ছিলেন। লেখিকা চমৎকার দেখিয়েছেন যে, জিন্না মুসলিম প্রাদেশিক রাজনীতির দলীয় কলহকে তাঁর 'প্রত্যক্ষ প্রভাব' স্থাপনে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'স্পষ্টতই জিন্না প্রাদেশিক নেতৃবর্গের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে সর্বভারতীয় পর্যায়ে জয়ী হয়েছিলেন, আবার প্রাদেশিক পর্যায়ে তাঁদের সন্ত্রস্ত রেখেছিলেন' (পৃ ৭০)।

তৃতীয় অধ্যায়ে ডিসেমবর ১৯৪১ থেকে এপ্রিল ১৯৪৫-এর মধ্যে জাতীয় ও প্রাদেশিক রাজনীতিতে বহু-পরিচিত ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত (currents and cross-currents) আলোচিত হয়েছে। ফলত, ক্রিপস মিশনের প্রভাব, ভারত ছাড়ো আন্দোলন আর তার মুসলিম-বিরোধিতা, আসাম, সিন্ধু, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বাঙলায় মুসলিম লীগ সরকারের গঠন, পানজাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টি ও লীগের 'লড়াই', এবং মৈত্রীসংঘের (confederacy) প্রশ্নে কংগ্রেস আর লীগের বোঝাপড়ার প্রসঙ্গ আসে। এখানে বিশ্লেষণের নতুনত্ব হল ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত লীগের তাৎপর্যপূর্ণ মর্যাদাবৃদ্ধির জন্য শুধুমাত্র ব্রিটিশ নয়, কংগ্রেসকে দায়ী করা হয়েছে। একদিকে ক্রিপস যখন 'মুসলিম-সংখ্যাগুরু' প্রদেশগুলিকে বর্জনের অধিকারের প্রস্তাব দিয়ে পাকিস্তান-চিন্তার রূপ দিচ্ছিলেন, সেই একই সময়ে সিন্ধু আর বাঙলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভাগুলি প্রধানত ব্রিটিশ সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল। আবার, লীগের ক্রমপ্রসারমাণ সর্বভারতীয় গুরুত্বের পিছনে ছিল কংগ্রেস-কর্তৃক পাকিস্তান-নীতির অনুমোদন। ১৯৪৪ সালের মে মাসে গান্ধী জিন্নাকে মীমাংসার যে খসড়ারূপ দিয়েছিলেন তার ভিত্তি ছিল রাজাগোপালাচারীর ব্যবস্থাসূত্র। এতে ছিল: (ক) মুসলিম-সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিতকরণ, (খ) স্বতন্ত্র সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের প্রশ্নে এইসব অঞ্চলে একটি গণভোটের সংগঠন, এবং (গ) এই-সমস্ত ক্ষেত্রের সীমান্ত জেলাগুলির নতুন যে-কোনো রাষ্ট্রে

যোগদানের অধিকার। বস্তুত, রাজাগোপালাচারীর এই মন্তব্য উদ্ধৃত আছে যে 'পাকিস্তান অত্যধিক ভয়ের কিছু নয়' (পৃ ১০৯)। জিন্না এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এই যুক্তিতে যে এতে ভবিষ্যৎ পাকিস্তান থেকে বহু জেলা চলে যাবে; তাঁর মতে, এই ব্যবস্থায় ভারতীয় মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের নিহিত অধিকারেরও স্বীকৃতি মেলে নি। সম্ভবত গান্ধী তাঁর পরিকল্পনার কোনো ইতিবাচক সাড়া জিন্নার কাছ থেকে আশা করেন নি। কিন্তু একটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের সম্ভাবনার স্বীকৃতি দিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব জিন্নার মর্যাদাবৃদ্ধিই সুনিশ্চিত করেছিলেন, যদিচ প্রাদেশিক মুসলিম রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির উপর জিন্নার নিয়ন্ত্রণ তখনও সম্পূর্ণ হতে বাকি ছিল। এতৎসত্ত্বেও, গ্রন্থকারের মতে, 'কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম জনমতের দৃঢ়তা'র ফলে '১৯৪৫-এর এপ্রিলের মধ্যেই সার্বভৌম পাকিস্তানের পক্ষে মুসলিম রাজনৈতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ়তা' সূচিত হয় নি (পৃ ১১৭)।

সিং মনে করেন যে, পাকিস্তান আন্দোলন প্রশ্নে লীগের প্রথম প্রকৃত সাফল্য আসে জুন ১৯৪৫ থেকে মার্চ ১৯৪৬-এর মধ্যে। গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। ১৯৪৬ সালের জুন-জুলাই মাসের সিমলা সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছিল, কেননা 'জিন্না সমগ্র ব্যাপারটা থেকেই বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন···যেহেতু তাঁর ভয় ছিল লীগ কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিলে এমন কাজ করতে হত যার ফলে পাকিস্তান দাবির ক্ষতি হত' (পৃ ১২৫)। ১৯৪৫-৪৬ সালে নির্বাচন লীগ লড়েছিল 'পাকিস্তানের ধর্মীয় আবেদনে'র উপর ভিত্তি করে। ফলে তারা ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত হয় সমগ্র মুসলিম ভোটের শতকরা ৭৬ ভাগ পেয়ে, যদিচ ১৯৩৭ সালে তারা পেয়েছিল মাত্র শতকরা ৪.৮ ভাগ (পৃ ১৩৯)। কেবলমাত্র উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলিম উভয় নির্বাচকমণ্ডলীতেই সফল হয়েছিল। বাঙলা আর সিন্ধুপ্রদেশে লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে। কিন্তু পানজাবে লীগ ক্ষমতায় আসতে পারে নি, কেননা সেখানে কংগ্রেস অকালি ও ইউনিয়নিস্টদের নিয়ে পানজাব সম্মিলিত দল গঠিত হয়। এই প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের প্রতিনিধিত্বকারী দল যে এইভাবে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল তা, সিং-এর মতে, 'ভবিষ্যতের শুভ সূচনা করে নি' (পৃ ১)।

পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু ১৯৪৬ সালের মার্চ-জুলাই মাসের ক্যাবিনেট মিশন। সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির বক্তব্য আর প্রতি-বক্তব্যের সাথে-সাথে আলাপ-আলোচনার প্রকৃত কার্যধারার সম্ভাব্য অতি বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন লেখিকা; দেখাবার চেষ্টা করেছেন সার্বভৌম পাকিস্তান ভাবনার অনুসরণে জিন্নার মানসিক একমুখীনতা; বিরোধিতা করেছেন সেই চিন্তার যা জিন্নাকে মুসলমানদের জন্য সর্বাধিক সাংবিধানিক সুবিধাদি আদায়ের উপায় হিসাবে পাকিস্তানকে ব্যবহার করতে দেখে। ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলার সময়ই লিয়াকত আলি খান এবং ফিরোজ খান নুনের মতো প্রখ্যাত লীগ-নেতারা 'পাকিস্তান অথবা মৃত্যু'র কথা বলেছিলেন: 'যদি হিন্দু রাজের কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আমাদের বসানোর জন্য গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, তাহলে মুসলমানরা যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটাবে তা চেঙ্গিজ খান ও হালাকুকেও লজ্জায় ম্রিয়মাণ করে দেবে' (পৃ ১৫৩)।

লীগের এই কঠোরতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আর. এস. এসের বিধান, 'হিন্দুদের জন্যই হিন্দুস্থান', আর তার সাথে বাঙলা, সিন্ধু, পানজাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার বহমান প্রবাহ। ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও জিন্না ভারতে ভবিষ্যৎ অন্তর্বর্তী সরকার সংক্রান্ত ক্যাবিনেট মিশনের ১৬ মের ঘোষণা প্রাথমিকভাবে মেনে নেন

'এই আশায় যে এর ফলে শেষ পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ, সার্বভৌম পাকিস্তান স্থাপিত হবে' (পৃ ১৬৯)। ২৯ জুলাই ১৯৪৬-এ অবশ্য লীগ ১৬ মের ঘোষণা বাতিল করেন এই অজুহাতে যে, প্রস্তাবিত গণ-পরিষদের আলোচনায় মুসলিম স্বার্থের সংরক্ষণের কোনো নিশ্চয়তা ব্রিটিশ সরকার দিতে পারে নি। জওহরলাল নেহরু যে ১০ জুলাই ১৯৪৬-এর সংবাদ বিবৃতিতে 'প্রদেশগুলিকে দলবিন্যস্ত করার' (grouping of provinces) পরিকল্পনার ব্যর্থতার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, এবং গণপরিষদের চূড়ান্ত সার্বভৌম ক্ষমতার কথা বলেছিলেন, তাই লীগকে পরিকল্পিত অন্তর্বর্তী সরকার ও গণপরিষদ বয়কট-সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গে টেনে আনে—এই বিশ্বাস ভেঙেছেন ড. সিং। আলোচ্য গ্রন্থে নেহরু-বিবৃতিতে কোনো অভিনবত্ব দেখানো হয় নি; সাংবিধানিক আলোচনা চলার সময় এই বিষয়ে নেহরুর সামগ্রিক মতের সহজ পুনরুক্তিমাত্র করা হয়েছে (পৃ ১৭৬)। তা ছাড়া, নেহরুর মন্তব্যের লক্ষ্যবস্তু ছিল লীগের থেকে ব্রিটিশরাই বেশি (ওই)।

ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবের চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান লীগকে পাকিস্তানের লক্ষ্যে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' (Direct Action)-এর অভিমুখে ঠেলে দেয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এর ফল আলোচনা করা হয়েছে। কলকাতা, নোয়াখালি এবং ত্রিপুরার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন লেখিকা। কিন্তু নোয়াখালি আর ত্রিপুরার দাঙ্গাকে 'ভারতে সংঘটিত···ভয়াবহতম ঘটনার একটি' (পৃ ১৯৫) বললে সংশয় হতে পারে, কেননা জীবন আর সম্পত্তিহানি তথা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের তীব্রতার বিচারে কলকাতার বৃহৎ হত্যাকাণ্ডকে অনেক বড়ো ঘটনা বলতে হয়।[২] 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দ্বারা লীগ কী চেয়েছিল তা স্পষ্ট নয়'—লেখিকার এই মন্তব্যে কুশলতার অভাব প্রকট। সিং-এর নিজের গ্রন্থে এবং অন্যান্য রচনায়[৩] এই বিষয়ে যেসব পুস্তিকার উল্লেখ-উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তা স্পষ্টতই লীগের পাকিস্তান-ভাবনা ও তার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনের নির্দেশ-গুলি প্রকাশ করে। কলকাতার মারণলীলায় লীগ-মন্ত্রিসভার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপও লীগের উদ্দেশ্যের স্পষ্ট নিদর্শন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের সন্ধান করেছেন লেখিকা সরকারি সূত্রের উদ্ধৃতিতে, কিছুটা সম্মতিসূচকভাবে। শুধুমাত্র 'ব্রিটিশ দাসত্বে'র বিরুদ্ধে নয়, 'বর্ণহিন্দু আধিপত্যে'র বিরুদ্ধেও জিহাদ কতটা চালিত হয়েছিল, তার বিচারও লেখিকা করতে পারতেন। শেষোক্ত বিষয়টির সমর্থন বিশেষ-ভাবে মেলে কলকাতায় ১৯৪৬ সালের মুসলমান দাঙ্গাকারীদের ধারাবাহিক আচরণে, ইয়োরোপীয় কিংবা সরকারি সম্পত্তির উপর আক্রমণ এড়িয়ে যাওয়ায়।[৪] কংগ্রেসের সম্মতি নিয়ে এবং ভাইসরয়ের প্ররোচনায় লীগ অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় যোগ দিলে এই আশা হয়েছিল যে, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের জোয়ার রুদ্ধ হবে। কিন্তু এই আশা ব্যর্থ হয়ে যায়: সাম্প্রদায়িকতার বিষ সিন্ধু, বিহার ও উত্তরপ্রদেশে ছড়িয়ে প'ড়ে অভূতপূর্ব দাঙ্গার সৃষ্টি করে।

গ্রন্থের বাকি দুটি অধ্যায়ের শিরোনাম—'দেশ-ভাগের প্রস্তাবনা (Prelude to Partition) ও 'বিভাগ ও বিদায়' (Divide and Quit)—এসেছে এই বিষয়ের পূর্বতন রচনাদি থেকে।[৫] সপ্তম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পাকিস্তান প্রশ্নে লীগের আগ্রাসী মনোভাবের কথা, যথা অন্তর্বর্তী সরকারে কার্যকর যোগদানে লীগের বিতৃষ্ণা, পানজাবে ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রিসভার সংবৃত সাম্প্রদায়িকতার উৎপাটনে নির্বিচার শক্তিপ্রয়োগ, ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার চূড়ান্ত প্রত্যাখ্যান ও গণপরিষদে যোগদানের অস্বীকৃতি। সিং-এর বিশ্লেষণের অভিনবত্ব হল: ব্রিটিশের দ্বৈত ভূমিকার সুদক্ষতার উন্মোচন: একাধারে লীগ আর কংগ্রেসের মধ্যে আপোস-মীমাংসাকারী, অন্যদিকে "পশ্চাদ্ভাগ নতকারী···লীগকে সুবিধাদি প্রদানকারী ও তার হিংস্র উত্তেজক আহ্বান উপেক্ষাকারী' (পৃ ২০৩)। ফলত, নভেমবর ১৯৪৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭ পর্যন্ত আলোচনার সময় জিন্না 'সম্ভবত জানতেন তিনি কোথায় চলেছেন' (পৃ ২০৩)।

'ভাগ বন্দোবস্তে'র পূর্ববর্তী চূড়ান্ত ঘটনাবলীর সারাৎসার উপস্থাপন করেছেন লেখিকা শেষ অধ্যায়ে, নিখুঁত কালানুক্রমিক বিন্যাসে। ১৯৪৭ সালের ২ মার্চ খিজির মন্ত্রিসভার পতন ছিল লীগের পক্ষে 'বিজয়-দিবস', কেননা এটা 'ছিল কেন্দ্রে লীগের রাজনৈতিক শক্তির কাছে বহু-সাম্প্রদায়িক প্রাদেশিকতার এক বৃহত্তম দুর্গের আত্মসমর্পণের প্রতীকস্বরূপ' (পৃ ২১৭)। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা নির্দ্বিধায় প্রত্যাখান করে জিন্না এখন ব্রিটিশের কাছে গর্বিত ঘোষণা করতে পারলেন: 'এখনই অস্ত্রোপচার শুরু করো; ভারত ও তার সেনাবাহিনীকে দৃঢ়ভাবে দ্বিখণ্ডিত করো এবং মুসলিম লীগের প্রাপ্য অর্ধাংশ আমাকে দাও' (পৃ ২২৭)। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা যা সিং বলেছেন তা হল, ১৯৪০-এর দশকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় প্রশাসনিক বিপর্যয়ের কথা। সামরিক সাহায্য ছাড়া সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মোকাবিলায় বেসামরিক কর্তৃপক্ষ ছিল ব্যর্থ: একদিকে এই উপ-মহাদেশ পরিত্যাগের জন্য তরুণ ইংরাজ সিভিলিয়ান-দের প্রকাশ্য ইচ্ছা আর অন্যদিকে ভারতীয় অফিসার-দের সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের ক্রমবর্ধমান প্রকাশ, সিং-এর ভাষায়, নতুন পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রশাসনের অনুপযুক্ততা আর অবিশ্বাস্যতাই প্রদর্শন করে। ১৯৪৭-এর মার্চে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দমনে ২০,০০০ সৈন্য নামানো হয়েছিল এবং 'দেশভাগ ঠেকাতে হলে' (পৃ ২২৪) সরকারি হিসাব অনুযায়ী পরের মাসেই প্রয়োজন ছিল আরো ৬০,০০০ সৈন্যের। সিং-এর মতে, এই ধরনের সম্পদসমাবেশের ব্যর্থতার স্বীকৃতিতে রাজ ছিল কুণ্ঠাহীন। বস্তুত, ব্রিটিশ অফিসাররা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেই এত 'অনিশ্চিত' হয়ে পড়ে-ছিলেন যে, সাহায্যের আহ্বান এলে তাঁরা সাধারণকে তাদের সম্ভাব্য 'শাসক'—কংগ্রেস কিংবা লীগ-এর কাছে যেতে বলতেন। রাজের এই প্রশাসনিক দুর্বলতার সাথে মিশন পরিকল্পনা অনুযায়ী গণপরিষদে যোগদানের ক্ষেত্রে জিন্নার দৃঢ় অস্বীকৃতি যুক্ত হলে, ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে, মাউনটব্যাটেন দেশভাগের অনিবার্যতা বুঝতে পারেন। সরকারি তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে সিং লিখেছেন, একথা মনে করার কারণ আছে যে, ব্রিটিশের কৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের প্রয়োজন ছিল। তবে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে 'নতুন কাঠামোয় পুরানো খেলা'র সম্ভাবনা রয়েই গিয়েছিল, যেহেতু ব্রিটিশ ছত্রছায়ায় ভারত পাকিস্তানের মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের সরকারি প্রয়াস চলছিল (পৃ ২৩৪)।

গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখিকা জানিয়েছিলেন যে, 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও ভারত-বিভাগ সম্পর্কে পূর্বতন বহু রচনা থেকে' তাঁর আলোচনা ভিন্ন হবে। এই প্রতিশ্রুতি অবশ্য অপূর্ণ থেকে গিয়েছে। এর প্রধান কারণ হল, লেখিকা নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তিনি 'বৃটিশ, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের কৌশলগত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায়' (পৃ VII) তাঁর পর্যালোচনা সীমিত রেখেছেন। দেশভাগের উৎস সম্পর্কে সিং-এর বিশ্লেষণ-কাঠামোর প্রধান উপাদানহল: সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্রের ধ্বনির উপর ভিত্তি করে লীগের উত্থান ও তার সাথে মুসলিম প্রাদেশিক সমর্থনের কার্যকর সংযোগ; লীগের সাম্প্রদায়িক সমর্থনের 'দৃঢ়তা'র জন্য ব্রিটিশ ও কংগ্রেসের কৌশলগত অবদান এবং রাজের শাসনক্ষমতার দ্রুত অবনতির প্রসঙ্গ। লেখিকা সঠিক প্রশ্নই তুলেছেন: চল্লিশের দশকের অদম্য সাম্প্রদায়িক গণ-উত্তেজনার কারণ কী, এবং কেন তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল? কিন্তু সঠিক উত্তর তিনি পেলেন না উচ্চবর্গীয় রাজনীতি ও কূটনীতির মধ্যে তাঁর যুক্তি প্রবাহ আচ্ছন্ন রইল বলে। এই বিশ্লেষণের মূলে থাকছে খল-নায়ক জিন্নার নানা বোঝাপড়া: প্রাদেশিক মুসলিম রাজনৈতিক শক্তিগুলির সঙ্গে, কংগ্রেস ও

ব্রিটিশের সঙ্গেও। সিং-এর একটি ইতি-মন্তব্যকে নেওয়া যাক :

> 'জিন্না সার্বভৌম পাকিস্তান লাভ করেছিলেন অংশত এই কারণে যে কোথায় চলেছেন তিনি জানতেন; ব্রিটিশ ও কংগ্রেসের জগাখিচুড়ি কৌশলের সঙ্গে তাঁর মিশ্র নীতির কোনো তুলনাই হয় না। সেখানে ছিল অদম্যতা, দ্বান্দ্বিক দক্ষতা, সার্বভৌম পাকিস্তান ছাড়া কোনো কিছুতেই তাঁর সুনিপুণ, একরোখা অস্বীকৃতি। যাই হোক, তাঁর স্তাবক কিংবা সমালোচকদের নানা দৃষ্টি-কোণ থেকে যে-সমস্ত বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়ে থাকে, সেই আত্মস্তরিতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আদর্শবাদ ও নীতির এক অদ্ভুত সমন্বয় হয়েছিল তাঁর চরিত্রে। সে কারণে যে ঐক্যবদ্ধ, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষে তাঁকে গান্ধী ও নেহরুর তুলনায় সম্ভাব্য দ্বিতীয়শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকতে হবে, তা মেনে নেওয়া ছিল তাঁর পক্ষে কষ্টকর। ...সর্বদা সার্বভৌম পাকিস্তানের আহ্বানের গুরুত্বকে তুচ্ছ করে ব্রিটিশ কিংবা কংগ্রেস প্রতিরোধ কিংবা মোকাবিলার কোনো কৌশলই অবলম্বন করেনি। ১৮৮৭ সালের লর্ড ডাফরিনের সতর্কবাণী 'ভাগ ও শাসনে'র ব্রিটিশ প্রচেষ্টা হয়ে সত্যিই ফিরে এল ১৯৪৭-এ' (পৃ ২৫১-২)।

জিন্নার ব্যক্তিগত রাজনীতির মধ্য দিয়ে লীগের প্রগতি চিত্রণের প্রচেষ্টাই লেখিকার অর্থহীন শব্দজালের সৃষ্টি করে। যেমন, ১৯৩৯ সালে জিন্নার কংগ্রেস-বিরোধিতাকে 'নেতিবাচক ও খানিকটা গঠনমূলক মনোভাবের পরিপন্থী' (পৃ ৪৩) বলা হয়েছে, যদিচ লাহোরে ১৯৪০ সালে জিন্নার উক্তিতে সার্বভৌম পাকিস্তানের ইতিবাচক সমর্থন রয়েছে (পৃ ৫৭)।

এই দৃষ্টিকোণের আংশিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে লেখিকার এই বিশ্বাসের মধ্যে যে জিন্নার সার্বভৌম পাকিস্তানের আহ্বান কখনই 'উদীয়মান মুসলিম জাতীয়তার নীচুতলা থেকে উৎসারিত হয় নি' (পৃ ২৪১)। কিন্তু, প্রসঙ্গান্তরে মুশিরুল হাসান যেমন লিখেছেন, 'ব্যক্তির খামখেয়ালের ফলে জাতির জন্ম হয় না।'[৬] ভারতে মুসলিম রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার বিবর্তনে নীচুতলার গণচেতনার চাপ ছিল না বলাটা অনৈতিহাসিক হবে। বাঙলার মতো প্রদেশগুলিতে জনপ্রিয়তার গণ্ডিতে একটি অনন্য মুসলিম সত্তার বিকাশ,[৭] ১৯২০-এর দশক থেকে প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার অধিকতর ব্যবহার এবং সংগঠিত রাজনৈতিক জগতে তার প্রভাব,[৮] একদিকে লীগ রাজনীতিতে উলেমাদের বর্ধমান ভূমিকা—অন্যদিকে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী গোষ্ঠীগুলির ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠা[৯] : এই সমস্তই নিশ্চয় এক গণ-মানসিকতার সৃষ্টি করে, এবং ১৯৪০-এর দশকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির এক চূড়ান্ত বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। এই গ্রন্থ থেকে আমরা জনগণতান্ত্রিক কোনো আন্দোলন হিসাবে পাকিস্তান রাজনীতির গড়ে ওঠার অনুভব পাই না। এই আন্দোলনে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে নানা-লক্ষ্যাভিসারী বহুবিধ সামাজিক গোষ্ঠী যুক্ত থাকতে পারত। দেশভাগ আলোচনাতত্ত্বের (Discourse) সেই মামুলি সীমা আমাদের অতিক্রম করতে হবে যা পাকিস্তান চিন্তাকে নেহাত দরকষাকষির পাল্লায় জিন্নার সচেতন প্রয়াস-মাত্র বিবেচনা করে। সকলেই জানেন যে, জিন্না নিজেকে দ্বিজাতিতত্ত্বের প্রবক্তাদের দলভুক্ত করেন, এবং এইভাবে মুসলিম বিচ্ছিন্নতার বল গড়াতে শুরু করলে তাঁর কিংবা তাঁর দলের পক্ষে আর পিছু হটা সম্ভব ছিল না। এই দৃষ্টিকোণ অনুসরণ করা হলে দেশভাগ রাজনীতির তাত্ত্বিক ধারাগুলির গভীরতা, বিচ্ছিন্নতার রাজনীতির সামাজিক ভিত্তি এবং নানা প্রতীক ও ধর্মবিধি প্রয়োগের মাধ্যমে গণ-আন্দোলন-এর কৌশলসমূহের অনুসন্ধান প্রয়োজন। এইসব সমস্যাবলীকে বর্তমান গ্রন্থের আলোচনার সীমার বাইরে রাখা হয়েছে। মুসলমানমাত্রই যে জিন্নার পাশে এসে দাঁড়ায় নি এবং হিন্দু হওয়ার অর্থই যে কংগ্রেসকে সমর্থন ছিল না—সেদিকেও দৃষ্টিপাত করা হয় নি। গ্রন্থকারও এই ধরনের জটিলতার কোনো ব্যাখ্যা দেন নি। দুঃখের বিষয় যে, নীচুতলা থেকে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যস্থাপনের প্রথম প্রকৃত কংগ্রেস প্রচেষ্টার—মুসলিম জন-সংযোগ আন্দোলনের—ব্যর্থতার ব্যাখ্যা করেছেন লেখিকা 'অভিযানের উদাসীন প্রকৃতি' (পৃ ৪০) দিয়ে; কেন আন্দোলন প্রয়োজনীয় গতি লাভ করল না তার কোনো ব্যাখ্যা সেখানে নেই। কংগ্রেস ও হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী শক্তিগুলির ক্রমপ্রসারমান সংযোগই কি ছিল এর কারণ? কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যেও এমন কোনো নিবারক শক্তি ছিল কি যা আন্দোলনের বিরুদ্ধে কাজ করেছিল? নাকি আন্দোলনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে ব্রিটিশ অফিসারদের ভূমিকা ছিল? ১৯৩৫-এর আইন অনুযায়ী গঠিত কংগ্রেস মন্ত্রিসভা-গুলির কথিত হিন্দু চরিত্র সম্পর্কেও ড. সিং স্থিরনিশ্চয় নন। পরিবর্তে তাঁর রচনায় অস্পষ্টতা এসেছে, বিশেষত যেখানে তিনি পরস্পরবিরোধী সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যথা 'মুসলমানদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস সরকারগুলির বিদ্বেষের অভাব' এবং কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যেই 'সাম্প্রদায়িক উপাদান-গুলি'র অস্তিত্ব (পৃ ৪০)।

এইসব অপূর্ণতার ফলে এই গ্রন্থের আলোচনা সাংবিধানিক তথ্যাদি এবং সংগঠিত ক্ষেত্রের নেতৃবর্গের গতিবিধির বিশ্লেষণ-মোড়কেই ঢাকা থেকেছে। তৎসত্ত্বেও বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে এই গ্রন্থটি আরেকটি বিতর্কিত ও বিশদ যুক্তি-সমন্বিত রচনার[১০] সুস্থ বিরোধিতা করে। এই দ্বিতীয় গ্রন্থটিও অবশ্য প্রাথমিকভাবে সাংবিধানিক তথ্যাদি ও উপরি-চালিত আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত, যদিচ শেষ পর্যন্ত এই বিপরীত উপসংহারে স্থিত হয় যে, জিন্না নয়, কংগ্রেসই দেশভাগের জন্য দায়ী।

সূত্রনির্দেশ

১। সিং দেখিয়েছেন লিনলিথগোর কাছে লীগের পানজাব শাসনের সম্ভাবনা ছিল অবাস্থিত, কেননা এর ফলে ওই প্রদেশে যুদ্ধপ্রচেষ্টার সফল সংগঠন 'বিপর্যস্ত হবে'। লেখিকার মন্তব্য : 'সর্বভারতীয় ও প্রাদেশিক ক্ষেত্রে এই-ভাবে ভাইসরয় নিজেই লীগের প্রতি বিভিন্ন নীতি অনুসরণ করেছিলেন' (পৃ ৭০)॥ ২। সুরঞ্জন দাস, Communal Riots in Bengal 1905—1907 (অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় ডি. ফিল, ১৯৮৭) দ্রষ্টব্য॥ ৩। ওই॥ ৪। ওই॥ ৫। ডি. পেজ, *Prelude to Partition* : the Indian Muslims and the Imperial 1920—1932 (দিল্লী ১৯৮২); পিনডেরেল মুন, *Divide and Quit* (লনডন, ১৯৬১)॥ ৬। এম. হাসান কর্তৃক এ. জালালের *The Sole Spokesman : Jinnah, the Muslim League and the Demand for Pakistan* (কেম্‌ব্রিজ, ১৯৮৫)-এর গ্রন্থসমালোচনা—Indian Economic and Social History Review, এপ্রিল-জুন ১৯৮৮॥ ৭। আর. আহমেদ, *The Bengal Muslims 1871—1906 ; A Quest for Identity* (দিল্লী ১৯৮১)॥ ৮। নেহরু রিপোর্টের ব্যর্থতার মধ্যে বিশেষত এক ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের সুবর্ণ সুযোগেরই ব্যর্থতা প্রতিফলিত হয়েছিল—এম. হাসান, *Nationalism and Communal Politics in India 1916—1928* (নয়াদিল্লী ১৯৭৯) দ্রষ্টব্য। বাংলাদেশের জন্য সুরঞ্জন দাস, Communal Riots, পূর্বোল্লিখিত, দ্রষ্টব্য। উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেসের হিন্দু চরিত্র দেখিয়েছেন সি. মিত্র, *Political Mobilization and the Behar 1937—42* (অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় ডি. ফিল, ১৯৮৩)॥ ৯। বাঙলার মতো প্রদেশগুলিতে উলেমাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে সি. সরকারের *Bengali Muslim Politics, Society and Culture During the Khilafat Movement* প্রবন্ধে, দ্রষ্টব্য Bengal Past and Present, জানুয়ারি-ডিসেম্বর ১৯৮৪। হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী রাজনীতির বিস্তৃত বিশ্লেষণ এখনও হয় নি, তবে একটি উত্তম বিবরণ পাওয়া যাবে বি. গ্রাহামের *The Congress and Hindu Nationalism* প্রবন্ধে, যেজন্য ডি. এ. লো সম্পাদিত The Indian National Congress : Centenary Highlights (দিল্লী ১৯৮৮) দ্রষ্টব্য॥ ১০। এ. জালাল, The Sole Spokesman, পূর্বোল্লিখিত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সিং আদৌ জালালের গ্রন্থের উল্লেখ করেন নি॥

বঙ্গবিভাগ : দায়ী কে ?

কামাল হোসেন

হাতে-গোনা যে কয়েকজন ব্যতিক্রমী বুদ্ধিজীবীর ব্যক্তিত্ব আর শক্ত মেরুদণ্ডর ওপর আমরা ভরসা করতে পারি, তাঁদের মধ্যে অন্যতম অবশ্যই বদরুদ্দীন উমর। তাঁর সব ধরনের বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত না হতে পারি, তবু তাঁর কণ্ঠস্বরের ঋজুতা, সততা এবং অনুসন্ধিৎসাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে উপায় নেই। তাই উমর যখন বঙ্গবিভাগের তৎকালীন প্রেক্ষাপটের সমস্ত বৈপরীত্য এবং বাস্তবের নিষ্ঠুরতাকে নিরাসক্ত-ভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন, আমরা অবশ্যই অনেকখানি উৎসাহ বোধ করি।

১৯৬৬-এ তাঁর "সাম্প্রদায়িকতা" নামক গ্রন্থে প্রথম এ বিষয়ে সংক্ষিপ্তভাবে তিনি আলোচনা করেন। সেই একই বক্তব্য আরো বেশি তথ্যের মাধ্যমে আলোচ্য বইটিতে তিনি উপস্থিত করেছেন। বাঙালি হিন্দু-মুসলমান মানসে সাম্প্রদায়িকতার কালবীজ ধাপে-ধাপে কিভাবে মহীরুহতে পরিণত হল, ইতিহাস-সমাজবিজ্ঞান-অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোয় তা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন উমর।

গত শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে ভারতের অর্থ-নীতি, প্রশাসন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রধানত তিন ধরনের দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করতে শুরু করে। ১. ভারতবর্ষের উপকূলীয় অঞ্চল বাঙলাদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর নবগঠিত ধনী ও বণিকশ্রেণীর সঙ্গে প্রাক-ইংরেজ আমলের উত্তর-ভারতীয় ভূস্বামী ও বণিকশ্রেণীর স্বার্থের দ্বন্দ্ব। ২. ইংরেজি শিক্ষায় অধিকতর শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের তুলনায় পশ্চাৎ-পদ মুসলিম সম্প্রদায়ের চাকরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব। ৩. ইংরেজ শাসনের এবং তার সঙ্গে সম্পর্কিত তাদের বিভিন্ন ধরনের মিত্রদের সঙ্গে কৃষক, কারিগর ও বিভিন্ন পেশাদার দরিদ্র জনগণের শ্রেণী-গত দ্বন্দ্ব।

বস্তুত, এই তৃতীয় দ্বন্দ্বটিই পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ১৮৫৭-এর ব্রিটিশবিরোধী সিপাহি যুদ্ধ পর্যন্ত সবথেকে তীব্র হতে থাকে। ১৮৬০-এর দশক থেকে আসামে চা-শিল্প এবং বোম্বাই অঞ্চলে বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং বিকাশের সঙ্গে-সঙ্গে ভারতে আধুনিক শ্রমিকশ্রেণীর জন্ম হয়। একই সঙ্গে শ্রমিকদের সঙ্গে শিল্প-মালিক শ্রেণীর ও ইংরেজ শাসনের দ্বন্দ্ব আর সংগ্রামও শুরু হয়। এবং একই সময়ে আমরা লক্ষ করি, মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণার মাধ্যমে ভারত-বর্ষের প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর থেকে নবগঠিত হিন্দু ও মুসলমান মধ্যশ্রেণীর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আর প্রতিযোগিতা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তার প্রতিফলন ঘটতে শুরু করে।

এ উপমহাদেশের রাজনীতিতে রাজা-বাদশাদের যুগ অতিক্রম করে মধ্যশ্রেণীর নেতৃত্বে আধুনিক রাজ-নীতির সূত্রপাত ঘটল ১৮৫৫-এ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

ওদিকে একটি পরাধীন দেশের স্বাধীনতালাভের আন্দোলনকে সুসংহত পরিকল্পনার মাধ্যমে সাম্প্র-দায়িক রাজনীতির চরিত্রগ্রহণে শাসক ইংরেজরা যে বেশ ভালোভাবেই সফল হয়েছিল, আজ আর সে বিষয়ে কারোর কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত, সে সময় সাম্প্রদায়িক দল গঠনের বাস্তব পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য নানা ধরনের উদ্যোগও তারা একের পর এক গ্রহণ করতে শুরু করে। এসব উদ্যোগের মধ্যে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ছিল : ১৯০৫-এ বাঙলাদেশকে বিভক্ত করে পশ্চিম বাঙলা, বিহার আর উড়িষ্যা নিয়ে এক-দিকে, এবং পূর্ব বাঙলা আর আসামকে নিয়ে অন্য দিকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দুটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন।

বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি—বদরুদ্দীন উমর। চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা-৭৩। চোদ্দ টাকা।

সে সময় বঙ্গবিভাগকে কেন্দ্র করে সারা বাঙলা-দেশে, এমনকী বাঙলাদেশের বাইরেও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রসার ঘটে। ১৯০৬-এ প্রতিষ্ঠিত হল 'সারা ভারত মুসলিম লীগ' ও 'সারা ভারত হিন্দু মহাসভা' নামে মুসলমান ও হিন্দু উচ্চ- ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন দুটি সাম্প্রদায়িক দল।

এদেশে ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক পর্ব থেকেই চাকরিগত, ব্যবসাগত ও সাধারণভাবে সম্পত্তিগত দিক দিয়ে হিন্দুরা ছিলেন মুসলমানদের থেকে অনেক এগিয়ে। সিপাহি যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত নবগঠিত হিন্দু-সম্প্রদায়ভুক্ত সম্পদশালী ব্যক্তিরা ইংরেজ শাসনের সঙ্গে যে ধরনের সহযোগিতা করেছিলেন, মুসলমান উচ্চবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে সহযোগিতা করেন নি। সদ্য বাদশাহি হারিয়ে যাওয়ার দুঃখে হিন্দুদের তুলনায় ইংরেজি শিক্ষাগ্রহণে মুসলমানদের মনোভাব বিরূপ ছিল। ফলে উনিশ শতকের শুরুতে ইতিহাসের সেই ক্রান্তিকালে ইংরেজি শিক্ষায় পিছিয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বৈষয়িক ক্ষেত্রেও এত বেশি তাঁরা পিছিয়ে পড়লেন, যাতে দেখা গেল, হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে অগ্রসর হওয়া তাদের পক্ষে হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক কঠিন ব্যাপার।

সিপাহি যুদ্ধের পর থেকে অর্থাৎ উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতারা ব্রিটিশ ভারতীয় প্রশাসনের সঙ্গে সহযোগিতার নীতিকে নিজেদের সাম্প্রদায়গত স্বার্থের পক্ষে সহায়ক মনে করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতাদের এই মনোভাবকে সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে ইংরেজরা ব্যবহার করতে সচেষ্ট হল। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে নিজেদের শাসন-ক্ষমতাকে দৃঢ়ভাবে বজায় রাখা ছিল তখন বিদেশী শাসকদের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাঙালি হিন্দু মধ্যশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতাকে খর্ব করে এবং তার রাজনীতিকে ব্রিটিশ-বিরোধিতা থেকে যথাসম্ভব মুসলমান-বিরোধিতার দিকে ঠেলে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে তাঁরা বঙ্গবিভাগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন, সেকথা গোপন করার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি লর্ড কার্জন বা ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার।

তবু আজকে এটা ভাবলেও ভালো লাগে, ইংরেজ সরকারের এত বিভেদপন্থী চেষ্টা সত্ত্বেও সেদিনের সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদে শুধু হিন্দুরাই নয়, পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার মুসলমানদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন।

আমরা জানি, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী এই আন্দোলনের সময় থেকে বাঙলায় বিদেশী-শাসন-বিরোধী সন্ত্রাস-বাদী আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। একই সঙ্গে দেখা গেল, সে সময় হিন্দু ধর্মীয় পুনরুজ্জীবনবাদ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের ওপর তার যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। এ কারণে, এ ধরনের আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদান খুব অসুবিধাজনক হয়। আবার কিছু-কিছু সন্ত্রাসবাদী দলে কালীমূর্তির সামনে শপথ গ্রহণের নিয়ম থাকায় সেসব দলের মধ্যে কোনো মুসলমানের প্রবেশাধিকার ছিল না।

শেষ পর্যন্ত ১৯১১-য় বঙ্গভঙ্গ রদ হলেও এই কয় বছরের বিভেদ আর বিচ্ছিন্নতার সাম্প্রদায়িক রাজনীতি খুব দৃঢ়ভাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে হিসেবে বলা যায়, ইংরেজদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খুব ভালোভাবেই সিদ্ধ হয়েছিল।

১৯২০-২২-এ সারা ভারতে একসঙ্গে শুরু হল দুটি আন্দোলন : খেলাফত ও অসহযোগ। দুটি ক্ষেত্রেই ভারতীয় জনগণের কোনো মৌলিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাই প্রাধান্যে ছিল না। গান্ধীজী ও খেলাফত নেতারা যৌথভাবে আন্দোলন করলেও ধর্মীয় প্রশ্নকেই তাঁরা সামনে নিয়ে আসেন। ফলে, অল্প দিনের মধ্যেই এ দুটি আন্দোলনে ভাটা পড়লে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আবার যথেষ্ট প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে।

এখন ভাবলে অবাক লাগে, সে সময় জিন্না ছিলেন

খেলাফত আন্দোলনের এবং সেই সঙ্গে গান্ধীজী-কর্তৃক রাজনীতিতে ধর্মীয় প্রশ্ন আমদানির প্রবল বিরোধী। এই বিরোধিতার কারণে এ সময়ে মূল রাজনৈতিক স্রোতোধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে জিন্না 'ইনডিপেনডেন্ট পার্টি' নামে একটি আলাদা দল গঠন করেন।

১৯২২-এ মনটেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার অনুযায়ী কাউন্সিলে যোগদানের প্রশ্নে কংগ্রেসের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ সৃষ্টি হয়। গান্ধীজীর সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় ১৯২৩-এর ১ জানুয়ারি চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহরু, বোম্বাইয়ের ভিঠলভাই প্যাটেল, এন. সি. কেলকার প্রমুখ কংগ্রেসের মধ্যেই গঠন করেন 'স্বরাজ্য পার্টি' নামে একটি পৃথক গোষ্ঠী।

এই স্বরাজ্য পার্টির নেতা হিসেবে ১৯২৫-এ চিত্তরঞ্জন দাশ 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চুক্তিতে উপনীত হন। মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশবিরোধী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামকে শক্তিশালী করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই চুক্তি অনুযায়ী, চাকরির ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ মুসলমানদের নানারকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার কথা তিনি ঘোষণা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, এই চুক্তির ঘোষণা সে সময়ে কংগ্রেসে অবস্থিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পানজাবের লালা লাজপত রায় এ বিষয়ে এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেন। তিনি এ সময় বেশ কিছু সংবাদপত্রে প্রবন্ধের মাধ্যমে পানজাবকে এবং সেই সঙ্গে ভারতকে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করার পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। (দ্র. *The Crisis of Indian Unity* 1917-1940, by R J. Moore, Clarendon Press, Oxford, 1974; pp. 17-18)।

বলা বাহুল্য, ১৯২৫-এই চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যুর পর 'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর মৃত্যু ঘটে। হিন্দু-মুসলমান সংহতির একটি বড়ো প্রয়াস এভাবেই শেষ হয়ে গেল।

১৯৪৬-এর অকটোবর মাসে কেন্দ্রীয় অন্তর্বর্তী সরকার থেকে বাদ গেলেন শরৎচন্দ্র বসু।

বলা যায়, বাঙলা, বাঙালির ইতিহাস ও কলোনিয়ান রাজত্বের শেষ পর্বের সাম্প্রদায়িকতা-কেন্দ্রিক রাজনীতিতে তারপর এল এক নতুন সন্ধিলগ্ন। শরৎচন্দ্র বসু আর আবুল হাশিম—এই দুটি মানুষ সে সময় প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন, এ উপমহাদেশের রাজনীতিতে বাঙালিকে তার স্বাতন্ত্র্য আর মর্যাদা এনে দিতে। বদরুদ্দীন উমরের এ বই প্রকৃতপক্ষে সেই রুদ্ধশ্বাস সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আলোছায়ায় দুটি সত্যিকারের মহান বাঙালির অক্লান্ত প্রয়াসের ইতিবৃত্ত। এই দুই মহাকাব্যিক চরিত্রের ট্র্যাজিক পরিণতি আমাদের নতুন করে ভাবায়: কেন এই হিন্দু-মুসলমান পারস্পরিক ঘৃণা আর বিদ্বেষ? দেশ-ভাগের জন্য কোন্ পক্ষ সত্যিকারের দায়ী? এবং ইতিহাসের ধ্বংসস্তূপ থেকে কি বাস্তবিকই আমরা কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছি?

নবপর্যায়ে বাঙলা বিভাগের প্রথম দাবি জানিয়েছিলেন ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১৯৪৭-এর ২২ ফেব্রুয়ারি বাঙলার গভর্নর স্যার ফেডারিক বারোজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে শ্যামাপ্রসাদ সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন: 'সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্ত করা হলে বাঙলাকেও সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করতে হবে। এবং বাঙলার হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করে তাকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তরভুক্ত করতে হবে।' (দ্র. Amrita Bazar Patrika, 24. 2. 1947)। কী আশ্চর্য, সে সময়ের কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনীও শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্যকে সমর্থন করে সংবাদপত্রে বিবৃতির মাধ্যমে বাঙলাকে বিভক্ত করার দাবি জানালেন।

এ সময়ে সমগ্র উত্তর ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করতে থাকে। এসব দাঙ্গা-সৃষ্টির পেছনে ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার আর তার এজেনটদের সুপরিকল্পিত উৎসাহ প্রদান

ও অস্ত্র সরবরাহের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

মনে রাখা দরকার, ইতিহাসের সেই বিচিত্র লগ্নকালে সমগ্র ভারতে কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনে, এমনকী ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহের নানা লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। জনগণের এই সংগ্রাম বিপথে চালনা করার উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ সরকার ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৪৭-এর ৮ মার্চ দিল্লিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি বৈঠক হয়। পানজাবের দাঙ্গা-পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত পানজাবকে মুসলিম- এবং অমুসলিম-প্রধান অঞ্চলে দুটি পৃথক প্রদেশ হিসেবে বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে সে বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগের পক্ষে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ওই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে শরৎচন্দ্র বসু সংবাদপত্রে যে ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখলেন, আজকের ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে তার প্রাসঙ্গিকতা অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়।

১৯৪৭-এর ১৫ এপ্রিল তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সম্মেলন। সে সম্মেলনে বাঙলাদেশে হিন্দুদের জন্য একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের পক্ষে সব ধরনের প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা ও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়। (দ্র. Amrita Bazar Patrika, 16. 4. 1947)।

এদিকে ৮ এপ্রিলের "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে দেখা যাচ্ছে, তৎকালীন বাঙলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করে মত প্রকাশ করছেন।

২৬ এপ্রিল দিল্লিতে ভাইসরয় লর্ড মাউনটব্যাটেন-এর সঙ্গে দেখা করে বাঙলাকে অবিভক্ত রাখার বিষয়ে আলোচনা করলেন সুরাবর্দি। তিনি ভাইসরয়কে বুঝিয়ে বলেন—কিছু সময় পেলে একদিকে হিন্দু-দেরকে এবং অন্যদিকে জিন্নাকে তিনি বোঝাতে সক্ষম হবেন যে, অবিভক্ত বাঙলাই সকলের স্বার্থের পক্ষে সবথেকে উপযোগী। সে দিনই জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় মাউনটব্যাটেন সুরাবর্দির বক্তব্য শুনিয়ে তাঁর মতামত জানতে চেয়েছিলেন। তখন জিন্না তাকে বলেছিলেন যে, কলকাতাকে বাদ দিয়ে বাঙলার কী মূল্য থাকতে পারে। কাজেই সে অবস্থায় বাঙলা স্বাধীন এবং অবিভক্ত থাকলে পাকিস্তানের সঙ্গে তার সম্পর্ক ভালো থাকবে বলেই তিনি আশা করেন। (দ্র. Sarat Chandra Bose: Commemoration Volume, p 77 এবং কামরুদ্দিন আহমদ: "বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ", ২য় খণ্ড, পৃ ৮৩)।

২৭ এপ্রিল দিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে স্বাধীন, সার্বভৌম এবং অবিভক্ত বাঙলার দাবির ব্যাখ্যা করতে একটি দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ লিখিত বিবৃতি প্রদান করেন সুরাবর্দি। বঙ্গবিভাগের বিরোধিতা করে তিনি বললেন: 'যেসব হিন্দু বিশেষ রূপে চিন্তা না করিয়া বঙ্গবিভাগের দাবি করিতেছেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের আবেদন, তাঁরা যেন এই অশেষ ক্ষতিকর আন্দোলন বন্ধ করিয়া দেন। আমরা সকলে একত্রিত হইয়া আপস-আলোচনার দ্বারা নিশ্চয়ই সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য একটি গভর্নমেনট গঠন করিতে পারিব এবং তাহার দ্বারা বাঙলার অতীত গৌরব ও ঐশ্বর্য ফিরাইয়া আনিতে সক্ষম হইব।'

২৮ এপ্রিল কলকাতায় এক সংবাদপত্র-বিবৃতিতে তৎকালীন বঙ্গীয় মুসলিম লীগের সম্পাদক আবুল হাশিম বাঙলাকে অবিভক্ত রাখার ও স্বাধীন করার ক্ষেত্রে বাঙলার হিন্দু-মুসলমান যুবশক্তিকে তাদের যথার্থ ভূমিকা পালন করার আবেদন জানালেন।

কিছুদিনের মধ্যেই শরৎচন্দ্র বসু এবং বাঙলার মুসলিম লীগ নেতাদের মধ্যে এক বৈঠক হল। এ বৈঠকে আলোচনার ভিত্তি হিসেবে শরৎচন্দ্র কয়েকটি প্রস্তাব আনেন।

ইতিমধ্যে গান্ধীজী এলেন সোদপুর আশ্রমে। ৯ মে দুবার গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে অবিভক্ত স্বাধীন বাঙলা সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনাটি নিয়ে আলোচনা করেন শরৎচন্দ্র বসু। ১১ মে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনার পর পরিকল্পনাটি তিনি প্রকাশ করলেন। পরিকল্পনাটির ভিত্তি ছিল: ১. বাঙলার হিন্দু ও মুসলমানরা হল বাঙালি এবং তারা একই জাতির অন্তর্গত; ২. রাজনৈতিক বিষয়ে ধর্মীয় নীতিকে প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া উচিত নয়; ৩. কোনো সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিত্ব সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের অবসান ঘটাতে পারে না; ৪. বাঙলার প্রশাসন বাঙালিদের দ্বারাই চালানো উচিত; ৫. সরকারি চাকরিতে বাঙালিদেরকেই বহাল রাখতে হবে। এ ব্যাপারে বাইরের কোনো প্রভাব খাটানো চলবে না।

ওদিকে ১০ মে আবুল হাশিমকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্র গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন। পরদিন আবুল হাশিমের সঙ্গে শহীদ সুরাবর্দি এবং প্রাদেশিক মন্ত্রী মহম্মদ আলী গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন। পরের দিনও আবার তাঁরা আসেন। স্বাধীন বাঙলার গঠন সম্পর্কে নিজের নানাবিধ সংশয়ের কথা তাঁদের কাছে প্রকাশ করেন গান্ধীজী।

১৩মে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে সার্বভৌম বাঙলা রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর তীব্র বিরোধিতার উল্লেখ করেন। ইতিপূর্বে ১৯ মার্চ এক সংবাদপত্র-বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন যে, ভারত যদি অবিভক্তও থাকে, তাহলে সেই অবস্থাতেও বাঙলাকে ভাগ করতে হবে। সে সময়ে তিনি বাঙলাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভক্ত করার জন্য প্রায় প্রতিদিনই বক্তৃতা-বিবৃতি প্রদান করছিলেন। দাঙ্গার সময় হিন্দুমুসলমানের মধ্যে যে তিক্ততাবৃদ্ধি পেয়েছিল, সে তিক্ততা সেই রাজনৈতিক সংকটের সময় কমিয়ে আনার পরিবর্তে তিনি তাকে শতগুণ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক প্রচার চালিয়ে এক তোলপাড় সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর এ ধরনের আক্রমণের জবাবে সুরাবর্দি মে মাসের প্রথম সপ্তাহে এক সংবাদপত্র-বিবৃতির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ বাঙলার সপক্ষে আবার নানাবিধ যুক্তি দেখান।

নবপর্যায়ে বাঙলাদেশকে বিভক্ত করার এই আন্দোলন বাঙালি হিন্দুদের একাংশের দ্বারা শুরু হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই হিন্দু কংগ্রেস নেতাদের অসাম্প্রদায়িক অংশের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সত্যরঞ্জন বকশী, কিরণশঙ্কর রায়, অখিলচন্দ্র দত্ত, দেবেন দে প্রভৃতি নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন।

বস্তুত, সে সময়ের রাজনীতি পর্যালোচনা করলে স্পষ্ট দেখা যায়, সার্বভৌম বাঙলার বিরুদ্ধে হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের মধ্যে অবস্থিত সাম্প্রদায়িক ও হিন্দুমহাসভাপন্থী নেতারা যেমন নিজেদের তৎপরতা শুরু করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে বাঙলার মুসলিম লীগের মধ্যে চরম সাম্প্রদায়িক এবং ১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগ নেতৃত্ব থেকে উৎখাত-হয়ে-যাওয়া অংশটিও স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলার বিরুদ্ধে নিজেদের তৎপরতা শুরু করে।

সে সময়ে প্রকাশিত নানাবিধ তথ্য আর সংবাদ দেখে এটা মনে হয়, কংগ্রেস আর লীগ নেতাদের মধ্যে গান্ধীজী ও জিন্না অন্তত একটা সময়ে নিজ-নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে বাঙলা আর পানজাবকে অবিভক্ত রাখার চিন্তা করেছিলেন।

মে মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হাউসে কমিউনিস্ট পার্টি আয়োজিত এক সিমপোজিয়ামে বক্তৃতায় লীগ-সম্পাদক আবুল হাশিম হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার কথা নতুন করে তুলে ধরলেন বুদ্ধিজীবীদের কাছে। ২০ মে শরৎ বসুর বাসভবনে স্বাধীন সার্বভৌম বাঙলার অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য তৈরি খসড়া সংবিধানটি কংগ্রেস আর লীগ—উভয়পক্ষের দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। দু পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করলেন শরৎচন্দ্র বসু ও আবুল হাশিম। এ বিষয়ে সমস্ত তথ্য জানিয়ে গান্ধীজীকে চিঠি লিখলেন শরৎচন্দ্র।

২৮ মে আবুল হাশিমকে অগ্রাহ্য করে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি এক প্রস্তাব গ্রহণ করে স্বাধীন বাঙলার বিরোধিতা করলেন। একই দিনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক এক প্রেস-বিবৃতির মাধ্যমে অখণ্ড সার্বভৌম বাঙলা প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করলেন।

২ জুন গৃহীত হল 'মাউনটব্যাটেন রোয়েদাদ'। এ পরিকল্পনায় অখণ্ড সার্বভৌম বাঙলার প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দিয়ে ভারতকে এবং বাঙলা ও পানজাবকে বিভক্ত করার ব্যবস্থা করা হল। সমর্থন জানালেন জওহরলাল নেহরু, জিন্না আর বলদেও সিং।

৮ জুন গান্ধীজী শরৎ বসুকে পত্র লিখলেন অখণ্ড স্বাধীন বাঙলা গঠনের প্রয়াস থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়ে।

৯ জুন দিল্লিতে সারা-ভারত মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করা হল। এর আগে সুরাবর্দির নেতৃত্বে বাঙলার প্রতিনিধিরা ঠিক করে রেখেছিলেন, তাঁরা কাউন্সিলে 'মাউনটব্যাটেন রোয়েদাদে'র বিরোধিতা করবেন। শেষ পর্যন্ত মূল অধিবেশনে অবশ্য সুরাবর্দি বা আবুল হাশিমকে কোনো কথা বলার সুযোগ দেওয়া হল না। প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর ওই দিন সন্ধ্যায় আবুল হাশিম এক বিবৃতিতে প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। ফলে সে সময় দিল্লী থেকে প্রকাশিত জিন্নাপন্থী ইংরেজি দৈনিক "ডন" পত্রিকা "ঘাসের মধ্যে সাপ" শিরোনামে আবুল হাশিমের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন।

১৪ জুন দিল্লিতে সারা ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনেও গৃহীত হল 'মাউনটব্যাটেন রোয়েদাদ'।

এভাবেই দুই নির্ভীক আদর্শবাদী অসাম্প্রদায়িক বঙ্গসন্তানের এক আশ্চর্য স্বপ্ন বাস্তবে সম্ভব করার অসামান্য প্রয়াসের ওপর যবনিকাপাত ঘটল। ১৯৪৭-এর সেই রুদ্ধশ্বাস নাটকীয় পর্বের প্রায় প্রতিটি মুহূর্তের রোমাঞ্চ ও চমক প্রয়োজনীয় দলিল-দস্তাবেজ সহ আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বদরুদ্দীন উমর। মুক্তমনা প্রতিটি বাঙালিই তাঁর কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞ থাকবেন।

সাদা পটে কালো রেখা

সমীর ঘোষ

সম্প্রতি বিড়লা একাডেমির প্রদর্শশালায় শিল্পী লালুপ্রসাদ সাউ-এর ছাপের ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল। কলকাতায় শিল্পীর ছাপের ছবির প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রদর্শনী। ৬৮ থেকে ৮৮ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বছরের নানান মাধ্যমের ছাপাই ছবির বিরাট সম্ভার রসিক দর্শক দেখার সুযোগ পেলেন। প্রদর্শনী চলেছিল জানুয়ারি ২ থেকে ৭ তারিখ পর্যন্ত।

বর্তমানে শিল্পী লালুপ্রসাদ সাউ টেম্পেরায় চিত্র নির্মাণে ব্যস্ত। শিল্পী জীবনের সূত্রপাতে অবশ্য তিনি তেল ও জল রঙে ছবি তৈরি করলেও তাঁর খ্যাতি বা বৈশিষ্ট্যের শুরু ছাপের ছবি থেকে। শিল্পীর নিজের কথায় আমরা জানতে পারি,—'…সোসাইটির সদস্য হয়ে এচিং শুরু করি। ঐ সময় একটি চেক গ্রাফিক প্রিনট-এর প্রদর্শনী দেখে আমি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হই, বিশেষ করে তাদের সাদা-কালো রঙের জোরালো ব্যবহার ভীষণভাবে মনকে নাড়া দেয়।' ছাপের ছবিতে শিল্পীর আবির্ভাবকে জানতে এই উক্তি বিশেষ সহায়ক।

লালুপ্রসাদের প্রথম দিকের ছাপের ছবিতে প্রধানত আকারনিষ্ঠতা এবং দৃশ্যবস্তুর রূপের বিকৃতিকরণের ঝোঁক স্পষ্ট। যেভাবে তৎকালীন অন্যান্য শিল্পীদের ছাপের ছবিতে বিমূর্ততার প্রকাশ ঘটত, লালুপ্রসাদের ছবিতে সেই একই প্রক্রিয়ার প্রচেষ্টা লক্ষণীয় ছিল। কিন্তু খুব দ্রুত তিনি নিজের ভাবনা ও ভাষা অর্জনে সচেষ্ট হন। এর ফলে তাঁর ছাপের ছবিতে আসে রূপের সরল জ্যামিতিক বিন্যাস। আর তার সঙ্গে যুক্ত হয় বিষয় রূপারোপে দ্বিমাত্রিক তলের ব্যবহার। প্রধানত সাদা পটের ওপর কালোর ব্যবহারকে তিনি ভিন্ন মাত্রায় ব্যবহারে অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

ছাপের ছবিতে কালো সাদার ব্যবহার অর্থাৎ জ্যামিতিক ক্ষেত্র বিভাজন বর্তমান ইয়োরোপীয় ধারায় বহুল ব্যবহৃত। কিন্তু সেসব কাজের প্রধান গুণ মূলত নাটকীয়তা। চাক্ষুষী মায়াবিভ্রমে মানুষের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে আঘাত করা। এক অস্থির চাঞ্চল্য তৈরিই এই ছবির প্রধান লক্ষণ। কিন্তু লালুপ্রসাদের কালো সাদার পট বিভাজনে জ্যামিতিক কাঠিন্য থাকলেও তা যেন তীব্র নাটকীয়তার পরিবর্তে অনেকাংশেই স্থির। বরং ছবিগুলিকে এক সুস্থির ছন্দের জ্যামিতিক আকারের আলপনা বলে মনে হয়।

লালুপ্রসাদ সাউ-এর ছাপের ছবিতে দ্বিমাত্রিকতার ব্যবহার থাকলেও কালো সাদার স্তর বিন্যাসে পটের মধ্যে কতকগুলি ভিন্নমাত্রা সংযোজিত হয়। এই স্তর বিন্যাসে তিনি ব্যবহার করেন সূক্ষ্ম জালি কাপড়ের বুনোট। ক্ষয়াটে কালোর ক্রমবিলীয়মান ছায়া আর সরু রেখার অতর্কিত ছন্দতন্তুজাল। সব মিলিয়ে ছবি হয়ে ওঠে রহস্যে পূর্ণ। বিষয় প্রাধান্য না পেলেও এই জ্যামিতিক আকারগুলিই যেন কখনো-কখনো বিষয়ের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিতে আগ্রহী করে তোলে। চেনা বিষয়ের গন্ধ যেন অচিরেই জড়িয়ে যায় ছবির সমগ্র প্রেক্ষাপট জুড়ে। তাই কখনো নৌকোর পাল, জাহাজের খোল কিংবা কোনো যন্ত্র বা যন্ত্রাংশের আপাত উজ্জ্বলতাহীন কঠিন রূপেও ছন্দের ভারসাম্য আরোপিত হয়।

লালুপ্রসাদের ছাপের ছবির অন্যতম বৈশিষ্ট্য মাধ্যমের চরিত্রগত বিশিষ্টতার সন্ধান। লিনো, লিথো বা এচিং প্রিনটের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং পাশাপাশি মাধ্যমগত দূরত্বকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে তিনি সবিশেষ যত্নবান। সে কারণেই এচিং প্লেটে অ্যাসিডের ক্ষরণ এবং ধাতব অস্ত্রের ক্ষত যে ধারায় তিনি প্রকাশ করেন, লিথোর ক্ষেত্রে সেভাবে চিত্রকল্পকে ব্যবহার করেন না। বরং লিথো-পাথরের অনুভবী শরীরের সূক্ষ্ম বিন্দু এবং নিপাট গাঢ়তাকে কাজে লাগিয়ে তিনি রূপারোপে ও রেখার স্থূলত্বে আনেন কালোর গভীর গম্ভীর মগ্নতা। গাঢ়তার বিস্তৃত ব্যাপ্তি। শিল্পীর লিথো মাধ্যমের ছবিতে কালো রঙ এক ভিন্ন মাত্রা যোজনা করে।

পাশাপাশি পটের কালো আকারের পার্শ্ববর্তী সাদা ছেড়ে যাওয়া ভূমিভাগ শুধুমাত্র অবসর নির্মাণেই দোহার যোগায় না। বরং কালোর পাশে সাদা রঙ হিসেবে পরিপূরক আকার নির্মাণে সক্রিয় থাকে। কিন্তু কালো ঘেরাটোপের মধ্যে-মধ্যে ঈষৎ আলোর যে ঝলকানি উঁকি দেয় তা আর শুধু রঙ হিসেবে নয়, আলোর উৎস হয়ে দূরপ্রসারী ব্যাপ্তি যোগায়। ছবিতে রহস্য সৃষ্টি করে।

আমার মনে হয় লালুপ্রসাদ সাউ ছাপের ছবির বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে লিথোগ্রাফির প্রতি অধিক আকর্ষণ অনুভব করেন। এচিংয়ে তাঁর বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য কাজ থাকলেও কালোসাদার উপস্থাপনে লিথোতে তিনি অনেক বেশি আবেগপ্রবণ। এই আবেগপ্রবণতা বর্তমানে শান্তিনিকেতনের সুস্থির জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে ছবিতেও ছাপ রাখছে। লিথোগ্রাফে কালো রেখার যে সাবলীল ব্যবহার তার পিছনে প্রাচ্য ক্যালিগ্রাফির প্রগাঢ় প্রভাব কাজ করেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আলোছায়ায় ঘেরা শান্তিনিকেতনের প্রকৃতি পরিবেশ। রহস্যময় প্রকৃতির আলো-আঁধারি ঘেরাটোপ লালুবাবুর ছবির শরীরেও চিহ্ন স্পর্শ রেখেছে। এক সময় শহর কলকাতার ইট-কাঠ-লোহার যন্ত্র-যন্ত্রাংশের রূপভাবনা যে ভাবে শিল্পীর ছবির শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল, জ্যামিতিক আকার প্রধান, কনস্ট্রাকশন্ এবং কম্পোজিশনে তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন, সেই একই রূপচেতনার ভিন্নতর রূপান্তর ঘটে শান্তিনিকেতনের প্রকৃতিতে। লালুপ্রসাদের রূপ গঠনের প্রাথমিক যে বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ পটের সীমাকে জ্যামিতিক আকারে সচেতন প্রয়াসে নির্দিষ্ট সীমায় বেঁধে ফেলার প্রবণতা তা প্রকৃতির ছন্দময় অভিব্যক্তিতে শুধু আরো বেশি ছন্দময় হয়ে উঠেছে। পটে পূর্বের ছড়ানো টেন্‌শনের পরিবর্তে এসেছে গঠনের সমগ্রতাকে একটি নিটোল ছন্দে গড়ে তোলার প্রয়াস। বুনোটের তীব্র নাটকীয়তার পরিবর্তে স্থাপত্যের স্থির গাম্ভীর্য।

লালুবাবুর ছাপের ছবির বিরাট সম্ভারে মাত্র একটি ছবিতেই সম্ভবত নাম চোখে পড়ল। ৬৮ সালে করা একটি এচিং—নাম ফিয়ার। ছবির নামের সঙ্গে সঙ্গতিসূচক মাত্র তার আবহ। ভয়ের যে শিহরন তারই পটভূমি যেন এই ছবিতে ভাস্বর। রেখার ঘূর্ণন এবং রেখাকে অবলম্বন করে রঙের ছড়িয়ে যাওয়া কম্পমান ছায়া। জলের ঘূর্ণীতে চীনা কালি ছড়িয়ে দিলে যে দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া ঘটে, এই এচিং তারই প্রতিভাস। অবশ্য এক্ষেত্রেও নাম না থাকলে তেমন অনর্থ ঘটত না। নামহীন সমগ্র ছবিতে আধুনিক শিল্পভাষার যে ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে আছে নির্দিষ্ট নামাবলীতে তার ব্যাপ্তিকে আহতই করত। সে কারণেই লালুপ্রসাদ সাউয়ের নামহীন ছবি অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী ও গ্রহণের সহায়ক।

শিল্পীর ছাপের ছবির বিস্তৃত ধারায় ভাবনার বহমানতাকে এক সঙ্গে দেখার সুযোগ পাওয়ায় আমরা রসিক দর্শকজন অবশ্যই আনন্দিত। প্রদর্শনীর উদ্যোগী সংস্থার এই ধরনের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাই।

সিনেমা

গণশত্রু : আশা ও নৈরাশ্য

মেঘ মুখোপাধ্যায়

দীর্ঘ কয়েক বছর বিরতির পর নব্বইয়ের দশকের প্রথম মাসে সত্যজিৎ রায়ের ছবির মুক্তি অবশ্যই আনন্দোজ্জ্বল ঘটনা। "ঘরে বাইরে"র পর সুকুমার রায়কে নিয়ে তাঁর তথ্যচিত্র নির্মাণের কাজ শেষ হবার পরেই ইবসেনের প্রসিদ্ধ নাটক অবলম্বনে তিনি কাহিনীচিত্র "গণশত্রু"র কাজ শুরু করে দিলেন।

সত্যজিৎ রায়কে সাধারণত ক্লাসিকপন্থী বলে মনে করা হয়; কিন্তু প্রথম থেকেই তাঁর মধ্যে এক প্রতিবাদী চরিত্রগুণ দেখা গেছে, যদিও তা কখনো প্রবল ও প্রধান হয়ে ওঠে নি। সামাজিক অন্যায়-অবিচার-বৈষম্যের বিষয়ে তিনি তাঁর নানা ছবিতে মন্তব্য করেছেন, প্রতিবাদে বিরত হন নি। কিন্তু তা কখনো প্রথাগত ভদ্রতার বাইরে চলে যায় নি বা উচ্চকিত হয় নি। প্রত্যেক শিল্পীরই প্রতিবাদ প্রকাশের নিজস্ব ভাষা থাকে। কিন্তু সত্যজিৎ রায় তাঁর স্বনির্দিষ্ট সীমার বাইরে বেরিয়ে এসে যখন "সদ্‌গতি" করেছিলেন, প্রতিবাদের ভাষার নগ্ন ধারালো উজ্জ্বলতায়, কঠোরতা আর রূঢ়তায় আমরা যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলাম, এবং বলেছিলাম তিনি পারেন, তিনি পারেন। ক্রুদ্ধ ও হিংস্র ভাষা প্রয়োগেও তাঁর নিপুণতা তুলনাহীন! "গণশত্রু" দেখে সে কথা আবার মনে হল।

প্রকৃতিতে যদিও ভিন্ন এবং শিল্প-উৎকর্ষে "সদ্‌গতি"র সমকক্ষ বলা চলে না, তবুও বলা যায় "গণশত্রু"তে সত্যজিৎ তাঁর প্রতিবাদী মেজাজে ফিরে এসেছেন। ইবসেনের নাটককে তিনি চলচ্চিত্রের উপযোগী এবং ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে যেভাবে রূপান্তরিত করেছেন, সে বিষয়ে কিছু বলার নেই। বরং একটি সংবেদনশীল ধর্মীয় ব্যাপারকে যেভাবে ছবির কেন্দ্রে স্থাপন করে তিনি ঘটনার গতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তাকে এক প্রকার দুঃসাহসই বলা যায়।

কোনো এক মফসসল শহরে হঠাৎ জনডিস রোগে পরপর রোগী মরতে শুরু করে। শহরের প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডা. গুপ্ত এ নিয়ে চিন্তিত। রোগের উৎস অনুসন্ধান করে তিনি জানতে পারেন যে, শহরের বিখ্যাত শিবমন্দিরের চরণামৃতর জল পান করেই রোগীরা মারা গেছে, এবং ওই মন্দিরের জল থেকেই রোগ ছড়াচ্ছে। অবিলম্বে ওই চরণামৃতপান বন্ধ না করলে শহরে মহামারী দেখা দেবে। ডা. গুপ্তর এই আবিষ্কার কোনো ধারণামাত্র নয়। চরণামৃতের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার পরেই তিনি স্থির-নিশ্চিন্ত হন এবং ঘোষণা করেন। এরপর স্থিতাবস্থার সমর্থক ও কায়েমি স্বার্থের পরিপোষক এক গোষ্ঠীর মুখোমুখি হতে হয় তাঁকে। তিনি যখন তাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলের কথা জানান এবং স্থানীয় এক সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে শহরবাসীর গোচরে আনতে চান, কায়েমি স্বার্থের দুই প্রধান স্তম্ভ, শহরের পৌরপিতা এবং মন্দির কমিটির নেতা, প্রবল ক্ষমতায় তাঁকে বাধা দেন। তাঁদের আরোপিত বাধা, এবং সেই বাধার বিরুদ্ধে ডাক্তারের বেপরোয়া কিন্তু ব্যর্থ সংগ্রাম নিয়েই ছবি। ডাক্তার চান যতদিন না মন্দিরের জলব্যবস্থার সংস্কার করা হচ্ছে, মন্দির বন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু পৌরপিতা তা চান না। মন্দির কমিটির নেতা প্রভাবশালী ব্যবসায়ী মি. ভার্গবও তা ভাবতে পারেন না। এমনকী, এই খবর জনসাধারণের গোচরে আসুক —এটাও তাঁরা সহ্য করবেন না। মোট কথা— মন্দির, মন্দিরের দেবতা এবং চরণামৃত নিয়ে কোনোরকম অভিযোগকে তাঁরা দুজনে আমল দিতেই চান না, এবং এ নিয়ে ডা. গুপ্ত হইচই পাকাবার চেষ্টা করলে, তাঁর ক্ষতি হবে বলে তাঁরা শাসিয়ে যান। পৌরপিতা ব্যক্তিগতভাবে ডাক্তারের ছোটো ভাই। পরম আত্মীয়ের কাছ থেকে চরম বিরুদ্ধতা ডাক্তারকে ভীষণ বিমূঢ় করে দেয়। একদিকে ভাই আর একদিকে ক্ষমতাবান প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূ হিসেবে ভাইয়ের ভূমিকা এবং ডাক্তারের সঙ্গে এই চরিত্রের দ্বন্দ্ব আর সংঘর্ষ ছবিটিকে প্রাণবন্ত ও টানটান করে তুলেছে—এটিই ছবির আকর্ষণের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ডাক্তারের সঙ্গে স্থানীয় খবর-কাগজের সম্পাদকের সম্পর্কের দ্বন্দ্ব ছবিটির আর-একটি গুরুত্বপূর্ণ, আকর্ষণীয় দিক। সম্পাদকের দ্বন্দ্ব-সমর্থনে ডাক্তার শেষ পর্যন্ত প্রতারিত হন। যদিও ডাক্তারের স্ত্রী, একমাত্র কন্যা, হবু জামাতা তাঁর সপক্ষে দাঁড়ান, কিন্তু বোঝা যায়—স্থিতাবস্থার পাণ্ডাদের দাপট আর প্রভাব বিস্তারের পরিসর ঢের বেশি। ছবিটি আসলে ডাক্তারের ব্যর্থতাতেই শেষ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পরিচালক এক পা বাড়িয়ে হতাশাকে নিরমূল করেছেন। নৈরাশ্যকে ব্যর্থ করে এক আশাবাদের দৃশ্য ও ধ্বনিতে ছবি শেষ হয়েছে। দুষ্ট দলের দ্বারা ডাক্তারের বাড়ির দেয়ালে তাকে "গণশত্রু" চিহ্নিত করে যে দেয়াললিখন ফুটে উঠেছিল তা লোপ পেয়ে যায় শহরের প্রগতিশীল যুব-সমাজের 'অশোক গুপ্ত জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে উজ্জ্বল মিছিলের আভাসে।

স্টুডিওবদ্ধ ছবির ক্ষেত্রে এর চিত্রনাট্যের আঁটো-সাটো গঠন এবং নাটকীয়তা দেখবার মতো। পরবর্তী ঘটনা জানার জন্য দর্শকের মনের মধ্যে টেনশন তৈরি হয়ে যায়। প্রত্যেক শিল্পী তাঁদের নিজের-নিজের চরিত্রে দারুণ অভিনয় করেছেন। ডা. গুপ্তর ভূমিকায় সৌমিত্র এবং পৌরপিতার ভূমিকায় ধৃতিমানের অভিনয় চলচ্চিত্রের অভিনয়কলার উৎকর্ষের নিদর্শন হয়ে থাকবে। মি. ভার্গবের ভূমিকাভিনেতা অল্পক্ষণ পর্দায় দেখা দিয়ে মনে স্থায়ী স্মৃতি রেখে গেলেন। মনোজ মিত্রের অভিনয়ও তাই।

ছবিটির দুটি ত্রুটি সহজেই চোখে লাগে। দুর্গা-মণ্ডপে ডাক্তারের সভার দৃশ্যে জনতার ভূমিকা স্বতঃ-স্ফূর্ততা লাভ করে নি। ডাক্তারের সপক্ষে বা বিপক্ষে ভিন্ন দুদল সমর্থনকারী যখন গলা তোলে, তা অভিনয় বলেই মনে হয়। দৃশ্যটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি। এ ছাড়া, ছবিতে বারবার বলা হয়েছে যে শিবমন্দিরটি শহরের এক জনবহুল জায়গায় অবস্থিত কিন্তু দেখাবার সময় মন্দিরটিকে আলাদা একটি মন্দির হিসেবে দেখানো হয়েছে। সহজেই বোঝা যায়—এটি একটি সেট মাত্র। কোনো শহরের একটি সত্যিকারের জন-বহুল ও কোলাহলপূর্ণ জায়গায় শট নিয়ে কি এখানে সংযোগ করা যেত না? সত্যজিৎ নিজ না পারুন, তাঁর নির্দেশমতো কোনো সহকারী নিশ্চয় এরকম কয়েকটা শট সংগ্রহ করতে পারতেন। তাতে 'জনবহুল' 'জনবহুল' উচ্চারণের গুরুত্ব দৃশ্যগত মাত্রা পেত। তিনি মন্দির বা পুণ্যার্থীর ভিড় বা এজাতীয় ধর্মীয় উন্মাদনার ব্যাপারটিকে যথাযথ ভিস্যুয়ালাইজ করতে পারেন নি। মন্দিরটিকে কেন্দ্র করে যে একটি গোষ্ঠী লাভজনক ব্যবসা করছে, তা প্রমাণেও ওই দৃশ্য-কল্প সাহায্য করত। এক হিসেবে বলা যায়, ছবিটিতে চলচ্চিত্রে-গুণের চেয়ে নাট্যগুণ বেশি মাত্রা পেয়েছে। অবশ্য তাতে যে এর ক্ষতি হয়েছে তা নয়। নাট্যগুণ নিয়ে কিভাবে সার্থক চলচ্চিত্র করা যায়, ছবিটি থেকে তা শেখবার আছে। কারণ, এদেশের অধিকাংশ ছবিই তো শস্তা, জোলো আর বিরক্তিকর নাটুকে-পনায় ভরতি।

সত্যজিৎ রায় নিজেই আমাদের এমন বড়ো ক্যানভাসে আঁকা ছবি দেখতে শিখিয়ে দিয়েছেন যে নানা গুণের সমন্বয় সত্ত্বেও "গণশত্রু" দেখে আমাদের কেমন অতৃপ্তি থেকে যায়। এই ছবিটিতে হয়তো কিছু কমতি নেই, কিন্তু আমরা যে কিছু বেশি পেলাম, তাও নয়। অথচ, তাঁর কাছ থেকে যে কিছু বেশি পাবার লোভ সবসময় কাজ করে। ছবিটি আমাদের চিন্তা ও কল্পনার জগতে কোনো বড়ো উদ্ভাসন নিয়ে এল কি?

সরেজমিনে অযোধ্যা

ভীমরাজ যাদব

বিতর্কিত রামজন্মভূমি আর বাবরি মসজিদ সম্পর্কে নানা কথা লোকমুখে শোনার পর তাকে নিজ চোখে দেখে ও জেনে নেওয়ার তাগিদে আমরা তিন বন্ধু (ডা. দেবাশিস বক্‌শী, শ্রীমন্মতোষ দাস ও ভীমরাজ যাদব) অযোধ্যা গিয়েছিলাম। আমাদের থাকা-খাওয়া ঘোরা-ফেরার ব্যবস্থা স্থানীয় এক বন্ধু করেছিলেন। অযোধ্যা ট্র্যারের পর আমরা ডা. দ্বারকানাথ কোটনিস মেমোরিয়াল কমিটি জাতীয় পরিষদের সভায় যোগ দিতে দিল্লী রওনা হয়ে যাই।

অযোধ্যা স্টেশনে পৌঁছেই আপনি মন্দিরগুলির চূড়া দেখতে পাবেন। স্টেশনে হিন্দীতে মোটা অক্ষরে লেখা আছে রামায়ণের দোহা, কাব্যপদ এবং উপদেশ। স্টেশনের পুরানো নাম রায়গঞ্জ। স্টেশন চত্বর ছেড়ে বেরিয়ে আমার পর তিন-চার মিনিট হাঁটলে আপনি ফৈজাবাদ-গোরখপুর রোড পাবেন। খুব কাছেই হনুমান-গঢ়ীর সাদা রংয়ের কেল্লার মত বাড়ী, গায়ে পুরানো ধরনের কামান লাগানো আছে। হনুমান-গঢ়ীতে যাওয়ার সময় সারি সারি দোকানের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। প্রসাদ, পূজা-সামগ্রী ও চিড়ে মুড়ির দোকান প্রচুর পাবেন। সাধ্বী মহিলারা কিছু-কিছু দোকানে বিক্রেতা হিসাবে কাজ করেন।

অযোধ্যায় আগতদের প্রায় ৯৫ শতাংশ হনুমান-গঢ়ীর মন্দিরে পূজা প্রসাদ দিয়ে থাকেন। এই হনুমান-গঢ়ীকে স্থাপিত করার জন্য জমির ব্যবস্থা করেছিলেন নবাব সফদরজঙ্গ। তাঁর সেনাবাহিনীতে কায়স্থরা ও নাগারা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ছিলেন, নবাবের উপর এঁদের বেশ খানিকটা প্রভাব ছিল বলেই মনে হয়। নবাব আসফদ্দৌলার দেওয়ান মন্দির তৈরী করাবার জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেছিলেন। মোট কথা, অযোধ্যায় প্রায় শ চারেক মন্দির আছে। ঐগুলির বেশীরভাগ রাজা, নবাব, সামন্ত, সাধু, মহন্তরা তৈরী করিয়েছেন, পাশাপাশি তৈরী হয়েছে জাতিবর্ণভিত্তিক পঞ্চায়েতী মন্দিরগুলি যেমন নিষাদ, যাদব, কুর্মি নাম দিয়ে মন্দির। ঐ-সমস্ত কিছু তৈরি করার পরিকল্পনা ও চিন্তা ছিল সামন্ত-প্রভুদের, অর্থদান দিয়েছে কিন্তু সাধারণ বিত্তবানেরা ও ব্যবসায়ীরা। এই মন্দিরগুলি ধর্মপ্রচারের কাজে লাগার সাথে-সাথে কিছু লোকের জীবিকার জন্যও সহায়ক হয়েছে। হিন্দুরাজা ও সামন্তরা যে কারণে অযোধ্যাকে গড়ে তুলেছিলেন, মুসলিম শাহেনশাহ ও নবাবেরা ঠিক সেই কারণেই অযোধ্যাকে মসজিদ দিয়ে সাজাতে চেয়েছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের সামন্তদের মধ্যে কখনো বোঝাপড়া হয়েছে, কখনও বিবাদ বেড়েছে, তারই দ্বারা মহান্ত ও সাধুরা প্রভাবিত হয়েছে। এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের যেমন বিরোধ ছিল, তেমনি সহিষ্ণুতার সম্পর্কও গড়ে উঠেছিল। হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের পীঠস্থান হিসাবে অযোধ্যার পরিচিতি আছে। উত্তর প্রদেশের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় থাকার ফলে এর গুরুত্ব ধর্ম-প্রচারকদের কাছে অপরিসীম। এটাকে সমস্ত ধর্মীয় লোকেরা নিজ নিজ ধর্মীয় প্রভাবে রাখার চেষ্টা অতীতে যেমন করেছে, বর্তমানেও করছে।

সর্বপ্রথম ১৮৫৩ সালে রামজন্মভূমিকে কেন্দ্র করে বিবাদটি জনসমক্ষে আসে। তখন স্থানীয় লোকেরা সাম্প্রদায়িক সদ্‌ভাবের পতনে খুব বিব্রত বোধ করেন। ১৮৫৫ সালে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান বয়োজ্যেষ্ঠরা ৪ বছরের জন্য একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন। আবাসী ব্রিটিশ কর্তারা সেই চুক্তিকে শুধু ছিন্ন করে

নি, উপরন্তু বরাবরের জন্য দুই সম্প্রদায়ের মিলন-সূত্রও ছিন্ন করে দিয়েছে। ব্রিটিশরা সেই চুক্তি-সম্পাদনকারী দুই সম্প্রদায়ের বয়োজ্যেষ্ঠদের অযোধ্যা ফৈজাবাদ রোডের উপর একটি বটগাছে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়েছে। বটগাছটি স্মৃতিসৌধরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেদের কাছে শ্রদ্ধা পাচ্ছে দেখে ব্রিটিশরা বিচলিত হয়ে পড়ে এবং ১৮৬০ সালে তারা গাছটিকে কেটে ফেলে।

১৮৫৭-৫৮ সালে ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থানে সাধারণ মানুষেরা যখন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও রোষে ফেটে পড়ছেন, সেই সময় কয়েকজন মহন্ত ব্রিটিশদের সমর্থন ও সহায়তা যোগাতে এগিয়ে এলেন। মহান্তদের দেওয়া সাহায্য ও আশ্রয় পেয়ে ব্রিটিশরা এই অভ্যুত্থান দাবিয়ে দেয়, সেই সঙ্গেই তারা মহান্তদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করে। মহান্তরা বিতর্কিত বাবরি মসজিদকে পুরস্কারস্বরূপ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত বাবরির উত্তর সীমানার পাঁচিলের সাথে লাগোয়া একখণ্ড সরকারী (নজুলের) জমি পেয়ে যান এবং তার উপরে একটি দেওয়াল তোলেন যার উপরের অংশটা চালাঘরের মত তৈরী ও দেওয়ালে দেবীমূর্তির দুই বাহুর উপরে সিংহ তার থাবা রেখে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হয়। এর সামনেই গাছপালা থাকায় স্পষ্ট দেখার অসুবিধা আছে। রামজন্মভূমিকে চিহ্নিত করার নামে তৈরী এই স্তম্ভের মধ্যে একটি প্রমাণ-সাইজ দরজা লাগানো আছে যার মধ্যে দিয়ে মসজিদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করা যায়। দরজাটি দিয়ে জনগণের যাতায়াত নিষিদ্ধ।

এই দেওয়াল-স্তম্ভ দেখিয়ে সাধারণ মানুষের নিকট ভুল তথ্য পরিবেশন করা হয়ে থাকে যা সবার পক্ষে ধরা সম্ভব নয়। সাধারণত বলতে শোনা যায় যে, বাবরের নির্দেশে যখন মন্দিরটি ভাঙার কাজ চলছিল তখন প্রতিরোধ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে শুধু এই অংশটা বাঁচানো সম্ভবপর হয়েছে।

১৯৪৯ সালের ২২-২৩ ডিসেমবর মসজিদ-সংলগ্ন নজুলের জমিতে নির্মিত প্ল্যাটফর্মের (স্তম্ভের) সীমানার দেওয়াল ভেঙে ফেলে কিছু দুষ্কৃতিকারী রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের মূর্তি মসজিদ-প্রাঙ্গণে পাচার করেছিল। এই মর্মে এক হলফনামার মাধ্যমে ফৈজাবাদের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার মি. জে. এন. আগর ফৈজাবাদের সিভিল জজের এজলাসে ২৪শে এপ্রিল ১৯৫০ সালে এক মামলা রুজু করেছিলেন। এই কার্যকলাপের দ্বারা যে উত্তেজনা সৃষ্টি করা হয়েছিল তার ফলে এক মারাত্মক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা লেগে যেত।

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে বুঝতে পেরে হস্তক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর হস্তক্ষেপের ফলে বিতর্কিত ইমারতটিতে বিচারব্যবস্থার অধীনে তালাচাবি বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করার জন্য প্রশাসনকে বাধ্য করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা ১লা ফেবরুয়ারি ১৯৮৬ পর্যন্ত কার্যকর ছিল।

এই বিতর্কিত ইমারত রামজন্মভূমি ও বাবরি মসজিদের মালিকানাকে কেন্দ্র করে আদালতে কয়েকটি মামলা হয়েছে। ১৬ই জানুয়ারি ১৯৫০ সালে শ্রীগোপাল সিং বিশারদ ফৈজাবাদের সিভিল জজের আদালতে এই মর্মে আবেদন জানিয়ে দাবি করেন যে বিতর্কিত ইমারতটি বাস্তবিক পক্ষে রামজন্মভূমি, সেই-হেতু আবেদনকারীকে প্রত্যর্পণ করা হোক মন্দির তৈরী করার নিমিত্তে। একই কারণ দেখিয়ে ১৯৫৯ সালে নির্মোহী আখড়ার পক্ষে একটি মামলা করা হয়। ১৯৬১ সালে সুন্নী ওয়াকফ বোর্ড এই দাবি জানিয়ে একটি মামলা করেন যে এই স্মৃতিটিকে সুন্নী ওয়াকফ সম্পত্তিরূপে ঘোষণা করা হোক। একই সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে আদালতে তিনটি মামলা একত্রে চলতে রইল। রামজন্মভূমি মুক্তি সমিতি ও বাবরি মসজিদ রেস্টোরেশন কমিটির নামে আইনের লড়াইয়ে দু পক্ষের প্রায় দু ডজন লোক স্ব স্ব পক্ষের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

সম্প্রদায় ও ধর্মভিত্তিক তোশামোদির দ্বারা

নির্বাচনে ভোট সংগ্রহ করা এবং প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সম্প্রদায়-বিদ্বেষী লোকেদের হাতে ধর্মনিরপেক্ষতার দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া আর রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা এই বিপদকে গুরুত্ব দিয়ে না দেখার ফলে বর্তমানে দেশের সাম্প্রদায়িক সংহতি ও সম্প্রীতি বিপদের মুখে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার এমন এক সীমানায় পৌঁছেছে যে দেশের সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও অপরধর্মসহিষ্ণু মানুষকে এগিয়ে এসে এই জটিলতার হাত থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে বের করতে হবে। কেবল সরকারি প্রচেষ্টার দ্বারা জটিলতা অবসানের পথ সুগম হবে না বলেই মনে হয়।

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছলাম সেই বিতর্কিত স্থানে যাকে বাবরি মসজিদ বা রামজন্মভূমি বলা হয়। তিনটি গোল গমবুজওয়ালা এই ইমারতে প্রবেশ করার আগে জুতো খুললাম। পি. এ. সির একজন সিপাই আমাদের কোমরে বাঁধা চামড়ার বেল্ট খুলে বাইরে রেখে দিতে বললেন। বিতর্কিত ইমারতে ঢুকে দেখলাম ভিন্ন মাপের সস্তাদামের ফ্রেমে বাঁধানো অনেকগুলি রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও অন্য দেবতার ছবি রেখে পূজা চলছে, প্রসাদ চড়ানো চলছে, কপালে লাল সিঁদুরের টিকে ফোঁটা দেওয়া হচ্ছে। ইমারতটির মধ্যে কোন মূর্তি চোখে পড়েনি। এছাড়া মসজিদের মধ্যে মি. কে. কে. নায়ারের এক বড় সাইজের ছবি দেখতে পেলাম। জেলা শাসক হিসাবে ইনি এই ইমারতে মুসলিম ঢোকা নিষিদ্ধ করে চার পুরোহিতকে পূজা করার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন এবং মন্দিরের বাইরে থেকে দর্শনার্থীদের দর্শন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

পরে সরকারি চাকরি ছেড়ে রামজন্মভূমি উদ্ধারের কাজে নিজেকে নিয়োগও করেছিলেন। ইনি কেরালার আলেপ্পি জেলার লোক, ফৈজাবাদে তাঁর বিরাট সম্পত্তি ছিল।

আরও একজন সিটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীগুরুদত্ত সিং সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করে বিতর্কিত ব্যাপারে একটি রায় দিয়ে চাকরি ত্যাগ করেন, পরে মহন্তদের সহায়তায় অযোধ্যার পৌর অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, তাঁর ছবিও বিতর্কিত ইমারতে শোভা পাচ্ছে। ইনিও ভগবানকে উদ্ধারের কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছিলেন। এমন একটি মহৎ কাজে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন স্বাধীনতা-সংগ্রামী শ্রীদাউ দয়াল খান্না, যিনি একসময় উত্তর প্রদেশের সরকারে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ছিলেন ও প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা হিসাবে পরিচিত। ইনি এখন শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি কমিটির সেক্রেটারি।

বিতর্কিত ইমারত রামজন্মভূমি বা বাবরি মসজিদের খুব নিকটেই আছে রামজন্মস্থান ও সীতার রসুই নামের এক বিরাট মন্দির যার পরিসরে হাজার দুয়েক লোককে বসানো যায়। কেল্লার মতন এই বাড়ীটিতে ভগবান রাম জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে দাবি করা হয়। এ ছাড়াও অযোধ্যায় কয়েকটি রামজন্মস্থান আছে। কোন্‌টা আসল ও কোন্‌টা নকল এই ফারাক বোঝা সম্ভব নয়। প্রবেশদ্বারে হিন্দীতে লেখা আছে জন্মস্থান ও সীতা রসুই পেরিয়ে মূল প্রাঙ্গণে ঢুকে মূর্তি দর্শন করছি এমন সময় একজন সাধু ডেকে বললেন 'সীতা রসুই ভী দেখ লিজিয়ে।' তাঁর অনুরোধে কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে তলায় নামলাম। একটি গলি প্রায় ৬ ফুট চওড়া ২০ ফুট লম্বা হবে—তারই মাঝখানে পাথরের একটি উনুন আছে যার উপরে লোহার চাটু এবং পাশেই পাথরের চাকি ও বেলন রাখা আছে। সাধু বললেন—এটিই সীতা-মাতার রান্নাঘর। দেখে ও বুঝে আমার মনে এমন ধারণা জন্মাল যে মানুষকে বোকা বানাবার যত চেষ্টা তার মধ্যে এটাও একটি। সাধু মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলাম, ঐ বাড়িটার বয়স কত হয়েছে বলতে পারেন কি? প্রশ্ন শুনে তিনি বললেন—বড়জোর আড়াই শ বছর হবে। আবার জানতে চাইলাম: ভগবান রামের ঘটনা কত দিন পূর্বেকার? তিনি জানালেন আমাদের মতে এই ঘটনা নয় লক্ষ বছর পূর্বেকার। প্রশ্ন রাখলাম, সে কালের কোনও জিনিস কি অযোধ্যায় আছে যাকে প্রমাণ-স্বরূপ মনে করা যেতে পারে? তিনি বললেন—সরযূ নদী ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই সময় থেকে এ পর্যন্ত অযোধ্যা অনেক বার গড়া হয়েছে ও বিলুপ্ত হয়েছে। কী করে পুরানো জিনিসগুলি থাকতে পারে? সাধুকে জিজ্ঞাসা করলাম সীতামাতার রান্না-ঘরের আসবাবপত্র কতদিনের? সাধু বিনীতভাবে বললেন, 'আপলোগ তো পড়ে লিখে আদমী হ্যাঁয় হমলোগ কিসি তরহ রামকে নাম কো টিকাকর রখে হ্যাঁয় য়েহি কেয়া কম হ্যাঁয়।' পকেটের সিকিটি বার করে তাঁর হাতে দিলাম, কোনও আপত্তি না করে আশীর্বাদ দিলেন। আশপাশের অনেকগুলি মন্দিরে ঘুরে-ঘুরে দেখে প্রশ্ন করলাম, সব মন্দিরেই একই ধরনের জবাব, ঘটনা নয় লক্ষ বছর পূর্বেকার, অযোধ্যা অনেক বার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে ও পুনঃ-স্থাপিত হয়েছে।

রামজন্মভূমি আর বাবরি মসজিদ সম্পর্কে এক রিকশাওয়ালাকে প্রশ্ন করতে সে বলল—জিস জগহ আমদনী হোতী হ্যাঁয় ওহাঁকে লিয়ে সবকোই দৌড়তা হ্যায়। অযোধ্যা থেকে তিন-চার কিলোমিটার দূরে দর্শননগর যাওয়ার সময় এক মন্দির দেখিয়ে সে বলল, য়হাঁ কোই আমদনী নেহি হ্যায়, ইস লিয়ে য়েহাঁ জানোয়ার বৈঠা রহে হ্যাঁয়।

নিরাপদ স্নানের জন্য জলের মত টাকা ঢেলে পাম্পের সাহায্যে জল এনে, 'রাম কী পৈড়ী' নামে ঘাট তৈরী হয়েছে: রাম, সীতা, উর্মিলা, ভরত ও কৌশল্যা প্রায় সবার নামেই ঘাট। ঘাটের পাশেই নাগেশ্বরনাথ ও অন্যান্য মন্দিরগুলি আছে। দুই মন্দিরের মাঝামাঝি একটি পুরানো বিধস্ত বাড়ি সম্পর্কে পাশের এক পূজারীকে জিজ্ঞাসা করতে উনি জানালেন, আমি এটাকে মসজিদ বলেই জানি। বহুদিন ধরেই এভাবেই পড়ে আছে। আমি প্রশ্ন করলাম, পাশে কি আরও মসজিদ আছে। হ্যাঁ, এর পিছনে কিছুটা দূরে আছে। ওখানে নামাজ হয় কি? হ্যাঁ, নামাজ হয় তবে কোন আওয়াজ হয় না। কেউ মাইক লাগিয়ে নামাজ পড়ে না। ভদ্রলোক জানালেন, আমার এই মন্দির গোণ্ডা জেলার কনওয়ার স্টেটের রাজা সাহেবের দ্বারা তৈরি করানো। এখন যিনি রাজা আছেন তিনি এখানে যাতায়াত করেন। দু-একদিন থেকে চলে যান। সবকিছু আমিই দেখাশোনা করি। ইঁদারা থেকে জল তুলে আমাদের খাওয়ালেন।

অযোধ্যার টেঢ়ীবাজারে পাঁচ পুরুষ ধরে বাস করছেন হাজী মেহবুব হোসেন। তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়ার জন্য গিয়ে তাঁকে না পেয়ে তাঁর আই. টি. আই. পাস করা ছেলে আফাকের সাথে কথা বলছিলাম। ইতি-মধ্যেই হাজী সাহেব ফৈজাবাদ থেকে রাজীব গান্ধীর বক্তব্য শুনে ফেরত এসে স্কুটার থামালেন। আফাক আমাদের সাথে হাজী সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিলেন। আশপাশে ভীড় জমতে দেখে হাজীকে বললাম, বসার জায়গা পরিবর্তন করলে ভাল হত। পাশেই বাড়ী, তিনি তাঁর ড্রইং রুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। আরও একজন এলেন। পরিচয় জানলাম, অযোধ্যা থেকে দূরে চাঁদপুরে বাড়ী, নাম অযোধ্যা তেওয়ারি। সবাই চায়ে চুমুক দিলাম, বলে উঠলাম, হাজী সাহেব আর পণ্ডিতজী সাথে চা খাচ্ছেন, ফের ঝগড়া কিসের? হাজী সাহেব বললেন, আমাদের সম্পর্ক ভালই আছে।

হাজী সাহেব ও অযোধ্যাপ্রসাদ তেওয়ারির কাছে জানতে পারলাম যে অযোধ্যায় শতকরা ৫/৬ ভাগ মুসলমান ৪টি মহল্লায় থাকেন। বেশীর ভাগ গরীব, দু-চারজন মধ্যবিত্ত। রিকশা, এক্কাগাড়ী, মেয়েদের চুড়ি পরানো, তুলোধোনা করা ও চামড়া-দেওয়া বাজনা বানানো বা সারানোর সাথে এরা যুক্ত। কোন কিছুতেই এরা বেশী হৈচৈ করে না। জীবন ও জীবিকার সন্ধানেই এরা ব্যস্ত থাকে।

কথা-প্রসঙ্গে হাজী সাহেবকে বললাম, ধরুন, আপনার কথাটাই মেনে নিলাম যে অযোধ্যায় হিন্দু-

মুসলমানদের মধ্যে কোনও উত্তেজনা নেই, তবে অন্যত্র তো এটা আছেই। লোকসভা নির্বাচনের পরে এই উত্তেজনা কমতে পারে কি?

উ—নির্বাচনের পর কি কেউ নিজের ব্যবসা ছেড়ে দেবে?

একটু খোলাখুলি বলুন, ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

উ—রামজন্মভূমি উদ্ধারের সাথে যুক্ত একজন পাণ্ডা চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ৫০ থেকে ৫৫ লাখ টাকার ব্যক্তিগত সম্পত্তি খাড়া করে নিয়েছে। লোকটি এক নামজাদা ব্যক্তির বাড়ীতে ভৃত্য ছিল। অবস্থা ফিরিয়ে নিয়েছেন একজন হাসিম আনসারী সাহেব। এঁদের নামে দেশ বিদেশ থেকে টাকা পয়সা মনিঅর্ডার আসছে। কে হিসেব রাখছে, এরা কত পাচ্ছে, কত খরচ করছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, অযোধ্যায় কাদের জমি বেশী? উ—নবাব মহম্মদ আলির সময় ৮০ শতাংশ জমি মুসলমান জমিদার জায়গিরদারদের ছিল। ২০ শতাংশ জমির উপরে হিন্দু জমিদারদের আধিপত্য ছিল। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মিলেমিশে থাকাটাই শ্রেয় বলে মনে করতেন। এখানে প্রচুর মাজার কবর-স্থান দেখতে পাবেন। স্টেশনের কাছে, মনী পর্বতের কাছাকাছি এবং টেঢ়ীবাজারে বেশ কয়েকটা মাজার ও কবরস্থান চোখে পড়ল। আমার পূর্বসূরীরা দিল্লীর লোক। ব্রিটিশরা শেখ-বিরোধী অভিযান করাতে আমরা অযোধ্যায় এসে আশ্রয় নিই। আমাদের এলাকা হিন্দুর ছিল, আমরা পাঁচ পুরুষ ধরে আছি।

প্রশ্ন—আপনাদের সাথে বি. জে. পি'র লোকেরা কেমন ব্যবহার করে, ওরা কি মুসলিমদের ঘৃণার চোখে দেখে থাকে? না, না ওরা খারাপ ব্যবহার করে না। তবে দু-একজন জাতবিদ্বেষী সব জায়গাতেই আছে। অযোধ্যায় সবাই মিলেমিশে থাকি। নির্মল ক্ষত্রীর অনুরোধে পৌর নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলাম, পরে দলীয় প্রতীক না পাওয়াতে নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হই। তবে লক্ষণীয় এই যে আমার মোট ভোটের মধ্য থেকে ৫৫টি ভোট আমি হনুমান-গঢ়ী থেকে পেয়েছি যেখানে পূজারী, পুরোহিত ও দোকানদার ছাড়া সাধুরা থাকেন। সবাই হিন্দু। কথা-প্রসঙ্গে হাজী সাহেব জানালেন ১৯৪৬ দেশব্যাপী দাঙ্গার ফলে দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আসার ফলে বেশ কিছু পরিবার অযোধ্যা ছেড়ে পাকিস্তানে চলে যান। অন্যান্য জেলাতেও সুবিধানুযায়ী তাঁরা বসবাসের জন্য চলে গেছেন। তখন থেকে বাবরিতে নামাজ পড়া বন্ধ হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করলাম, সরযূ নদীর ঘাটের পাশে নাগেশ্বরনাথ মন্দিরের নিকট বিধ্বস্ত বাড়ীটি কি? উনি বললেন ওটা জাহাঁগীরি মসজিদ। স্থানীয় লোক হিসাবে আপনারা এই বিবাদকে মেটাবার কোনও ভূমিকা নিচ্ছেন না কেন? এর উত্তর সরাসরি না দিয়ে বললেন—বাইরের লোকেরা তাদের বিশেষ স্বার্থ রক্ষার তাগিদে এই বিবাদকে কাজে লাগাচ্ছে। রোদের তেজ কমে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি প্রীতি-শুভেচ্ছা বিনিময় করে মিনিট ৪ হাঁটা দেওয়ার পর বশিষ্ঠকুণ্ড নামে এক মন্দিরের কাছাকাছি একটি বিরাট স্তূপের উপর উঠলাম, তার উপর থেকে ফৈজাবাদের গোলাপ-বাড়ী ও মকবরা দেখা যায়। স্তূপের পুরো চত্বর ঘিরে সুন্দর সুন্দর পার্ক তৈরী হয়েছে। এই প্রাচীন ধ্বংস-স্তূপের উপরে দেখতে পেলাম মকবরার মত কোন ইমারতের ভগ্নাংশ, আকাশের দিকটা ছাউনি-বিহীন, তার মধ্যে পাথরের একটি ষাঁড়মূর্তি রেখে দেওয়ালে সিঁদুর দিয়ে লেখা আছে: কুবেরজী কা মন্দির। তার উপরে সরকারী তত্ত্বাবধানে পার্ক তৈরীর কাজ চলছে। দুজন চৌকীদারকে দেখতে পেয়ে জায়গাটির নাম জানতে চাইলাম। আমাদের দিকে ভাল করে দেখে তাদের একজন বলল জায়গাটিকে কুবের কিলা বলা হয়। আমাদের প্রশ্ন এর কি পুরোনো কোন নাম ছিল? আমাদের তরফ থেকে খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে বলল, এর উপরে অনেকগুলো কবর আছে, এটা দেখতে টিলার মত তাই এটাকে কবর টিলা বলা হত। এখন এর নতুন নাম কুবের কিলা দেওয়া হচ্ছে। এই 'কবর টিলা' হতে বাবরির দূরত্ব ইষ্টক-নিক্ষেপ দূরত্বের সমান।

বাবরি মসজিদের সহিত অন্যান্য মসজিদের গঠন সাদৃশ্য বুঝবার উদ্দেশ্যে ফৈজাবাদ চৌক ও গোলাপ-বাড়ী গেলাম। অযোধ্যার বিতর্কিত ইমারতটিতে কোন মিনার বর্তমানে নেই, ফৈজাবাদের মসজিদগুলিতে মিনার আছে—শুধু এই পার্থক্য লক্ষ করলাম। ফৈজাবাদের গোলাপবাড়ীতে নানা রকম ও বিভিন্ন রংয়ের গোলাপ ফুল গাছ আছে। কালো রংয়ের গোলাপ এখানে পাওয়া যায়। একজন ঘাস কাটছিল আমাদের দেখে যে তার কাজ বন্ধ করে, উঠে এক দিকে যেতে থাকে। আমাদের ডাক পেয়ে সে এসে দাঁড়াল, আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, এই বাড়ীটার নাম কি? সে বললো—গোলাপবাড়ী। আমরা তার নাম জানতে চাওয়ায় সে চুপ করে রইল। আমাদের চোখ মুখের দিকে ভাল করে তাকিয়ে, তারপরে বললো—আমার নাম কাসেম। আমার এক বন্ধু তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তুমি তো মুসলমান নাম বললে, তা সত্ত্বেও তোমার মাথায় টিকি কেন? সে বললো আমাদের জোলাহা জাতের মধ্যে এটাতে কেউ আপত্তি করে না। প্রশ্ন করলাম, রামজন্মভূমিকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে তাতে তোমার কেমন লাগছে? কাসেম বললো,—ভয় পাচ্ছি। আমি বললাম,—কেন? লুটপাট করে ওরা, নাম জড়িয়ে দেয় আমাদের। ওরা কারা জিজ্ঞাসা করাতে, সে বললো, —পি. এ. সি লোকেরা।

আরকিওলজিকল ডিপার্টমেনটের অধীনে গোলাপ-বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ, সেখানে ছবি তোলা নিষিদ্ধ করে কোনও নির্দেশ ফলক নেই। তা সত্ত্বেও পি. এ. সি লোকেরা আমাদের ছবি নিতে দেয় নি।

অযোধ্যায় যতবার গিয়েছি কনকভবন না গিয়ে পারিনি। এত বড় পরিসর বোধ হয় অন্য কোনও মন্দিরের নেই। বৈকালটা খুব ভাল লাগতো ধূপধুনোর গন্ধ, নাগাড়ার আওয়াজ, আরতি, কীর্তন, প্রবচন-উপদেশ, রামায়ণ-পাঠ সবকিছুই প্রায় সাথে চলে আলাদা আলাদা জায়গায়। ভগবান রামের ব্যবহৃত শয্যা দেখার জন্য টিকিট নিয়ে উপরে উঠলাম। শয্যা দেখে আমার মনে হল নয় লক্ষ পূর্বেকার (সাধুদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী) বিছানা এখনও আছে—এটা কোনও শিক্ষিত লোককে বিশ্বাস করানো যাবে কি? গ্রামের সাধারণ মানুষ যাদের শিক্ষা ও চেতনার মানকে উন্নত করা যায়নি তারা এই শয্যাকে প্রণাম করলে বা এখানে অর্থ দিলে অপরাধ কিসের? এখানে বেশীর ভাগ লোক আসেন হিন্দী বলয় থেকে, অন্যদের সংখ্যা চোখে না পড়ার মত। দর্শনার্থীদের চাপে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা যেমন রইল না, কর্তৃপক্ষের অবহেলায় আলোবাতিরও উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই। বেশ কিছু মন্দির সংস্কারের অভাবে শেষ হতে চলেছে।

অনেকের কাছে অজানা যে অযোধ্যার সৌন্দর্য-করণের নামে সরকারী অর্থকে বড় বড় ঠিকাদাররা লুটেপুটে খাচ্ছে। অন্যদিকে ছাদওয়ালা স্কুলবাড়ির অভাবে খোলা আকাশের নিচে গাছের ছায়াতলে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে লাখ লাখ শিশু। এদের মাথার উপর ছাউনি দেওয়ার জন্য সরকারের হাতে টাকা নেই।

অযোধ্যায় বিভিন্ন লোকের সাথে মেলামেশার পরে আমার এই ধারণা হয় যে কট্টরপন্থী হিন্দু মৌলবাদীরা অযোধ্যাকে পোপের ভ্যাটিকান সিটি, মুসলিমদের মক্কা বা শিখদের অমৃতসরের মাফিক একটি পবিত্র স্থানে পরিণত করতে চায়। ফৈজাবাদ নামটা ওদের কাছে পছন্দ নয়, জেলার নাম পরিবর্তন করে 'অযোধ্যা' করা হোক, এমন চর্চাও শুনতে পেলাম। তাদের এই কর্মসূচিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী এক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই বর্তমান সমস্ত কার্যকলাপ। সরকার, প্রশাসন ও

বিচারব্যবস্থার মধ্যে সর্বত্র এদের লবি বেশ সক্রিয় ভূমিকার পরিচয় দিয়েছে।

ধর্মীয় জায়গাগুলির পুনরুদ্ধার করা, রক্ষা করা ও দখলের মধ্যে রাখার নামে রাজনৈতিক সহায়তাপুষ্ট হিন্দু-মুসলিম মৌলবাদ আজ দেশের সমস্ত মানুষের সামনে এক নূতন বিপদ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। সরকার ও জনগণ যদি সঠিক সময়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ না গ্রহণ করেন, তা হলে বিপদ ঠেকানো যাবে না।

এই প্রতিবেদনের লেখক পেশায় শ্রমিক—ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর পৈতৃক নিবাস অযোধ্যার নিকটে এক গ্রামে, কিন্তু তাঁর জন্ম কলকাতায় এবং তিনি আবাল্য কলকাতা-প্রবাসী।

মতামত

পুস্তক সমালোচনা কেমন হওয়া উচিত?

ডিসেম্বর '৮৯ সংখ্যা "চতুরঙ্গ"-এ প্রকাশিত গৌতম নিয়োগীকৃত পুস্তকসমালোচনা পড়ে সাধারণ পাঠক হিসেবে কিছু লেখার প্রয়োজনবোধ করছি। চতুরঙ্গের মাসিকে রূপান্তরিত হবার পর থেকে আমি নিয়মিত ক্রেতা। তবে পাঠক হিসেবে পত্রিকাটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক প্রায় ৩০ বছর আগে থেকে। আমার লেখায় যদি উফতা প্রকাশ পায়, তবে বিদগ্ধ পাঠক ক্ষমা করবেন।

পুস্তকসমালোচনা কীভাবে হওয়া উচিত আমার জানা নেই। তবে এটুকু বুঝি, রিভিউ সমালোচনা নয়। কারণ সমালোচনার অবকাশ এখানে কম। গ্রন্থের বিষয়বস্তুর পরিচিতি, লেখকের নতুনত্ব বা ত্রুটি-বিচ্যুতি দর্শানো এবং বিতর্কমূলক কোনো উক্তি থাকলে তার পর্যালোচনা—মূলত এগুলিই রিভিউ লেখকের আলোচ্য। গ্রন্থকারের কোনো মতের সঙ্গে সমালোচক একমত না হলে সংক্ষেপে তা উল্লেখ করে নিজের মতটি জানাতে পারেন। তিনি গ্রন্থকারের বক্তব্য খণ্ডন করতে গিয়ে নিজের মতটি পাঠকের উপর যেন না চাপিয়ে দেন। ভিন্ন মতের পোষক লেখক পৃথক রচনায় নিজের মত প্রকাশ করতে পারেন। এতগুলি অপ্রাসঙ্গিক কথা বলার কারণ উপরি-উক্ত রিভিউটি পাঠক হিসেবে আমাকে ক্ষুব্ধ করেছে।

কলেটের যে বইটির রিভিউ লিখেছেন গৌতমবাবু, তার ১৯৬২-র সংস্করণ আমাদের পড়া আছে। বর্তমান সংস্করণটি না পড়লেও খুব বেশি ক্ষতি হবে না সেইসব পাঠকের, যাঁরা ঐতিহাসিক দিলীপকুমার বিশ্বাসের "রামমোহন-সমীক্ষা" পড়েছেন। অনেক পুরানো মত যাচাই করে নতুন-নতুন তথ্য সংযোজন করেছেন তিনি এ গ্রন্থে। সেইসব উপাদানই তিনি ব্যবহার করেছেন কলেটের নতুন সংস্করণে। তা হলেও বইটি অবশ্যই সংগ্রহযোগ্য। গৌতমবাবু উক্ত গ্রন্থের আলোচনা করতে গিয়ে 'ধান ভানতে মহীপালের গীত গেয়েছেন'—আমাদের আপত্তি সেখানেই। অতি অল্প কথায় রিভিউ কত সুন্দর হতে পারে তার নমুনা "চতুরঙ্গের" উক্ত সংখ্যার শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়-কৃত রিভিউটি। লেখককে নির্লোভ হতে হয়। সে অভ্যাস নেই বলেই গৌতমবাবু অপ্রাসঙ্গিক কথার জাল বুঝেছেন, নিজের লেখার ফিরিস্তি দিয়েছেন, যা কখনও রিভিউ-লেখকের আদর্শ হতে পারে না বলেই মনে করি।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বেশ কিছু কাল আগে রামমোহনের উপর ইংরেজিতে একটি বই লেখেন। পরে রামমোহনকে নিয়ে গড়ে ওঠা "মিথ"-এর অন্তঃসারশূন্যতা (অবশ্য এটা তাঁর ধারণা) নিয়ে আরো একটি প্রবন্ধ লেখেন "Calcutta Review"-তে। পরে উক্ত প্রবন্ধসমেত সমগ্র ইংরেজি গ্রন্থটি বাঙলায় অনুদিত হয়। রমেশচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে বেশ কিছু অপ্রিয় উক্তি করেছিলেন। তাঁকে মনে হবে iconoclast। বই প্রকাশের পর স্বাভাবিক কারণে ঝড় ওঠে, বিশেষ করে ব্রাহ্মমহলে। রমেশচন্দ্রের প্রধানত তিনটে মতের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়। সেগুলি হল রমেশচন্দ্র-প্রদত্ত রামমোহনের জন্মসাল, হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠায় রামমোহনের গুরুত্ব-হ্রাস এবং সতীদাহ-প্রথা-বিলোপে বড়লাটের আইন-প্রণয়ন-কালে রামমোহনের অবিশ্বাস্য নীরবতা। রামমোহন-সম্পর্কে আরো অনেক অপ্রীতিকর মন্তব্য ছিল রমেশ-চন্দ্রের। সেগুলি সম্পর্কে অস্বাভাবিক নীরবতা পালন

করেছেন সমালোচকেরা। "রামমোহন-সমীক্ষা"তে উক্ত তিনটি মতের খণ্ডন-প্রচেষ্টা আছে। কোথাও রমেশচন্দ্রের প্রতি কোনো অশোভন উক্তি নেই। বিদ্যা যে মানুষকে বিনয়ী করে তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন দিলীপবাবু। পক্ষান্তরে, রমেশচন্দ্রের প্রতি অশালীন ভাষায় আক্রমণে গৌতমবাবুর অযৌক্তিক ক্রোধই প্রকাশ পেয়েছে, অন্য কিছু নয়। বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীদের গালাগালি করায় প্রগতিবাদীদের একচেটিয়া অধিকার আছে কিনা জানা নেই, তবে "চতুরঙ্গে"র পাতায় হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মত প্রাজ্ঞ অথচ পরস্পরবিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের রচনা পাঠের পর সেকথা ভাবতে পারি না।

একজন ঐতিহাসিকের গবেষণা চিরকালের জন্য সত্য হতে পারে না। নতুন তথ্যের আলোকে পুরানো অনেক মত ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হতে পারে। তাতে ঐতিহাসিকের গুরুত্ব কমে না। রমেশচন্দ্রের সব মত যদি অগ্রাহ্যও হয়, তবু তিনি তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের কাছে ন্যায্য সম্মানটুকু পাবেন না—এ কেমন কথা!

প্রভাসচন্দ্র চৌধুরী
পাশকুড়া, মেদিনীপুর।

ভুল সংশোধন :

জানুয়ারি সংখ্যায় মুদ্রিত অশোক মিত্রের রচনায় ৭৭৩ পৃষ্ঠার ডানদিকের কলমের ১১ লাইনে ছাপা হয়েছে নিয়াজ মহম্মদ খান। ছাপা হওয়া উচিত ছিল—নুর মহম্মদ খান। লেখক সহকর্মীর নামের উল্লেখে ভুল থাকার জন্য বিশেষ দুঃখিত। স. অ.

Coal India's Thrust on upgraded Technology

As the prime source of commercial energy, COAL has a pivotal role to play in the country's economic and industrial development. The expanding industrial sectors - power, steel, cement, fertilizers, et al will need more and more coal in the coming years.

Coal India which produces 90 per cent of India's coal has undertaken an ambitious growth programme to meet the growing requirements.

To achieve output levels of such high magnitude, Coal India is introducing advanced technology in its various spheres of activities viz. mechanised coal winning, transportation, development of peripheral infrastructures, workshop facilities, electronification, communication system, quick disposal of coal from the surface to the consumers' end.

Besides aiding CIL to attain higher and higher levels of production, year after year, introduction of modern technology will also open new horizons for the Indian industries.

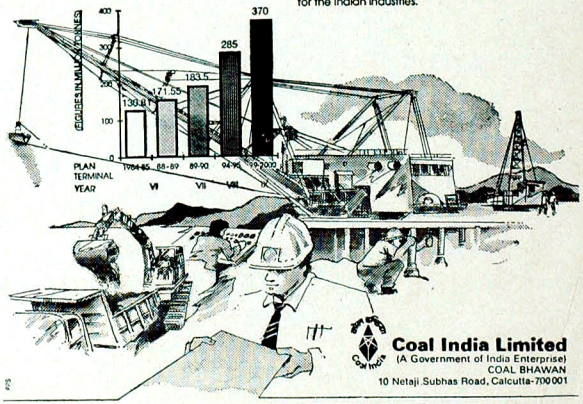

Coal India Limited
(A Government of India Enterprise)
COAL BHAWAN
10 Netaji Subhas Road, Calcutta-700001